# রাজনৈতিক সাংবাদিকতা

# রাজনৈতিক সাংবাদিকতা

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

MRDI

*ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও), দি এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) কে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা-বিষয়ক বইটি মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণের জন্য সহায়তা করে। এই বইয়ে প্রকাশিত মতামত লেখকদের নিজস্ব এবং এটি যুক্তরাজ্য সরকার এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের মতামতকে প্রতিফলিত করে না।*

© মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ISBN : 978-984-35-8745-9

**মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)**
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৪১০২২৭৭২-৭৪, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৫ |
| রাজনৈতিক সাংবাদিকতা | ৭ |
| রাজনৈতিক সাংবাদিকতার মূল দিকগুলো | ৭ |
| রাজনৈতিক রিপোর্টিং কী | ৯ |
| বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিট রিপোর্টিং | ৯ |
| রাজনৈতিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন | ১০ |
| বাংলাদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা কীভাবে সাহায্য করতে পারে | ১১ |
| বাংলাদেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ | ১২ |
| ভালো রাজনৈতিক প্রতিবেদক হওয়ার জন্য যা দরকার | ১৩ |
| বাংলাদেশে গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে সংবাদমাধ্যম কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে | ১৫ |
| স্বাধীন সংবাদমাধ্যম একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য কেন অপরিহার্য | ১৭ |
| সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ | ২০ |
| রাজনৈতিক প্রতিবেদনের ধারণা | ২৩ |
| বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা | ৩২ |
| সরকার | ৩৪ |
| সংসদ | ৪৭ |
| বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা | ৬৪ |
| রাজনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, সংবিধান, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ | ৮০ |
| রাজনীতি | ৯৬ |
| স্বাধীনতা | ১০১ |
| সংবিধান | ১০৫ |
| গণতন্ত্র | ১০৮ |
| নির্বাচন | ১১৬ |
| রাজনৈতিক দল | ১৪৭ |
| বাংলাদেশে রাজনীতির পথপরিক্রমা এবং রাজনৈতিক সংস্কার | ১৫৩ |
| রাজনীতি ও গণতন্ত্রের শব্দকোষ | ১৬১ |

# ভূমিকা

"সাংবাদিকতা বিশ্বের সেরা পেশা"– এ কথা বলে গেছেন নোবেলজয়ী সাহিত্যিক-সাংবাদিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।

প্রায় ২৪০ বছর আগে টমাস জেফারসনের বলা একটি কথাও এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যায়, "আমার সামনে যদি দুটো পথ খোলা রাখা হয়– একদিকে সংবাদপত্রবিহীন সরকার, অন্যদিকে সরকারবিহীন সংবাদপত্র; তাহলে দ্বিতীয়টা বেছে নিতে আমি একমুহূর্তও ভাবব না।"

রাষ্ট্র ও সমাজে সংবাদমাধ্যমের অপরিহার্যতা বোঝাতে এর চেয়ে ভালো উক্তি আর হয় না।

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি, গ্রহণযোগ্যতা এবং সুবিধাও কিন্তু কম নয়। বিস্তৃত কাজের মধ্যে শেখার এমন সুযোগ আর কয়টা পেশায় মেলে? এ পেশায় রয়েছে অবারিত কর্মপরিধির বৈচিত্র্য, প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ, উদ্দীপনামূলক প্রকল্প আর বিভিন্ন পেশার নানা ধরনের মানুষদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ। এ পেশায় সাফল্যের চূড়ায় ওঠার তীব্র আনন্দের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগও মেলে অনেক। সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘোরার আর অজস্র মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। আর সেই পিঠের গল্পটা সুখের নয়। "সাংবাদিকতা এখন পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় পরিণত হয়েছে"– এই ধারণাই এখন বহুল প্রচলিত।

জাতিসংঘ, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) ও কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)-এর মতো বড় বড় সংস্থা প্রায়ই বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরছে।

সাংবাদিকতা পেশায় ঝুঁকি বাড়ার কারণও রয়েছে। সাংবাদিকেরা তাঁদের কাজের জন্য প্রায়ই লক্ষ্যবস্তু হন; বিশেষ করে সংঘাতপূর্ণ এলাকা আর দমনমূলক শাসনব্যবস্থার দেশগুলোতে তাঁদের নিহত বা আক্রান্ত হওয়া যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঘটানো বেশির ভাগ অপরাধের কোনো বিচারই হয় না। ফলে অপরাধীরা পার পেয়ে গিয়ে আরও প্ররোচিত হয়। কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকেরা প্রায়ই অপহৃত ও কারারুদ্ধ হন। তাঁরা অনলাইন ও অফলাইন– উভয় ক্ষেত্রে হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতির শিকার হন। শারীরিক বা যৌন হেনস্তার হুমকি, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে অহরহ। এ ছাড়া সরকার বা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপ তো রয়েছেই। আইনি মারপ্যাঁচ বা সরাসরি সেন্সরশিপের খাঁড়া ঝুলিয়ে সংবাদমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরতে চায় তারা।

তবে এত কিছুর পরেও সাংবাদিকতার গুরুত্ব কিন্তু কমেনি। সাধারণ মানুষের হয়ে ক্ষমতাবানদের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এটাই।

সাংবাদিকতার বিশাল জগতের কথা ধরলে, এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো রাজনৈতিক সাংবাদিকতা। সংবাদের যারা গ্রাহক অর্থাৎ পাঠক, দর্শক, শ্রোতা; তাদের মধ্যে রাজনীতির খবরাখবর, এর ভেতর-বাহির সম্পর্কে জানা-বোঝার আগ্রহ বেশি থাকে। কারণ, রাজনীতির লোকেরাই নির্বাচনে জনরায় পেয়ে শাসনক্ষমতায় থাকে; তাই তারা জনগণের কাছে কতটুকু জবাবদিহি করছে বা রাজনৈতিক দল ও সরকারের অন্দরমহলে কী ঘটছে, শাসনপ্রক্রিয়ায় সুশাসন কী চেহারা পাচ্ছে; তার জন্য সংবাদমাধ্যমের রাজনৈতিক প্রতিবেদনেই সবার চোখ রাখতে হয়। এ জন্য গণতন্ত্রের ভিত শক্ত করতে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ যেসব উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের শিকড় এখনো গভীরে ছড়ায়নি, সেখানে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই ধারার সাংবাদিকতার কাজ শুধু সংবাদ মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ দেওয়া নয়; বরং স্বচ্ছতা আনা, ক্ষমতাকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং সাধারণ মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়ে শক্তিশালী করা। তাই শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক সমাজের জন্য সুচিন্তিত, নৈতিক ও নির্ভীক রাজনৈতিক সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই।

এই বইয়ে রাজনৈতিক প্রতিবেদন তৈরি করতে কী জানবেন, কী করবেন এবং কী পড়বেন, কেন পড়বেন; সেসব সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পেশাদার সাংবাদিক তো বটেই, সেই সঙ্গে সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী, বিশেষ করে তরুণ সংবাদকর্মীদের জন্য বইটি সহায়ক হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, দক্ষ রাজনৈতিক সাংবাদিক হতে গেলে নিয়মিত রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর নজর রাখার কোনো বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে বেশি বেশি সব খুঁটিনাটি জানার জন্য পড়াশোনা তো করতেই হবে।

উল্লেখ্য, বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়ার জন্য এই বইয়ে ইচ্ছা করেই কিছু কিছু কথা বারবার বলা হয়েছে।

রাজনৈতিক সাংবাদিকতাকে প্রাত্যহিক রিপোর্টিংয়ের সীমিত গণ্ডি থেকে বের করে এনে বিশ্লেষণ ও সমালোচনাধর্মী প্রতিবেদন তৈরির দিকে নিয়ে গেলে সংবাদগ্রহীতাদের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখায় অবদান রাখতে পারে।

সাংবাদিক আমীর খসরু, নজরুল ইসলাম মিঠু, আশিস সৈকত, জাহিদ নেওয়াজ খান জুয়েল ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলি এই বইয়ের খসড়া প্রস্তুত করায় নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পরামর্শগুলোর সমন্বয়, মতামত সংযোজন এবং সর্বোপরি প্রকাশনাটিকে একটি বইয়ের আকৃতি দিতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ সাংবাদিক শাখাওয়াত লিটন। তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। বিষয়বস্তু ও ভাষাগত পরিমার্জন করে বইটিকে আরও পাঠকবান্ধব রূপ দিয়েছেন সাংবাদিক সুকান্ত গুপ্ত অলক। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

দি এশিয়া ফাউন্ডেনের ‘প্রোমোটিং ইফেক্টিভ, রেসপন্সিভ, অ্যান্ড ইনক্লুসিভ গভর্ন্যান্স ইন বাংলাদেশ (পেরি)’ কর্মসূচির অধীনে এবং যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের (এফসিডিও) সহায়তায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ায় তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বইটির সম্পাদনা ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের জন্য এমআরডিআই টিমকে ধন্যবাদ।

# রাজনৈতিক সাংবাদিকতা

রাজনীতি, সরকার এবং জনজীবনের ওপর তার যে প্রভাব, এসব দিক নিয়ে যে সাংবাদিকতা, সেটাই রাজনৈতিক সাংবাদিকতা। এর আসল কাজ হলো, রাজনৈতিক অঙ্গনে কী ঘটছে, সেই খবর সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা সব জেনে-বুঝে সচেতন হতে পারে, নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে।

### রাজনৈতিক সাংবাদিকতার গণ্ডি

- **সরকারি কাজকর্মের খবর:** নির্বাচিত নেতা বা এমপি-মন্ত্রীরা, সংসদ বা মন্ত্রণালয়ের মতো সরকারি দপ্তরে কী হচ্ছে আর সরকারি কর্মচারীরা কে কী করছেন, সেসবের অনুসন্ধান করে খবর তুলে ধরা।
- **নীতি ও আইন বিশ্লেষণ:** সরকার যেসব আইন ও নীতি প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছে বা প্রণয়ন করে ফেলেছে, সেগুলো খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা। সমাজের বিভিন্ন অংশের ওপর এসব নীতি ও আইনের কী প্রভাব পড়তে পারে, তা ব্যাখ্যা করা।
- **রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রচারাভিযান ও নির্বাচন ট্র্যাক করা:** রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, স্থানীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের তৎপরতার সবকিছু নিয়ে প্রতিবেদন করেন রাজনৈতিক সাংবাদিকেরা। প্রার্থী, নির্বাচনী প্রচার, কৌশল এবং ভোটের ফলাফল ও এর প্রভাব– সব খবর পরিবেশন করেন তাঁরা।
- **ক্ষমতার গতিশীলতা তদন্ত:** ক্ষমতাবলয়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, লবিস্ট, এমনকি অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলো কীভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, এসব নিয়ে অনুসন্ধান করেন রাজনৈতিক সাংবাদিকেরা।
- **ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় আনা:** রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো প্রহরী (Watchdog) হিসেবে কাজ করা। রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ এবং বিবৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা; যাতে সম্ভাব্য অন্যায়, দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার উন্মোচন করা যায়।
- **প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণ প্রদান:** শুধু খবর জানানোই রাজনৈতিক সাংবাদিকতার শেষ কথা নয়; একটা ঘটনা কেন ঘটছে, এর পেছনের কারণ আর ইতিহাস কী, এর পরিণতি কী হতে পারে– এসব বিশ্লেষণও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন এ ঘরানার সাংবাদিকেরা।
- **জনসাধারণের কথা জানানোর প্ল্যাটফর্ম :** দেশের জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে পারে, আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করতে পারে, সে জন্য তাদের বক্তব্য তুলে ধরার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা।

এককথায় বলতে গেলে, সরকার ও রাজনীতির জগতে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা হলো জনগণের চোখ আর কান। ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে নেওয়া হচ্ছে, দলগুলো কী করছে, তার একটা পরিষ্কার, নিখুঁত আর সোজাসাপটা ছবি তুলে ধরাই এমন সাংবাদিকতার লক্ষ্য।

# রাজনৈতিক সাংবাদিকতার মূল দিকগুলো

### পরিধি

এর পরিধি বিশাল। রাজনৈতিক দল, নেতা-কর্মী ও নেতৃত্ব, সরকার ও ক্ষমতাবলয়, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত এর বিচরণ। এসবের মধ্যে রয়েছে:

- **বেসামরিক সরকার:** স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে নির্বাহী কর্তৃত্ব, আইনসভা ও নির্বাচিত পরিষদসমূহ এবং বিচার বিভাগীয় শাখা।
- **রাজনৈতিক ক্ষমতা:** কীভাবে কেউ ক্ষমতায় আসে, কীভাবে তা প্রয়োগ করে, আর সেই ক্ষমতাকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

- **নির্বাচন ও প্রচারণা:** নির্বাচনে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, তাদের প্ল্যাটফর্ম, নির্বাচনী ইশতেহার, নির্বাচনী তহবিল ও ভোটারদের আচরণ এবং ফলাফল ও প্রভাব– এমন সবকিছু।
- **নীতিনির্ধারণ:** আইন ও জননীতি তৈরি, বাস্তবায়ন এবং তার প্রভাব।
- **রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় ব্যবস্থা:** রাজনৈতিক আলোচনাকে চালিত করে যেসব বিশ্বাস, মতাদর্শ ও কাঠামো, সেগুলোকে বোঝা।
- **রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য অংশীজন:** রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, লবিস্ট ও সুশীল সমাজ বা নাগরিক নেতাদের নিয়ে প্রতিবেদন।
- **সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ:** যেকোনো রাজনৈতিক ঘটনা কীভাবে ঘটছে, তার প্রেক্ষাপট, নেপথ্যের কারণ এবং তার প্রভাব কী হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা।

## মূল উদ্দেশ্য

- **জনগণকে অবহিত করা:** নাগরিকদের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা, যাতে তারা রাজনৈতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হন এবং জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন (যেমন, কাকে ভোট দেবেন)।
- **ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় আনা:** রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ যাচাই করার জন্য ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করা। দুর্নীতি, অদক্ষতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার উন্মোচন করে ক্ষমতাকাঠামোকে জবাবদিহির আওতায় আনা।
- **বিতর্কের সুযোগ করে দেওয়া:** রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে নানা মতের মানুষের তর্ক-বিতর্কের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠা।

## মূল বৈশিষ্ট্য

- **বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা:** কোনো রকম পক্ষপাত না করে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন উপস্থাপনের চেষ্টা করা। যদিও সংবাদমাধ্যমের মেরুকরণের যুগে কাজটা বেশ কঠিন।
- **নির্ভুল তথ্য:** প্রতিটি তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া। তথ্যের সূত্রগুলো নিশ্চিত করা।
- **স্বাধীনতা:** কোনো রাজনৈতিক দল, সরকারি চাপ বা ব্যবসায়িক স্বার্থের কাছে মাথানত না করা; স্বাধীনতা বজায় রাখা।
- **পটভূমি ও বিশ্লেষণ:** শুধু ঘটনার বর্ণনা নয়, এর বাইরে গিয়ে ঘটনার পটভূমি ও প্রেক্ষাপট, জটিলতা ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।
- **অভিযোজন ক্ষমতা:** প্রিন্ট, সম্প্রচার, অনলাইনের মতো সব মাধ্যমে কাজ করার ক্ষমতা এবং সোশ্যাল মিডিয়া বা ডেটা জার্নালিজমের মতো নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

## চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক সাংবাদিকদের পদে পদে বিপদ আর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। তাঁদেরকে প্রায়ই প্রবল চাপের মুখে কাজ করতে হয়। নিচের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয় হরহামেশা:

- ভুল তথ্য ও অপতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই।
- রাজনৈতিক ঘূর্ণি ও প্রচারণার ফাঁদ মোকাবিলা।
- অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট পরিবেশে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা।
- নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

মোদ্দাকথা হলো, রাজনৈতিক সাংবাদিকতা একটি সুস্থ গণতন্ত্রের ভিত। ক্ষমতাসীন আর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে এই সাংবাদিকতা।

# রাজনৈতিক রিপোর্টিং কী

রাজনৈতিক রিপোর্টিং হলো সাংবাদিকতার একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে রিপোর্টাররা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে রিপোর্ট করেন। এটি তাঁদের এ রকম একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলে, যা তাঁদের আরও তথ্য এবং ঘটনাবহুল সংবাদক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দেয়, যা সাধারণ রিপোর্টাররা হয়তো দেখতে পারেন না, বা তাঁদের জানা-বোঝা ও আয়ত্তের বাইরে থাকে। এই বিশেষায়ন তাঁদের এমন সংবাদ-গল্পগুলো উন্মোচন করতে সাহায্য করে, যা অন্যরা উপেক্ষা করতে পারে এবং তারা সেই রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়।

## প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো

- **বিশেষায়ন:** রিপোর্টাররা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র; যেমন মন্ত্রিসভা, বিচারব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল বা বিশেষ নীতির ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করায় মনোনিবেশ করেন।
- **সম্পর্ক তৈরি:** তাঁরা তাঁদের বিটের মধ্যে সূত্রগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যা একচেটিয়া তথ্য এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার গভীর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে তাঁকে সাহায্য করে।
- **গভীর কভারেজ:** এই পদ্ধতি ব্যাপক রিপোর্টিংয়ের সুযোগ দেয়, যা ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিত বোঝানোর পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করার সক্ষমতা উপযোগী হয়।
- **দায়িত্ব:** একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ধারাবাহিকভাবে মনিটরিং করা, বিট রিপোর্টারদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহি করাতে সহায়ক হয়, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ করে।

## রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও বিট রিপোর্টিংয়ের অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে:

- **বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা:** সূত্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা রিপোর্টারদের পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্বের কারণ হতে পারে, যদি তারা খুব বেশি ঘনিষ্ঠ বা শত্রু হয়ে ওঠে।
- **সংকীর্ণ মনোযোগের ঝুঁকি:** রিপোর্টারের একরকম সংকীর্ণ মনোযোগের কারণে প্রতিবেদনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের অভাব ঘটতে পারে, যাতে ঘটনার একতরফা বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হয়।
- **কনটেন্ট প্রোডাকশনের চাপ:** একটানা কনটেন্ট তৈরির চাহিদা রিপোর্টারকে সাদামাটা রিপোর্টিংয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যদি এটি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয়।

# বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিট রিপোর্টিং

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিট রিপোর্টিং গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি দেশের পরিবর্তনশীল এবং জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিটের ওপর মনোযোগ দেওয়া সাংবাদিকেরা সংসদ অধিবেশন, নির্বাচনী প্রচার, নীতি উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে রিপোর্ট করেন। তাঁদের কাজ নিশ্চিত করে যে, জনসাধারণ সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করা হচ্ছে।

## সারাংশ

রাজনৈতিক বিট রিপোর্টিং হলো একটি বিশেষায়িত সাংবাদিকতা; যা সময়োপযোগী একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ওপর মনোযোগ দেয়। এতে নিবেদন, বিশেষজ্ঞতা এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যাতে সঠিক এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রাজনৈতিক কভারেজ দেওয়া যায়।

# রাজনৈতিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলোর সংমিশ্রণে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দেশটির গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সাংবাদিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে শক্তিশালী সাংবাদিকতার সাধারণ নীতিগুলো যেকোনো উদীয়মান গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেখানে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এই প্রয়োজনীয়তাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

রাজনৈতিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি সরাসরি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং নাগরিক অংশগ্রহণে সহায়ক; যা যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। একটি দেশে যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেখানে স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সাংবাদিকতা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়; এটি অপরিহার্য।

## কেন রাজনৈতিক সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ, তার কিছু কারণ

### ১. নাগরিকদের তথ্য দেওয়া

- রাজনৈতিক সাংবাদিকতা জনগণকে সাহায্য করে বুঝতে:
  - সরকার কী করছে।
  - বিরোধী দলগুলো কী করছে ও বলছে।
  - কীভাবে নীতি এবং আইন তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে।
- রাজনীতিসচেতন নাগরিকেরা সাধারণত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভোট দিতে, নেতাদের জবাবদিহি করতে এবং নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

মোটকথা, রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ছাড়া গণতন্ত্র অজ্ঞ এবং অন্ধ হয়ে পড়ে।

### ২. ক্ষমতাকে জবাবদিহি করা

- সাংবাদিকেরা হন ওয়াচডগ, যাঁরা উন্মোচন করেন:
  - দুর্নীতি।
  - ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতিক অনিয়ম।
  - নির্বাচনী অনিয়ম।
- তারা নিশ্চিত করেন যে, রাজনীতিবিদ, আমলা এবং দলগুলোকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

উদাহরণ: একটি ঘুষ কেলেঙ্কারি বা অবৈধ নির্বাচনী তহবিল ব্যবহারের ঘটনার উন্মোচন একটি সরকারকে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে।

### ৩. সব পক্ষের কণ্ঠ শোনা

- একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা এবং বিরোধিতা প্রয়োজন।
- রাজনৈতিক রিপোর্টিং নিশ্চিত করে যে:
  - বিরোধী দলের কণ্ঠ শোনা যায়।
  - প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো উত্থাপিত হয়।
  - বিভিন্ন মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিধিত্ব পায়।

বাংলাদেশে যেখানে বিরোধী কণ্ঠগুলো প্রায়শই অনুচ্চারিত ও অবহেলিত হয়, সেখানে এই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### ৪. নির্বাচনী অখণ্ডতা শক্তিশালী করা

- নির্বাচনের সময়, রাজনৈতিক রিপোর্টাররা:
  - প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি এবং কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করেন।
  - ভোটার ভীতি বা প্রতারণার ঘটনা রিপোর্ট করেন।

- বিতর্ক এবং সাক্ষাৎকার আয়োজন করে জনগণকে জানান।

তারা মুক্ত, ন্যায্য এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

**৫. নীতি বিতর্ক প্রচার করা**

- রাজনৈতিক সাংবাদিকতা জটিল সরকারি সিদ্ধান্তগুলো (যেমন বাজেট, আইন, বাণিজ্য চুক্তি) সহজভাবে বিশ্লেষণ করে, যাতে মানুষ সেই নীতিগুলো নিয়ে বিতর্ক এবং প্রশ্ন করতে পারে।
- এটি সমালোচনামূলক চিন্তা এবং গণতান্ত্রিক আলোচনা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

**৬. ভুল তথ্য এবং প্রচারণা চেক করা**

- রাজনৈতিক সাংবাদিকতা
  - রাজনৈতিক দলগুলোর ছড়ানো মিথ্যা খবর উন্মোচন করতে পারে।
  - কল্পিত উপস্থাপনা বা রাষ্ট্রীয় প্রচারণা প্রকাশ করতে পারে।
- এটি জনগণের মধ্যে সত্য, স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু আলোচনা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

**৭. জনসাধারণের আস্থাশীলতা পুনর্নির্মাণ করা**

- রাজনৈতিক বিভাজন বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিবেশে, সৎ এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক রিপোর্টিং সংবাদমাধ্যম, রাজনীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জন-আস্থা পুনর্নির্মাণ করতে সাহায্য করে।

যখন মানুষ রাজনৈতিক হয়রানি ছাড়া অবিচ্ছিন্ন তথ্য দেখতে পায়, তখন তারা আরও তথ্য পেতে উৎসাহী হয়ে পড়ে এবং কম হতাশ হয়।

**৮. গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শক্তিশালী করা**

- রাজনৈতিক সাংবাদিকতা একটি জবাবদিহির এবং সক্রিয় নাগরিক-সংস্কৃতি তৈরি করতে সাহায্য করে।
- এটি জনগণকে সমস্যা, শাসনব্যবস্থা এবং অধিকার নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে।

কিন্তু এটি অবশ্যই দায়িত্বশীলভাবে করতে হবে, কার্যকরী রাজনৈতিক সাংবাদিকতা অবশ্যই হতে হবে:

- স্বাধীন: সরকার বা করপোরেট নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত।
- তথ্যভিত্তিক: গুজব বা দলীয় স্বার্থে পরিচালিত নয়।
- নৈতিক: ঘৃণাসূচক বক্তব্য, মানহানি বা সেনসেশনালিজম পরিহার করতে হবে।

সংক্ষেপে: রাজনৈতিক সাংবাদিকতা একটি কার্যকর গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা হিসেবে কাজ করে। এটি জনগণকে তথ্য দেয়, অন্যায় উন্মোচন করে, বিভিন্ন কণ্ঠস্বরকে দৃঢ় করে এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি শক্তিশালী করে; বিশেষত যখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থাকে।

## বাংলাদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা কীভাবে সাহায্য করতে পারে

বাংলাদেশের জটিল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সাম্প্রতিক ইতিহাস বিবেচনায় রাজনৈতিক সাংবাদিকতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, আরও জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এর সম্ভাবনা বিশাল।

**গভীরভাবে প্রোথিত রাজনৈতিক মেরুকরণ পরিবর্তন:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ঐতিহাসিকভাবে দুটি প্রভাবশালী দলের মধ্যে গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে চিহ্নিত, যা প্রায়শই অত্যন্ত মেরুকৃত পরিবেশের দিকে ধাবিত করে। নিরপেক্ষ এবং শক্তিশালী রিপোর্টিং

নাগরিকদের তথ্যভিত্তিক সংবাদ সরবরাহের জন্য অপরিহার্য, যা তাদের দলীয় সীমার বাইরে গিয়ে অবহিত করে সিদ্ধান্ত নিতে এবং পক্ষপাতমূলক আখ্যানের বিস্তার কমাতে সাহায্য করে। এটি ছাড়া, জনসাধারণ প্রায়শই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে থাকে, যা গঠনমূলক সংলাপ এবং জাতীয় ঐকমত্য কঠিন করে তোলে।

**বংশানুক্রমিক রাজনীতি এবং অভিজাতদের আধিপত্য মোকাবিলা:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বংশানুক্রমিক রাজনীতি দিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যেখানে ক্ষমতা প্রায়শই কয়েকটি অভিজাত পরিবারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্বাধীন এবং শক্তিশালী সাংবাদিকতা এই ধরনের ব্যবস্থার প্রভাব উন্মোচন করতে পারে, যার মধ্যে নতুন প্রতিভার দমন, মেধার অবক্ষয় এবং অদক্ষতা ও বৈষম্যের স্থায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতার কাঠামো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করার মাধ্যমে, সাংবাদিকতা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মেধাভিত্তিক নেতৃত্বের জনদাবিকে উৎসাহিত করতে পারে।

**দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা:** বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় সামরিক হস্তক্ষেপ এবং শক্তিশালী, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংহত করার নিরন্তর সংগ্রাম দেখা গেছে। এমন পরিবেশে, সংবাদমাধ্যম একটি ডি-ফ্যাক্টো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি কর্মকাণ্ড, বিচারিক সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক স্তম্ভের কার্যকারিতা সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, শক্তিশালী রিপোর্টিং দুর্বলতাগুলো তুলে ধরতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য চাপ দিতে পারে।

**প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর:** গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোতে, রাজনৈতিক আলোচনায় তাদের কণ্ঠস্বর অনুচ্চারিত থাকতে পারে। স্বাধীন সাংবাদিকতা এই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। তাদের উদ্বেগ, চ্যালেঞ্জ এবং দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় মঞ্চে নিয়ে আসতে পারলে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

**ভুল তথ্য এবং অপতথ্য মোকাবিলা:** অনেক দেশের মতো, বাংলাদেশও ভুল তথ্য এবং অপতথ্যের বিস্তারের জন্য সংবেদনশীল, বিশেষ করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উত্থানের সঙ্গে। শক্তিশালী সাংবাদিকতায় তথ্য যাচাই, বিশ্বাসযোগ্য উৎসের অবলম্বন এবং গভীর বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়ে মিথ্যা আখ্যানগুলো মোকাবিলা করা অপরিহার্য, যা রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতে দেয় না এবং জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।

**গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনবিশ্বাস তৈরি:** সংবাদমাধ্যম এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর জনবিশ্বাস বাংলাদেশে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক উদ্বেগ। যখন সাংবাদিকতাকে বিশ্বাসযোগ্য, ন্যায্য এবং অযাচিত প্রভাব থেকে মুক্ত বলে মনে করা হয়, তখন এটি এই বিশ্বাস পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারে। এই বিশ্বাস নাগরিকদের নির্বাচনের সততা, বিচারের ন্যায্যতা এবং তাদের সরকারের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## বাংলাদেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা উল্লেখযোগ্য বাধার সম্মুখীন:

- **নিষেধাজ্ঞামূলক আইন এবং আইনি চাপ:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) (এর পরিবর্তিত রূপ, সাইবার নিরাপত্তা আইন) এবং এর মতো আইনগুলো ভিন্নমত দমন এবং সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে, যা সেল্ফ-সেন্সরশিপ এবং ভয়ের দিকে পরিচালনা করে। সাংবাদিকেরা নির্বিচারে মামলা এবং গ্রেপ্তারেরও মুখোমুখি হন।
- **রাজনৈতিক এবং মালিকানাজনিত প্রভাব:** বাংলাদেশের অনেক সংবাদমাধ্যমের মালিকানা ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোর হাতে রয়েছে, যাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা সম্পাদকীয় স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করে, যেখানে রিপোর্টিং জনস্বার্থের পরিবর্তে মালিকদের ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবেশন করার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।
- **নিরাপত্তার ঝুঁকি এবং ভীতি প্রদর্শন:** বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা প্রায়শই হুমকি, হয়রানি এবং শারীরিক সহিংসতার শিকার হন, কখনো কখনো রাজনৈতিক কর্মী, অপরাধী বা এমনকি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকেও। এটি অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- **অর্থনৈতিক দুর্বলতা:** অনেক সংবাদমাধ্যম আর্থিকভাবে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত, যা তাদের বিজ্ঞাপনদাতা বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের চাপের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে।

- **পেশাদারত্ব এবং প্রশিক্ষণের অভাব:** যদিও নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিকেরা বিদ্যমান রয়েছেন, তবে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, কম বেতন এবং চাকরির অনিশ্চয়তার মতো বিষয়গুলো রিপোর্টিংয়ের সামগ্রিক গুণমান এবং স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
- **সাংবাদিক সংস্থাগুলোর রাজনৈতিকীকরণ:** সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সংস্থাগুলো কখনো কখনো রাজনৈতিক বিভাজনের শিকার হয়, যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং পেশাদারি মান রক্ষার জন্য তাদের সম্মিলিত ক্ষমতা দুর্বল করতে পারে।

উপসংহারে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি সুসংহত করতে এবং একটি সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে, শক্তিশালী, স্বাধীন এবং নৈতিক রাজনৈতিক সাংবাদিকতা শুধু কাম্য নয়, একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এটি এমন পরিবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে, যেখানে অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হতে পারে বা উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

## ভালো রাজনৈতিক প্রতিবেদক হওয়ার জন্য যা দরকার

একজন ভালো রাজনৈতিক প্রতিবেদক হওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে দক্ষতা, জ্ঞান এবং নৈতিক নীতির অনন্য মিশ্রণ প্রয়োজন। এটি একটি কঠিন ক্ষেত্র, তবে জনসাধারণকে অবহিতকরণ এবং ক্ষমতাকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এখানে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

### সাংবাদিকতায় মৌলিক দক্ষতা

- **শক্তিশালী লেখা এবং যোগাযোগ:** এটি মৌলিক বিষয়। আপনাকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের (প্রিন্ট, সম্প্রচার, ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া) জন্য স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয়ভাবে লিখতে, বলতে বা উপস্থাপন করতে জানতে হবে। এর মধ্যে ব্যাকরণ, বিরামচিহ্ন এবং স্টাইল গাইডেন্সগুলো আয়ত্ত করাও অন্তর্ভুক্ত। আপনাকে জটিল রাজনৈতিক তথ্য সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করে উপস্থাপন করতে জানতে হবে।
- **গবেষণা এবং অনুসন্ধানী দক্ষতা:** রাজনৈতিক প্রতিবেদনের জন্য প্রায়শই গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হয়। আপনাকে নির্ভরযোগ্য উৎস খুঁজে বের করতে এবং বেছে নিতে, ডেটা মূল্যায়ন করতে, নথি বিশ্লেষণ করতে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংবাদিকতামূলক গবেষণা পরিচালনা করতে পারদর্শী হতে হবে।
- **সাক্ষাৎকার নেওয়ার দক্ষতা:** নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উন্মোচন করার জন্য কার্যকর সাক্ষাৎকার অপরিহার্য। এটি শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বাইরেও প্রস্তুতি, সক্রিয়ভাবে শোনা এবং মনোযোগ বজায় রাখার ক্ষমতাকে বোঝায়।
- **বিশ্লেষণ ক্ষমতা:** রাজনীতি জটিল। জনসাধারণকে প্রেক্ষাপট বোঝাতে, প্রবণতা শনাক্ত করতে এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে রাজনৈতিক ঘটনা, নীতি এবং ডেটা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হতে হবে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিণতি, জনসংখ্যাগত প্রভাব এবং ঐতিহাসিক পটভূমি বোঝা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- **ডিজিটাল সাংবাদিকতার দক্ষতা:** আজকের মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে, ডিজিটাল ডিভাইস বা সরঞ্জামগুলোতে দক্ষতা অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - **সোশ্যাল মিডিয়া জ্ঞান:** দর্শক-পাঠক-শ্রোতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, রিয়েল-টাইমে প্রতিবেদন করা, একটি ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করা এবং সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে রাজনৈতিক আলোচনাকে আকার দেয়, তা বোঝা।
  - **মাল্টিমিডিয়া প্রযোজনা:** ছবি তোলা, ভিডিও করা এবং সম্পাদনা করা, অডিও এবং ভিডিও রেকর্ড করা ও সম্পাদনা করা এবং চলার পথে কনটেন্ট প্রকাশ করার ক্ষমতা।
  - **ডেটা সাংবাদিকতা:** ডেটা বোঝা এবং তার অর্থ বের করা, যার মধ্যে জরিপ, প্রচারাভিযানের অর্থায়ন এবং নির্বাচনের ফলাফলের জন্য পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করাকে ব্যবহার করা।
- **সম্পাদনার দক্ষতা:** নির্ভুলতা, ন্যায্যতা, স্পষ্টতা ও ব্যাকরণগত শুদ্ধতার জন্য নিজের কাজ এবং অন্যদের কাজ সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা।

## রাজনৈতিক জ্ঞান এবং উপলব্ধি

- **সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর ধারণা:** সরকার কীভাবে কাজ করে; এর শাখা, প্রক্রিয়া এবং প্রাসঙ্গিক আইন সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে।
- **রাজনৈতিক ইতিহাস এবং চলতি ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান:** রাজনৈতিক প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক নজির ও ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বোঝা আপনাকে চলতি ঘটনাগুলোকে আরও নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।
- **নীতিগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা:** রাজনৈতিক প্রতিবেদক প্রায়শই নির্দিষ্ট নীতিগত ক্ষেত্রগুলো (যেমন স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন) কভার করেন। এই বিষয়গুলো এবং তাদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা অপরিহার্য।
- **রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পরিচিতি:** মূল কুশীলব, তাদের পটভূমি এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা কার্যকর প্রতিবেদনের জন্য অপরিহার্য।

## ব্যক্তিগত গুণাবলি

- **বস্তুনিষ্ঠতা এবং ন্যায্যতা:** এটি সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভালো রাজনৈতিক প্রতিবেদক ব্যক্তিগত পক্ষপাত ছাড়াই ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন/কনটেন্ট উপস্থাপনের চেষ্টা করেন, নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করেন এবং একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তাঁদের অবশ্যই সত্য এবং নির্ভুলতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।
- **নৈতিক সচেতনতা এবং সততা:** রাজনৈতিক সাংবাদিকতা নৈতিক দ্বিধায় পূর্ণ। আপনাকে অবশ্যই নৈতিক কোডগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে, পেশাদার সততা বজায় রাখতে হবে এবং রাজনৈতিক দল, লবিস্ট বা এমনকি সংবাদমাধ্যমের মালিকানার বাইরের চাপকে জয় করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - **স্বচ্ছতা:** উৎস (যখন উপযুক্ত), পদ্ধতি এবং যেকোনো সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ করা।
  - **জবাবদিহি:** দ্রুত ভুল সংশোধন করা এবং জনসাধারণের scrutiny-র জন্য উন্মুক্ত থাকা।
  - **ক্ষতি কমানো:** সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে কাজ করার সময় জনস্বার্থ বনাম ব্যক্তির সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাপ করা।
  - **সোর্স রক্ষা:** হুইসেলব্লোয়ারদের কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং আইনি পরিণতি বোঝা।
  - **স্বার্থের সংঘাত এড়ানো:** বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে আপস করতে পারে এমন উপহার বা অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা।
- **অনুসন্ধিৎসু মনোভাব এবং কৌতূহল:** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার, তথ্য উন্মোচন করার এবং রাজনৈতিক ঘটনার "কেন", তা বোঝার একটি চালিকা শক্তি।
- **দৃঢ়তা এবং সংকল্প:** রাজনৈতিক প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, অনিচ্ছুক উৎস বা সময়সীমার তীব্রতার মতো বাধাসহ। প্রতিবেদনের উপলক্ষগুলো অনুসরণ করতে এবং অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে আপনাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।
- **বিস্তারিত মনোযোগ:** ছোট বিবরণ রাজনৈতিক প্রতিবেদনে একটি বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে। নির্ভুলতার প্রতি একটি তীক্ষ্ণ নজর অপরিহার্য।
- **চাপের মুখে শান্ত থাকা:** ২৪/৭ সংবাদ চক্র এবং রাজনৈতিক প্রতিবেদনের উচ্চ ঝুঁকি প্রায়শই চাপপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে।
- **আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা:** সোর্স, সহকর্মী এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা। এর মধ্যে ভালো যোগাযোগ, সক্রিয়ভাবে শোনা এবং বিভিন্ন পটভূমির মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত।
- **সংশয়বাদ (নৈরাশ্যবাদ নয়):** দাবি এবং আখ্যানগুলোর প্রতি একটি যৌক্তিক সংশয়, তবে এমন নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিত না হওয়া যা সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে বাতিল করে দেয়।

## শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা

- **স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ:** সাংবাদিকতা, যোগাযোগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সম্পর্কিত ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি সাধারণত প্রয়োজন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা নেই।
- **ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা:** স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখালেখি বা বার্ষিকী-সংকলন-সাময়িকী বা অন্যান্য সংবাদধর্মী প্রকাশনার সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করা এবং যেকোনো পর্যায়ে সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও বা অনলাইন ডিজিটাল মাধ্যমগুলোর

জন্য কাজ করা মূল্যবান প্রাথমিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ইন্টার্নশিপগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং একটি পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **একটি পোর্টফোলিও (ক্লিপস) তৈরি করা:** সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের দেখানোর জন্য আপনার কাজের শক্তিশালী উদাহরণ প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে প্রকাশিত নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, অডিও বা ভিডিও রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- **নেটওয়ার্কিং:** রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক সংস্থা, অন্যান্য সাংবাদিক, সম্পাদক এবং প্রকাশকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কর্মজীবনের অগ্রগতি এবং উৎস বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ নেওয়া এবং পেশাদার সংযোগের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা খুব উপকারী হতে পারে।

সংক্ষেপে, একজন ভালো রাজনৈতিক প্রতিবেদক একজন সতর্ক এবং নৈতিক সংবাদ-গল্পকার; যিনি ক্ষমতা, নীতি এবং জনমতের জটিলতাগুলো নেভিগেট করে জনসাধারণকে নির্ভুল, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং প্রভাবপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারেন।

# বাংলাদেশে গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে সংবাদমাধ্যম কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশেষ করে যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল এবং জনসাধারণের দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে।

সংবাদমাধ্যম যখন স্বাধীন, দায়িত্বশীল এবং ন্যায়পরায়ণ হয়, তখন এটি একটি ওয়াচডগ, শিক্ষক এবং গণপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে।

এখানে কীভাবে এটি সাহায্য করতে পারে, তার ব্যাখ্যা:

**১. দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ওয়াচডগ**

- **কীভাবে সাহায্য করে**
  - দুর্নীতি, নির্বাচনী কারচুপি, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রকাশ করে।
  - অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা রাজনৈতিক নেতাদের এবং সরকারি বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, এমনকি যখন আদালত বা সংসদ নীরব থাকে।

উদাহরণ: নির্বাচনকালীন ভোট কেনা বা উন্নয়ন তহবিলের অপব্যবহার প্রকাশ করলে কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে বা সংস্কার করতে চাপ দিতে পারে।

**২. স্বাধীন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রচারণা**

- **কীভাবে সাহায্য করে:**
  - সব রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের প্রচার সুষ্ঠুভাবে কভার করে, ভোটারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়।
  - নির্বাচনী অনিয়ম, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং প্রচারণা, অর্থসংক্রান্ত নীতি-নিয়ম লঙ্ঘনের রিপোর্ট প্রকাশ করে।
  - সরাসরি বিতর্ক, রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার এবং ইস্যুভিত্তিক রিপোর্ট প্রচার করে।

উদাহরণ: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা মিডিয়া মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সংস্কারের দাবি তুলে ভোটারদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

**৩. নাগরিকদের শিক্ষিত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি**

- **কীভাবে সাহায্য করে**
  - জনগণকে তাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে জানায়।
  - নাগরিকের অংশগ্রহণ, ভোটদান এবং নাগরিক আন্দোলন উৎসাহিত করে।
  - আইন, সরকারি নীতি এবং সিদ্ধান্তগুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে।

উদাহরণ: তথ্য অধিকার আইনের (RTI) আওতায় আবেদনের পদ্ধতি বা অন্য কোনো অসংগতি রিপোর্ট করার জন্য মিডিয়া ক্যাম্পেইন চালানো।

**৪. প্রান্তিক গোষ্ঠীর কণ্ঠ তুলে ধরা**

- **কীভাবে সাহায্য করে**
  - গ্রামীণ সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু, নারী, যুবক এবং দরিদ্রদের সমস্যা আলোচনায় আনে।
  - বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কণ্ঠ তুলে ধরার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রচার করে।

উদাহরণ: ভূমি দখল, শ্রমিক অধিকারের সমস্যা বা সেবাবঞ্চিত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা।

**৫. ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই**

- **কীভাবে সাহায্য করে**
  - মিথ্যা সংবাদ, ঘৃণা বক্তব্য এবং প্রচারণা চ্যালেঞ্জ করে।
  - ফ্যাক্টচেকিং ও ব্যালান্সড রিপোর্টিং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব কমায় এবং সাধারণ বোঝাপড়া তৈরিতে সাহায্য করে।

**৬. আইনের শাসন এবং বিচারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ**

- **কীভাবে সাহায্য করে**
  - আদালতের মামলা, বিচারিক দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপব্যবহার নিয়ে রিপোর্ট করলে তার ওপর জনসাধারণের চাপ তৈরি হয়।
  - দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, যেখানে কর্মকর্তারা জানেন তারা পর্যবেক্ষণাধীন।

**৭. সরকারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি**

- **কীভাবে সাহায্য করে**
  - সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও স্বচ্ছ ও সক্রিয় হতে চাপ সৃষ্টি করে।
  - নেতাদের প্রশ্ন করার এবং তথ্য চাওয়ার জন্য একটি পাবলিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।

**বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ**

- সেন্সরশিপ এবং আইনি হুমকি।
- মালিকানার কেন্দ্রীকরণ; অনেক সংবাদমাধ্যম রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।
- সাংবাদিকদের হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শন।
- সেল্ফ-সেন্সরশিপের ভয় বা চাপের কারণে শৈথিল্য।

**কী করতে হবে**

১. আইন সংস্কার এবং দমনমূলক আইন বাতিল করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা।
২. সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন পাবলিক ব্রডকাস্টার।
৩. অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সহায়তা করা অর্থায়ন এবং নিরাপত্তার মাধ্যমে।
৪. নাগরিকদের গণমাধ্যম সাক্ষরতা প্রোগ্রাম চালানো, যাতে তারা পক্ষপাতিত্ব এবং ভুল তথ্য চিহ্নিত করতে পারে।
৫. মজবুত সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যাতে মুক্ত মত প্রকাশ রক্ষা করা যায়।

**সারসংক্ষেপ**

গণমাধ্যম বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য একটি শক্তিশালী শক্তি হতে পারে। এটি দুর্নীতি উন্মোচন করতে, ভোটারদের শিক্ষিত করতে, জনগণের কণ্ঠ জোরদার করতে এবং দায়বদ্ধতা দাবি করতে পারে। তবে এর জন্য সংবাদমাধ্যম স্বাধীন, ন্যায়পরায়ণ, নৈতিক ও সুরক্ষিত হতে হবে।

# স্বাধীন সংবাদমাধ্যম একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের জন্য কেন অপরিহার্য

একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একেবারেই অপরিহার্য। এটি গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে, যা নিশ্চিত করে যে নাগরিকেরা সঠিকভাবে অবহিত, প্রার্থীরা জবাবদিহির আওতায় আছেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিজস্ব সততা বজায় থাকতে পারেন। একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ছাড়া নির্বাচন শুধু গণতন্ত্রের একটি প্রহসনে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, যেখানে প্রকৃত জন-অংশগ্রহণ এবং বৈধতার অভাব ঘটে।

## অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কেন অপরিহার্য

**১. ভোটার অবহিতকরণ: বিস্তৃত তথ্যে প্রবেশাধিকার:** একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ভোটারদের সকল প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, তাদের প্ল্যাটফর্ম এবং নীতি প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এটি নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বুঝতে এবং তাঁদের ভোট দেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

**অধিকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝা:** সাংবাদিকেরা জনসাধারণকে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, কোথায় ভোট দিতে হয় এবং তাঁদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করেন। এটি বিভ্রান্তি কমায় এবং অধিক ভোটার উপস্থিতি উৎসাহিত করে।

**২. ক্ষমতাকে জবাবদিহি করা (প্রহরী বা ওয়াচডগের ভূমিকা)**

**প্রার্থী ও ক্ষমতাসীনদের যাচাই-বাছাই:** একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম প্রার্থী এবং ক্ষমতাসীনদের অতীত রেকর্ড, প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব তদন্ত করে। এই যাচাই-বাছাই ভোটারদের সম্ভাব্য দুর্নীতি, অযোগ্যতা বা অপ্রকাশিত অ্যাজেন্ডা শনাক্তে সহায়তা করে।

**দুর্নীতি ও জালিয়াতি উন্মোচন:** সাংবাদিকেরা প্রহরী হিসেবে কাজ করেন। নির্বাচনী জালিয়াতি, অনিয়ম, ভোটারদের ভয় দেখানো বা রাজনৈতিক দলগুলোর রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহারের যেকোনো লক্ষণ তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন। এই ধরনের অসদাচরণ প্রকাশ করার মাধ্যমে, তাঁরা অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে পারেন এবং সংশোধনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারেন।

**সকল পক্ষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব:** একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের জন্য সমতাপূর্ণ কভারেজ দেওয়ার চেষ্টা করে, যা নিশ্চিত করে যে ভোটাররা শুধু ক্ষমতাধরদের পছন্দের কণ্ঠস্বর নন, বরং বিভিন্ন ধরনের কণ্ঠস্বর শুনতে পান।

**৩. জনগণের আলোচনা ও বিতর্কের সুবিধা**

**আলোচনার প্ল্যাটফর্ম:** একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম একটি পাবলিক ফোরাম তৈরি করে, যেখানে বিভিন্ন ধারণা, মতামত ও দৃষ্টিকোণ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে বিতর্ক করা যায়। এটি নাগরিকদের অর্থপূর্ণ আলোচনায় জড়িত হতে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জটিল বিষয়গুলো বুঝতে এবং তাদের নিজস্ব মতামতকে পরিমার্জন করতে সহায়তা করে।

**ভুল তথ্য চ্যালেঞ্জ করা:** ডিজিটাল তথ্যের যুগে, ভুল তথ্য, অপতথ্য প্রচার মোকাবিলায় একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কঠোর তথ্য-যাচাই এবং বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে, এটি নাগরিকদের সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করতে সাহায্য করে, জনমত নিয়ে কারসাজি প্রতিরোধ করে।

**৪. স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস নিশ্চিত করা**

**নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা:** ভোটার নিবন্ধন থেকে শুরু করে প্রচারণা, ভোট গ্রহণের দিন, ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যম পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতায় অবদান রাখে। এই উন্মুক্ত রিপোর্টিং নির্বাচনের সততায় জনবিশ্বাস তৈরি করতে সহায়তা করে।

**ফলাফলের বৈধতা:** যখন সংবাদমাধ্যম নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ন্যায্য ও বিস্তারিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে অফিশিয়াল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই করে, তখন এটি ফলাফলের বৈধতা প্রদান করে। এটি ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের আত্মপ্রকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ**

একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করে যে নির্বাচনের সময় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং সমাজের কম প্রতিনিধিত্বশীল অংশগুলোর উদ্বেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি শোনা যায়। এই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে সকল নাগরিক নিজেদের প্রতিনিধিত্বশীল মনে করেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন।

## স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ছাড়া নির্বাচনের ঝুঁকি

যদি সংবাদমাধ্যম স্বাধীন না হয় বা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে:

- **ভোটার কারসাজি:** ভোটাররা শুধু পক্ষপাতদুষ্ট বা অসম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারে, যা তাঁদের প্রচারণার শিকার করে তোলে এবং সত্যিকারভাবে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম করে তোলে।
- **জবাবদিহির অভাব:** সংবাদমাধ্যমের যাচাই-বাছাই ছাড়া, প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলো দায়মুক্তি নিয়ে কাজ করতে পারে, দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে কিংবা প্রকাশের ভয় ছাড়াই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।
- **ভিন্নমতের দমন:** সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে দমন করা যেতে পারে। ফলে অর্থপূর্ণ বিতর্কের অনুপস্থিতি এবং অবাধ ক্ষমতার বিস্তার ঘটে।
- **নির্বাচনী জালিয়াতি:** স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ছাড়া, নির্বাচনী জালিয়াতি এবং অনিয়ম ঘটার এবং অব্যবস্থাপনা অপ্রকাশিত থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনবিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসের অভাব ব্যাপক অসন্তোষ, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এবং এমনকি সহিংসতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা জাতীয় স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে।

সংক্ষেপে, একটি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম নির্বাচনের সময় জনগণের চোখ ও কান হিসেবে কাজ করে। এটি নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করে, ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পছন্দের জন্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য তথ্য সরবরাহ করে। এটি ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণাই ব্যাহত হয়।

## বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা (২০২৫ সালের প্রথম থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত) সাম্প্রতিক বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে কিছু উন্নতি সত্ত্বেও একটি জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি হিসেবে রয়ে গেছে। শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও, অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য বাধা তৈরি করে চলেছে।

এখানে মূল দিকগুলোর একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

### ১. বিশ্ব গণমাধ্যম স্বাধীনতা সূচক ২০২৫

- বাংলাদেশ তার র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছে, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের (আরএসএফ) বিশ্ব গণমাধ্যম স্বাধীনতা সূচক ২০২৫-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬ ধাপ এগিয়ে ১৪৯তম স্থানে পৌঁছেছে। এটি ২০২৪ সালের ১৬৫তম এবং ২০২৩ সালের ১৬৩তম স্থান থেকে একটি অগ্রগতি।
- এটি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে (১৫১তম), ভুটানকে (১৫২তম) এবং পাকিস্তানকে (১৫৮তম) ছাড়িয়ে গেছে। তবে এটি এখনো নেপাল (৯০তম), মালদ্বীপ (১০৪তম) এবং শ্রীলঙ্কার (১৩৯তম) চেয়ে পিছিয়ে আছে।
- আরএসএফ পাঁচটি সূচকেই উন্নতির কথা স্বীকার করেছে: রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, আইনি কাঠামো, আর্থসাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা।

### ২. রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব (আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী)

- গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতন বাংলাদেশের গণমাধ্যমের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে দশকের পর দশক ধরে গড়ে ওঠা দমন-পীড়ন এবং সেল্‌ফ-সেন্সরশিপের পরিবেশ এখনো সহজে পরিবর্তন হচ্ছে না।
- নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার দেশের সার্বিক সংস্কারের দায়িত্ব নেয় এবং একটি গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি দীর্ঘদিনের হুমকিগুলো নিয়ে কাজ করে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

### ৩. আইনি কাঠামো এবং উদ্বেগ

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) থেকে সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ): অত্যন্ত বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ), যা ভিন্নমত দমন এবং সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল, ২০২৪ সালের

জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস আগে সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ) নামে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। তবে নতুন আইন নিয়েও উদ্বেগ ছিল।

- নতুন আইনকে একটি উন্নতি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও উদ্বেগ রয়ে গেছে। মানবাধিকার সংস্থা, সাংবাদিক সংগঠন সমালোচকেরা এখনো আশঙ্কা করছেন, এটি ডিএসএর একটি "দুর্বল অনুলিপি" এবং এতে অস্পষ্ট ও অত্যধিক বিস্তৃত বিধান রয়েছে, যা বাক্‌স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে, ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি ও গ্রেপ্তার করার অনুমতি দিতে এবং সংবাদ উৎসের (সোর্সের) গোপনীয়তা লঙ্ঘন করতে পারে।
- অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে তাতে পরিবর্তন এনে যে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে, তাতেও ব্যবহারকারীর ডেটা অ্যাকসেস করার, অনলাইন কনটেন্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার এবং রাষ্ট্র অনুমোদিত নজরদারিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য সরকারের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে উদ্বেগ বাড়ায়। এই আইনগুলো প্রণয়নের স্বচ্ছতা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে।

**৪. গণমাধ্যমের মালিকানা ও রাজনৈতিক প্রভাব**

- একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হলো গণমাধ্যম আউটলেটগুলোর একচেটিয়া মালিকানা, যা প্রায়শই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন বড় ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর হাতে থাকে। এই মালিকেরা কখনো কখনো সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেন বা তাঁদের গণমাধ্যমগুলোকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রাধিকার না দিয়ে প্রভাব ও মুনাফার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।
- গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন একটি "এক প্রতিষ্ঠান এক গণমাধ্যম" নীতির প্রস্তাব করেছে এবং একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করার জন্য বৃহত্তর গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর পাবলিক তালিকাভুক্তির সুপারিশ করেছে। তবে ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকার এই সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।
- অনেক সংবাদপত্র সরকারি বিজ্ঞাপন এবং আমদানি করা নিউজপ্রিন্ট থেকে রাষ্ট্রীয় তহবিলের ওপর নির্ভরশীল থাকে, যা আর্থিক দুর্বলতা এবং সরকারি চাপের প্রতি সংবেদনশীলতা তৈরি করতে পারে।

**৫. সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও ভীতি প্রদর্শন**

- সরকার পরিবর্তনের পরেও সাংবাদিকেরা বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে হুমকি, হয়রানি এবং শারীরিক সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছেন, যাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী, প্রতারক এবং কিছু ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপাদানও রয়েছে (যদিও আরএসএফ র‍্যাবের ভূমিকায় "নির্যাতনকারী থেকে রক্ষাকারী" এর সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছে)।
- শারীরিক হামলা, ফৌজদারি মামলাসহ সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এটি ভয়াবহ প্রভাব তৈরি করে এবং সাংবাদিকদের মধ্যে সেল্‌ফ-সেন্সরশিপকে উৎসাহিত করে।
- বিশেষ করে নারী সাংবাদিকেরা পুরুষ-প্রধান শিল্প সংস্কৃতি, আকর্ষণীয় বিটের অভাব (প্রায়শই "নারীর গল্প" বা বিনোদনে সীমাবদ্ধ) এবং অনলাইনে ঘৃণা প্রকাশ ও শারীরিক হামলার বর্ধিত ঝুঁকির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

**৬. অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং পেশাদারত্ব**

- অনেক তৃণমূল পর্যায়ের সাংবাদিক ন্যূনতম মজুরি এবং চাকরির নিরাপত্তা ছাড়াই কাজ করেন, যা তাঁদের স্থানীয় ক্ষমতাধরদের চাপের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে।
- অপর্যাপ্ত বেতন ও সুবিধা পেশাদারত্বের মানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এবং স্বাধীন রিপোর্টিংকে নিরুৎসাহিত করে। ন্যায্য বেতনকাঠামো এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমের মালিক ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

উপসংহারে, যদিও বাংলাদেশ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় পরিবর্তনের ফলে গণমাধ্যম স্বাধীনতার র‍্যাঙ্কিংয়ে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি দেখিয়েছে, তবু দেশটির গণমাধ্যম পরিস্থিতি এখনো ভঙ্গুর। দমনমূলক আইনের উত্তরাধিকার, নতুন আইন সম্পর্কে উদ্বেগ, ব্যাপক রাজনৈতিক ও মালিকানার প্রভাব এবং সাংবাদিকদের জন্য চলমান নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং শক্তিশালী গণমাধ্যম গড়ে তোলা এখনো একটি উল্লেখযোগ্য চলমান কাজ, যার জন্য টেকসই সংস্কার প্রচেষ্টা এবং সতর্কতা প্রয়োজন।

# সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে তা গতিশীল এবং বহুমুখী সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুলে দেয়, যা একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং এবং উদ্দীপনাপূর্ণ কাজের সুযোগের দিকনির্দেশ করে। এর অন্যতম নির্ণায়ক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদগ্রহীতা বা পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের আচরণের পরিবর্তন। কারণ, বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অবাধ প্রবাহনির্ভর কাজের জায়গাটি একটি সর্বদা বিকশিত ক্ষেত্র।

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎকে রূপদানকারী প্রধান দিকগুলোর একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

**১. প্রযুক্তির প্রভাব, বিশেষ করে এআই** (AI)

- **স্বয়ংক্রিয় রুটিন কাজ:** ডেটা (যেমন আর্থিক প্রতিবেদন, খেলার স্কোর, আবহাওয়া) থেকে সংবাদ তৈরি করতে এআই (AI) ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি সাংবাদিকদের আরও গভীর প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীল সংবাদগল্প বলার দিকে মনোযোগ দিতে সাহায্য করে।
- **উন্নত রিপোর্টিং এবং ডেটা বিশ্লেষণ:** এআই (AI) সরঞ্জামগুলো বিশাল ডেটাসেট প্রক্রিয়া করতে, প্যাটার্ন শনাক্ত করতে এবং সাংবাদিকদের লুকানো গল্পগুলো উন্মোচন করতে বা দ্রুত তথ্য যাচাই করতে সহায়তা করতে পারে। এটি নির্ভুলতা এবং গতি বাড়ায়।
- **ব্যক্তিগতকরণ এবং কিউরেশন:** এআই (AI) ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে নিউজ ফিড তৈরি করতে পারে, যা ব্যস্ততা কমাতে পারে। তবে এটি ফিল্টার বাবল এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সীমিত এক্সপোজার সম্পর্কে উদ্বেগও তৈরি করে।
- **তথ্য যাচাই এবং ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই:** মিথ্যা তথ্য শনাক্ত করতে এবং ফ্ল্যাগ করতে এআই-চালিত সরঞ্জাম তৈরি করা হচ্ছে, যা ব্যাপক ভুয়া খবরের যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **নতুন ফরম্যাট এবং বিতরণ:** এআই (AI) ভিডিও এবং অডিও থেকে ইন্টার‍্যাক্টিভ গ্রাফিকস পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ফরম্যাট তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে, যা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের (মোবাইল-ফার্স্ট, সোশ্যাল মিডিয়া, পডকাস্ট) জন্য অনুকূল।
- **নৈতিক বিবেচনা:** সাংবাদিকতায় এআই (AI)-এর উত্থান নৈতিক নির্দেশিকা, এআই (AI) ব্যবহারে স্বচ্ছতা, অ্যালগরিদমে পক্ষপাত রোধ এবং মেধাস্বত্ব সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় সতর্ক বিবেচনা প্রয়োজন।

**২. সংবাদগ্রহীতাদের আচরণ এবং ব্যস্ততা পরিবর্তন**

- **মোবাইল-ফার্স্ট ব্যবহার:** টেলিভিশন খবরের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন স্মার্টফোনে দেখা হয়, যার জন্য সাংবাদিকদের মোবাইলবান্ধব বিষয়বস্তু এবং কৌশল তৈরি করতে হবে।
- **হাইপারলোকাল খবরের চাহিদা:** বৈশ্বিক খবর সহজলভ্য হওয়ায়, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং ঘটনাগুলোতে নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, যা বিশ্বাস এবং সম্পর্ক বৃদ্ধি করে।
- **ব্যস্ততা এবং বিশ্বাস:** জনসাধারণের বিশ্বাস তৈরি করা এবং বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে স্বচ্ছ রিপোর্টিং, নৈতিক অনুশীলন এবং বিভিন্ন ব্যস্ততা উদ্যোগের মাধ্যমে সংবাদগ্রহীতাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তোলা জড়িত।
- **বৈচিত্র্যময় প্ল্যাটফর্ম:** সংবাদ সংস্থাগুলো ঐতিহ্যবাহী ওয়েবসাইট ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া, নিউজলেটার, পডকাস্টসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পাঠক-দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

**৩. আর্থিক স্থায়িত্বের চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান**

- **ঐতিহ্যবাহী রাজস্ব মডেলের ব্যাহত হওয়া:** মুদ্রণ বিজ্ঞাপনের পতন এবং গুগল ও ফেসবুকের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আধিপত্য ঐতিহ্যবাহী রাজস্ব প্রবাহকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।
- **বৈচিত্র্যময় রাজস্ব প্রবাহ:** সংবাদ সংস্থাগুলো বিভিন্ন মডেল অন্বেষণ করছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - **পে-ওয়াল এবং সদস্যপদ:** পাঠকদের বিষয়বস্তুর জন্য অর্থ প্রদান করতে বলা।
  - **ক্রাউডফান্ডিং:** সংবাদগ্রহীতা ও কমিউনিটির সমর্থনের ওপর নির্ভর করা।
  - **স্পনসর করা বিষয়বস্তু এবং নেটিভ বিজ্ঞাপন:** স্বচ্ছতার সঙ্গে স্পনসর করা বিষয়বস্তুর নৈতিকতা সংহতকরণ।
  - **ইভেন্ট এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবা:** ইভেন্ট আয়োজন, শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম বা ডেটা পরিষেবা প্রদান।

- **জনসাধারণের কল্যাণ বনাম বাজারের ব্যর্থতা:** কেউ কেউ যুক্তি দেন যে সাংবাদিকতা, বিশেষ করে জনস্বার্থ সাংবাদিকতা, একটি জনহিতকর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং পরোক্ষ ভর্তুকির (যেমন সাবস্ক্রিপশনের জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট) মাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।
- **পরিচালনগত দক্ষতা:** কর্মপ্রবাহ অপটিমাইজ করা, সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং অপচয় হ্রাসের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার টেকসইকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**৪. চলমান চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ**

- **জনসাধারণের বিশ্বাসের পতন:** পক্ষপাতিত্ব, সংবেদনশীলতা এবং স্বচ্ছতার অভাব অবিশ্বাসের মূল কারণ। সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে রয়েছে নৈতিক রিপোর্টিং এবং কার্যক্রমে বৃহত্তর স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া।
- **তথ্যের ওভারলোড এবং ভুল তথ্য:** বিপুল তথ্য এবং ভুয়া খবরের বিস্তার সংবাদগ্রহীতাদের জন্য সত্যকে উপলব্ধি করা কঠিন করে তোলে। তথ্য যাচাই এবং গণমাধ্যম লিটারেসি প্রোগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **গতি বনাম নির্ভুলতার চাপ:** তাৎক্ষণিক খবরের চাহিদা নির্ভুলতার সঙ্গে আপস করতে পারে। সাংবাদিকদের যাচাইবিহীন তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- **সাংবাদিকদের মানসিক স্বাস্থ্য:** সাংবাদিকেরা প্রায়শই চাপপূর্ণ পরিস্থিতি এবং বেদনাদায়ক ঘটনার মুখোমুখি হন। যে জন্য নিউজরুমে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানকে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।
- **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং আক্রমণের শিকার:** বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকেরা হুমকি, হয়রানি এবং সেন্সরশিপের শিকার হন। শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা এবং ডিজিটাল সুরক্ষার জন্য অ্যাডভোকেসি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষেপে, সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশে উদ্ভাবন, মানিয়ে নেওয়া এবং এর মূল মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার ক্ষমতার ওপর সংজ্ঞায়িত হবে। এর অর্থ হলো এআই (AI)-এর মতো নতুন প্রযুক্তিগুলোকে দায়িত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা, সংবাদগ্রহীতাদের বৈচিত্র্যকে বোঝা এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, টেকসই ব্যবসায়িক মডেলগুলোর অন্বেষণ করা এবং নির্ভুল, নৈতিক ও জনস্বার্থকেন্দ্রিক প্রতিবেদনের জন্য নিরলস সাধনা করা। লক্ষ্য হলো, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের অবহিত ও ক্ষমতায়ন করে– এমন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা।

## রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ

গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা এক গভীর পরিবর্তনের মুখোমুখি, যা বৃহত্তর সাংবাদিকতা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। তবে এর নিজস্ব অনন্য রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। এর ভবিষ্যৎ নিচে আলোচনা করা হলো:

**১. ডিজিটাল বিপ্লব এবং এর দ্বৈত প্রভাব**

- **২৪/৭ সংবাদচক্র:** ডিজিটাল মাধ্যম এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলোর ২৪/৭ প্রকৃতি বোঝায় যে রাজনৈতিক খবর তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়। এটি সাংবাদিকদের দ্রুত তথ্য সরবরাহ করতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, কখনো কখনো গভীর বিশ্লেষণ এবং যাচাইকরণের বিনিময়ে।
- **সরাসরি যোগাযোগ ও মধ্যস্থতা হ্রাস:** রাজনীতিবিদরা ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক মাধ্যম (যেমন এক্স/টুইটার, ফেসবুক, টিকটক) ব্যবহার করে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করেন, ঐতিহ্যবাহী মিডিয়া গেটকিপারদের পাশ কাটিয়ে। এটি চ্যালেঞ্জ (ঘটনার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো, অপরিশোধিত বার্তার প্রবাহ) এবং সুযোগ (সরাসরি ব্যস্ততা, ফ্রেশ রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবেশাধিকার) উভয়ই তৈরি করে।
- **পাঠক-দর্শক-শ্রোতা বিভাজন:** ডিজিটাল পরিবেশ মানুষকে তাদের বিদ্যমান পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবাদ ব্যবহার করতে দেয়, যা "প্রতিধ্বনি" এবং "ফিল্টার বাবল" তৈরি করে। এটি রাজনৈতিক মেরুকরণকে বাড়িয়ে তোলে এবং রাজনৈতিক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদনসহ সংবাদগ্রহীতাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন করে তোলে।
- **"নতুন রাজনৈতিক মিডিয়ার" উত্থান:** ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার পাশাপাশি, শুধু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ব্লগ এবং সামাজিক মিডিয়া প্রভাবশালীদের একটি বিশাল জগৎ, যা এখন রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এটি আরও জটিল এবং প্রায়শই কম নিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রবাহ তৈরি করে।

### ২. ভুল তথ্য, বিভ্রান্তি এবং "ভুয়া খবরের" বিরুদ্ধে লড়াই

- **ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা:** রাজনৈতিক সাংবাদিকতা মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল, যা প্রায়শই জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়। ডিপফেক এবং এআই (AI)-সৃষ্ট বিষয়বস্তু (যেমন কারও এআই-ক্লোনড বক্তৃতা) উদীয়মান হুমকি।
- **তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা:** ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সাংবাদিকদের শক্তিশালী এবং সক্রিয় তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এআই (AI) সরঞ্জামগুলো ভুল তথ্য শনাক্তকরণ এবং মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, তবে সূক্ষ্ম যাচাইকরণ এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য মানব দক্ষতা অত্যাবশ্যক।
- **গণমাধ্যম সাক্ষরতা:** একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হলো জনসাধারণের গণমাধ্যম সাক্ষরতার উন্নতি। নাগরিকদের তথ্য সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করতে এবং অনির্ভরযোগ্য উৎস শনাক্ত করতে সক্ষম করা। এই শিক্ষায় রাজনৈতিক সাংবাদিকদের একটি ভূমিকা পালন করতে হবে।

### ৩. বিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং জনসেবার ওপর জোর দেওয়া

- **আস্থার পতন:** অনুভূত পক্ষপাতিত্ব, সংবেদনশীলতা এবং মূল বিষয়গুলোর পরিবর্তে "ঘোড়দৌড়ের" রাজনীতির ওপর গুরুত্ব প্রদানের কারণে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা জনসাধারণের আস্থায় উল্লেখযোগ্য পতন প্রত্যক্ষ করছে।
- **নাগরিক সাংবাদিকতা/গণসাংবাদিকতার দিকে পরিবর্তন:** "নাগরিক সাংবাদিকতা" বা "গণসাংবাদিকতার" জন্য একটি নতুন প্রেরণা রয়েছে, যার লক্ষ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে কমিউনিটিকে পুনরায় যুক্ত করা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - **সংলাপ আয়োজন:** নাগরিক, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ প্রদান।
  - **প্রভাবের ওপর ফোকাস:** রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে গিয়ে।
  - **স্বচ্ছতা:** সাংবাদিকতার পদ্ধতি, উৎস এবং সম্ভাব্য পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া।
  - **স্থানীয় জোর:** কমিউনিটির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন স্থানীয় রাজনৈতিক খবরের চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়া।
- **জবাবদিহি এবং ওয়াচডগ ভূমিকা:** চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক সাংবাদিকতার মূল ওয়াচডগ ফাংশন; ক্ষমতাকে জবাবদিহি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ দুর্নীতি, নীতির প্রভাব এবং সুশাসন নিয়ে আরও বেশি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা।

### ৪. এআই (AI)-এর বিবর্তনশীল ভূমিকা

- **ডেটা-নির্ভর রাজনৈতিক সাংবাদিকতা:** এআই (AI) এবং মেশিন লার্নিং রাজনীতিতে ডেটা সাংবাদিকতার বিপ্লব ঘটাবে, সাংবাদিকদের সক্ষম করবে:
  - বিস্তৃত ডেটাসেট (যেমন প্রচারাভিযান অর্থায়ন, ভোটের রেকর্ড, জনসাধারণের মনোভাব) বিশ্লেষণ করে প্রবণতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শনাক্ত করা।
  - ইন্টার‍্যাক্টিভ ভিজ্যুয়ালাইজেশন তৈরি করা, যা জটিল রাজনৈতিক ডেটা বোধগম্য করে তোলে।
- **রুটিন রিপোর্টিংয়ের স্বয়ংক্রিয়তা:** এআই (AI) নির্বাচনের ফলাফল, আইনসভার ভোট এবং অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ওপর প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয় করতে পারে, যা সাংবাদিকদের আরও গভীর বিশ্লেষণ এবং মূল প্রতিবেদনের জন্য মুক্ত করে।
- **বিষয়বস্তু তৈরি (সতর্কতার সঙ্গে):** যদিও এআই (AI) প্রাথমিক প্রতিবেদন বা সারাংশ তৈরি করতে পারে, তবে রাজনৈতিক বিষয়বস্তুতে নির্ভুলতা, প্রেক্ষাপট এবং অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত এড়ানো নিশ্চিত করতে মানবিক তদারকি অপরিহার্য হবে।
- **ব্যক্তিগতকরণ (এবং এর সমস্যা):** এআই (AI) নিউজ ফিডকে কাস্টমাইজ করতে পারে, তবে রাজনৈতিক সাংবাদিকদের বিদ্যমান পক্ষপাতিত্বকে শক্তিশালী করার ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল নিশ্চিত করা নয়, অবহিত করা।

### ৫. নতুন ব্যবসায়িক মডেল এবং স্থায়িত্ব

- **বৈচিত্র্যময় রাজস্ব প্রবাহ:** মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গতানুগতিকভাবে আয়ের যে ধারণা তার বাইরে যেতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - **সাবস্ক্রিপশন:** পাঠকদের সরাসরি মানসম্মত রাজনৈতিক প্রতিবেদনের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে বলা।

- **অনুদান:** জনস্বার্থ সাংবাদিকতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফাউন্ডেশন থেকে তহবিল।
- **ইভেন্ট আয়োজন:** ফোরাম, বিতর্ক বা শিক্ষামূলক সেশন আয়োজন।

- **নিশে এবং হাইপারলোকাল ফোকাস:** নির্দিষ্ট নীতি ক্ষেত্র বা স্থানীয় কমিউনিটিগুলোতে ফোকাস করা ছোট, বিশেষায়িত রাজনৈতিক সংবাদ আউটলেটগুলো অত্যন্ত ব্যস্ত সংবাদগ্রহীতাদের সেবা দিয়ে টেকসই মডেল খুঁজে পেতে পারে।

**৬. মানবিক উপাদান অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে**

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও, রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ এখনো মানব সাংবাদিকদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে:

- **সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সূক্ষ্মতা:** রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, মানবিক অনুপ্রেরণা এবং ক্ষমতার গতিশীলতার জটিলতাগুলো বোঝা।
- **অনুসন্ধানী বিচক্ষণতা:** সরকারি বিবৃতিগুলোর বাইরে কাজ করা, উৎস তৈরি করা এবং লুকানো সত্যগুলো উন্মোচন করা।
- **নৈতিক বিচার:** সংবেদনশীল বিষয়গুলো পরিচালনা করা, উৎস রক্ষা করা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।
- **গল্প বলা:** জনসাধারণের আগ্রহের সাথে সংগতি রেখে আকর্ষণীয় প্রতিবেদন তৈরি করা এবং জটিল রাজনৈতিক বিষয়গুলো সহজ করে বলা।
- **সহানুভূতি এবং প্রেক্ষাপট:** রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মানবিক প্রভাব বোঝা এবং বিভিন্ন মতামত তুলে ধরা।

উপসংহারে, রাজনৈতিক সাংবাদিকতা প্রযুক্তিগত বিঘ্নতা, আস্থার পতন এবং তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখোমুখি। তবে, এটি গভীর বিশ্লেষণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার, নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে কমিউনিটির সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হওয়ার এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং প্রভাবপূর্ণ প্রতিবেদন সরবরাহ করে একটি সুস্থ গণতন্ত্রে এর অপরিহার্য ভূমিকা পুনরায় নিশ্চিত করার অভূতপূর্ব সুযোগও রয়েছে। ভবিষ্যৎ তাদেরই হবে, যারা উদ্ভাবন করতে পারবে এবং নির্ভুলতা, ন্যায্যতা এবং জবাবদিহির মূলনীতিগুলো কঠোরভাবে রক্ষা করতে পারবে।

## রাজনৈতিক প্রতিবেদনের ধারণা

যেহেতু বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে সুশাসনের সংকটে ভুগছে, তাই রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ভূমিকা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সংকটের মধ্যেই অনেক রাজনৈতিক প্রতিবেদনের ধারণা লুকিয়ে আছে।

এখানে কিছু রাজনৈতিক প্রতিবেদনের ধারণার তালিকা দেওয়া হলো:

- **নির্বাচনী অনিয়ম ও অভিযোগ:** কোনো নির্বাচনে ঘটে যাওয়া অনিয়ম, ভোট কারচুপি বা বিরোধী দলের অভিযোগ নিয়ে গভীর অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন।
- **ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল:** ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, অভ্যন্তরীণ বিভেদ বা নীতিগত মতপার্থক্য নিয়ে প্রতিবেদন।
- **বিরোধী জোটের দুর্বলতা ও কৌশল:** বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সরকারের বিরুদ্ধে তাদের কৌশল কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ।
- **নীতি নির্ধারণে আমলাতন্ত্রের প্রভাব:** সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা, তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান।
- **উন্নয়ন প্রকল্পের রাজনৈতিকীকরণ:** বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন।
- **আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক প্রভাব:** আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন বা রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে প্রতিবেদন।

- **স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) ক্ষমতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ।
- **শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক সংঘাত:** বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতিকে কেন্দ্র করে সংঘাত, দখলদারত্ব বা সহিংসতার ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন।
- **রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা:** রাজনীতিবিদদের দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
- **পরিবেশ নীতিতে রাজনৈতিক প্রভাব:** পরিবেশগত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক চাপ, লবিং বা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান।

বাংলাদেশের দুর্বল নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রতিবেদনের জন্য কিছু ধারণা দেওয়া হলো, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং প্রভাবের ওপর আলোকপাত করে:

### ১. নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয়: নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিয়ে একটি বিশ্লেষণ

**ফোকাস:** নির্বাহী বিভাগ থেকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (বিইসি) স্বাধীনতার প্রভাব পরীক্ষা করা।

**মূল ক্ষেত্র:** কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, নির্বাচনী আইন প্রয়োগে তাদের স্বায়ত্তশাসন, জালিয়াতির অভিযোগ মোকাবিলার ক্ষমতা এবং তাদের নিরপেক্ষতার ওপর জনসাধারণের আস্থা বিশ্লেষণ করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** রাজনৈতিক প্রভাবের প্রমাণ, স্বায়ত্তশাসনের জন্য অপর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইসির সুনাম হ্রাস।

### ২. ব্যালট বাক্সের বাইরে: ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা এবং দমনমূলক কৌশল নিয়ে একটি অনুসন্ধান

**ফোকাস:** নির্বাচন চলাকালীন ভোটারদের ভয় দেখানো এবং সহিংসতার বিভিন্ন রূপ নথিভুক্ত করা।

**মূল ক্ষেত্র:** শারীরিক আক্রমণ, হুমকি, ব্যালট বাক্স ভর্তি করা, ভোটকেন্দ্র থেকে জোরপূর্বক বহিষ্কারের ঘটনা এবং কীভাবে এগুলো ভোটারদের উপস্থিতি ও পছন্দের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে প্রতিবেদন করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের শক্তির পদ্ধতিগত ব্যবহার, ভোটারদের জন্য কার্যকর সুরক্ষার অভাব এবং বিরোধী সমর্থকদের ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অসম প্রভাব।

### ৩. "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" বিতর্ক: এর ভূমিকা এবং বিলুপ্তির প্রভাব নিয়ে একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

**ফোকাস:** বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস ও যুক্তি এবং এর বিলুপ্তির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অন্বেষণ করা।

**মূল ক্ষেত্র:** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল, জনসাধারণের আস্থার মাত্রা এবং এর পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি বিশ্লেষণ করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর নির্বাচনী অনিয়ম এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের পুনরুত্থান।

### ৪. ডিজিটাল দমন এবং অপতথ্য: নির্বাচনী অখণ্ডতা দুর্বল করতে প্রযুক্তির ব্যবহার

**ফোকাস:** নির্বাচনী পরিবেশকে প্রভাবিত করতে ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং কৌশলের ব্যবহার তদন্ত করা।

**মূল ক্ষেত্র:** বিক্ষোভ ও সমাবেশের সময় ইন্টারনেট বন্ধ, সাংবাদিক ও কর্মীদের অনলাইন হয়রানি ও সেন্সরশিপ এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট অপতথ্যের বিস্তার নিয়ে প্রতিবেদন করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব, নাগরিক মতপ্রকাশের সুযোগ সংকোচন এবং ভোটারদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর প্রভাব।

### ৫. অর্থ-পেশি সংযোগ: বাংলাদেশের নির্বাচনে অবৈধ অর্থায়ন এবং জবরদস্তির ভূমিকা উন্মোচন

**ফোকাস:** নির্বাচনী ফলাফলের ওপর অর্থ এবং "পেশিশক্তির" (জবরদস্তি, রাজনৈতিক কর্মীদের সহিংসতা) প্রভাব অনুসন্ধান করা।

**মূল ক্ষেত্র:** নির্বাচনী আর্থিক অনিয়ম, প্রার্থীদের সম্পদের বৈষম্য, ভোট কেনার অনুশীলন এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে অপরাধী উপাদানগুলোর ব্যবহার বিশ্লেষণ করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সম্পদ সংগ্রহ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্কের প্রমাণ এবং জনসেবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভের দিকে নির্বাচনী উদ্দেশ্যের পরিবর্তন।

### ৬. বিরোধীদের বাধা: বিরোধী দলগুলোর আইনি ও রাজনৈতিক বাধা নিয়ে একটি প্রতিবেদন

**ফোকাস:** নির্বাচনে অংশ নিতে এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে বিরোধী দলগুলোর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা।

**মূল ক্ষেত্র:** বিরোধী নেতা ও কর্মীদের গণগ্রেপ্তার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনি মামলা, সমাবেশ ও সংগঠনের ওপর বিধিনিষেধ এবং বর্জন নিয়ে প্রতিবেদন করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** একটি উল্লেখযোগ্যভাবে অসম খেলার ক্ষেত্র, যা কার্যত একদলীয় আধিপত্য এবং সীমিত প্রকৃত নির্বাচনী প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করে।

### ৭. আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ: বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে বৈশ্বিক পর্যবেক্ষকদের মূল্যায়নের একটি সংকলন ও বিশ্লেষণ

**ফোকাস:** আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন, মানবাধিকার সংস্থা এবং বিদেশি সরকারগুলোর প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন করা।

**মূল ক্ষেত্র:** নির্বাচনের ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তিমূলকতা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতি তাদের মূল্যায়ন তুলনা ও অসামঞ্জস্য অনুধাবন।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** অসম খেলার ক্ষেত্র, অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ এবং অনিয়ম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উত্থাপিত ধারাবাহিক উদ্বেগ।

### ৮. ভোটাধিকারবঞ্চিত ভোটার: কম ভোটার উপস্থিতি এবং ব্যবস্থার ওপর জনবিশ্বাসের অভাব বোঝা

**ফোকাস:** ভোটার উপস্থিতি হ্রাসের কারণ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর জনবিশ্বাসের ক্ষয় অনুসন্ধান করা।

**মূল ক্ষেত্র:** ভোটারদের মনোভাব বুঝতে সমীক্ষা পরিচালনা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা, বিরত থাকার ধরন বিশ্লেষণ করা এবং অনিয়ম ও জবাবদিহির অভাব পর্যালোচনা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** নাগরিকদের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, নির্বাচনের অর্থবহতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান হতাশা, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে।

### ৯. জেন্ডার কোটার বাইরে: নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন

**ফোকাস:** বাংলাদেশে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকলেও এই প্রতিবেদন তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তবতা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করবে।

**মূল ক্ষেত্র:** সংরক্ষিত আসনগুলো প্রকৃত প্রভাবে রূপান্তরিত হয় কি না, সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় নারীদের মুখোমুখি হওয়ার বাধা (যেমন প্রচারাভিযানে অর্থের অভাব, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব) এবং অরাজনৈতিক নারী প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান থাকলেও পদ্ধতিগত ও সামাজিক বাধার কারণে নারীদের জন্য প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমিত থাকে।

### ১০. সংস্কার: নির্বাচনী অখণ্ডতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি শক্তিশালী করার জন্য একটি ধারণা

**ফোকাস:** বাংলাদেশে ব্যাপক নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ এবং একটি রোডম্যাপ প্রস্তাব করা।

**মূল ক্ষেত্র:** নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শন প্রতিহত করার ব্যবস্থা, প্রার্থী নির্বাচন ও প্রচারাভিযানের অর্থের জন্য প্রস্তাবনা এবং নাগরিক সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের তদারকি উৎসাহিত করার কৌশলগুলো তুলে ধরা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলন এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট থেকে প্রাপ্ত কার্যকর নীতি সুপারিশগুলোর একটি সেট, যা জনবিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রচারের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

## সংসদের কার্যকারিতা: প্রতিবেদনের ধারণা

### ১. সংসদের কার্যকারিতা ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা: একটি বিশ্লেষণ

**ফোকাস:** আইন প্রণয়ন, বাজেট আলোচনা এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সংসদের সামগ্রিক দুর্বলতা পরীক্ষা করা।

**মূল ক্ষেত্র:** কমিটি পর্যায়ে বিলগুলোর অপর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই, সরকারের নির্বাহী শাখার ওপর অতি নির্ভরশীলতা এবং আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের (এমপি) সীমিত ভূমিকা নিয়ে প্রতিবেদন করা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** দুর্বল আইন যা জনগণের চাহিদা পূরণ করে না এবং নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার ওপর সংসদীয় তদারকির অভাব।

**২. অনুচ্ছেদ ৭০ এবং দলীয় শৃঙ্খলার কুফল: সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব**

**ফোকাস:** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রভাব, যা সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নিষেধ করে, তাদের স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং কার্যকারিতা।

**মূল ক্ষেত্র:** দলীয় হুইপের কঠোর প্রয়োগ, সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে কথা বলার বা ভোট দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত হওয়া এবং এর ফলে সংসদ একটি 'রাবার স্ট্যাম্পে' পরিণত হওয়ার প্রবণতা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** আইন প্রণয়নে প্রকৃত বিতর্কের অভাব এবং সংসদ সদস্যদের জনস্বার্থের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

**৩. কার্যকর বিরোধী দলের অভাব: সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিণতি**

**ফোকাস:** সংসদে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণ এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

**মূল ক্ষেত্র:** বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে চ্যালেঞ্জ (যেমন বর্জন, গ্রেপ্তার, আইনি হয়রানি), "গৃহপালিত বিরোধী দল"-এর ধারণা এবং এর ফলে সরকারের জবাবদিহির অভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** একচেটিয়া শাসন, সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি এবং সংসদীয় বিতর্কের মান হ্রাস।

**৪. সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার দুর্বলতা: তদারকি এবং সুশাসনের ওপর প্রভাব**

**ফোকাস:** সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর ক্ষমতা, কার্যকারিতা এবং তাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের অভাব পরীক্ষা করা।

**মূল ক্ষেত্র:** কমিটিগুলোর সদস্যদের স্বাধীনতা, মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর তাঁদের তদারকি ক্ষমতা এবং কমিটির সুপারিশের প্রতি সরকারের মনোভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** কমিটিগুলোর অকার্যকারিতা, সরকারের জবাবদিহির দুর্বলতা এবং সুশাসনের পথে বাধা।

**৫. সংসদে প্রতিনিধিত্বের ঘাটতি: নারী, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা**

**ফোকাস:** সংসদে দেশের সামাজিক বৈচিত্র্যের অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব; বিশেষ করে নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং দরিদ্রদের ক্ষেত্রে।

**মূল ক্ষেত্র:** সংরক্ষিত নারী আসনের কার্যকারিতা, সরাসরি নির্বাচিত আসনে নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সংসদের "ধনী ব্যক্তিদের ক্লাবে" পরিণত হওয়ার প্রবণতা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সমাজের বৃহৎ অংশের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সংসদের মধ্যে প্রতিফলিত না হওয়া এবং নীতি প্রণয়নে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ।

**৬. সংসদের বিতর্ক এবং আলোচনার মান: জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগের অভাব**

**ফোকাস:** সংসদীয় বিতর্কের গুণগত মান এবং জাতীয় গুরুত্বের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার অনুপস্থিতি।

**মূল ক্ষেত্র:** ব্যক্তিগত আক্রমণ, রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর এবং আসল নীতি আলোচনার পরিবর্তে সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য নিয়ে আলোচনায় অধিক সময় ব্যয়।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** নীতিগত বিতর্ক এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগের অভাব, যা কার্যকর আইন প্রণয়নে বাধা দেয়।

**৭. সংসদ সচিবালয়ের ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা: একটি বিশ্লেষণ**

**ফোকাস:** সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক সক্ষমতা, নিরপেক্ষতা এবং সংসদীয় কাজের সমর্থনে এর ভূমিকা।

**মূল ক্ষেত্র:** সচিবালয়ে কর্মীর অভাব, অপর্যাপ্ত সংস্থান এবং রাজনৈতিক প্রভাব থেকে এর স্বাধীনতা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সংসদীয় কার্যক্রমে প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং সংসদের স্বাধীন কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা।

**৮. স্পিকারের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা: সংসদীয় কার্যক্রমে বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট**

**ফোকাস:** স্পিকারের নিরপেক্ষতা এবং সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় তাঁর ভূমিকার ওপর একটি প্রতিবেদন।

**মূল ক্ষেত্র:** স্পিকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া, তাঁর সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ এবং সকল সংসদ সদস্যের প্রতি তাঁর ন্যায়বিচারের ধারণা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** স্পিকারের নিরপেক্ষতার ওপর আস্থার অভাব এবং সংসদীয় কার্যক্রমে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।

**৯. সংসদীয় কোরাম সংকট এবং অধিবেশনে অনুপস্থিতি: সময় ও সম্পদের অপচয়**

**ফোকাস:** সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট এবং সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সমস্যা।

**মূল ক্ষেত্র:** কোরাম সংকটের কারণে নষ্ট হওয়া সময় এবং অর্থ, এর পেছনের কারণ (যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা, দায়বদ্ধতার অভাব) এবং জনসেবার ওপর এর প্রভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** জনসাধারণের অর্থের অপচয় এবং সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালনে অনীহা।

**১০. সংসদীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা: একটি রোডম্যাপ**

**ফোকাস:** বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহি বাড়াতে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রস্তাবনা।

**মূল ক্ষেত্র:** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন, সংসদীয় কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা, একজন স্বাধীন স্পিকারের ভূমিকা নিশ্চিত করা, বিরোধী দলের জন্য একটি কার্যকর অবস্থান তৈরি করা এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বের বৈচিত্র্য বাড়ানোর প্রস্তাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** একটি বিস্তারিত সুপারিশমালা, যা বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্নতি ঘটাতে সহায়ক হতে পারে।

## বিচার বিভাগ সম্পর্কিত রাজনৈতিক প্রতিবেদনের ধারণা

**১. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগে দুর্বলতা: সবার জন্য সমানাধিকারের প্রশ্ন**

**ফোকাস:** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকলের জন্য সমানভাবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা বিশ্লেষণ করা।

**মূল ক্ষেত্র:** ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য আইনি সুবিধা, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের বিচার প্রাপ্তিতে বাধা এবং রাজনৈতিক মামলায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব এবং নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন।

**২. বিচারকের নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং যোগ্যতার প্রশ্ন: স্বচ্ছতা ও মেধার অভাব**

**ফোকাস:** বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার অভাব এবং মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে অন্যান্য বিবেচনায় নিয়োগের অভিযোগ।

**মূল ক্ষেত্র:** বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব, অনভিজ্ঞ বিচারকদের উচ্চ পদে পদায়ন এবং বিচারক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** বিচারকদের গুণগত মানের অবনতি এবং বিচার বিভাগের কার্যকারিতা হ্রাস।

**৩. রাজনৈতিক মামলা ও হয়রানি: ন্যায়বিচারের অপব্যবহার**

**ফোকাস:** রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক মামলায় গণগ্রেপ্তার ও হয়রানি।

**মূল ক্ষেত্র:** বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের, দ্রুত জামিন না পাওয়া এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের ব্যবহার।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** নাগরিক স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ, রাজনৈতিক পরিবেশের অবনতি এবং বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন।

**৪. আইনজীবী সমিতির রাজনৈতিকীকরণ: বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থ উপেক্ষিত**

**ফোকাস:** আইনজীবী সমিতিগুলোর রাজনৈতিক বিভাজন এবং এর ফলে বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার প্রবণতা।

**মূল ক্ষেত্র:** সমিতিগুলোর নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব, ধর্মঘট বা বর্জনের মতো কর্মসূচির কারণে বিচার প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন এবং আইনজীবীদের পেশাদারত্বের অভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** বিচারপ্রার্থীদের ব্যয় ও ভোগান্তি বৃদ্ধি এবং বিচারিক কার্যক্রম অনিয়মিত হওয়া।

**৫. সংবিধানের সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা: চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা**

**ফোকাস:** সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা পালনে চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা।

**মূল ক্ষেত্র:** জরুরি ক্ষমতা বা বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে মৌলিক অধিকারের সীমাবদ্ধতা, বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগের সীমাবদ্ধতা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায় নিষ্ক্রিয়তা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি এবং সাংবিধানিক শাসনের দুর্বলতা।

## নির্বাহী বিভাগে রাজনৈতিক প্রভাবঃ প্রতিবেদনের ধারণা

### ১. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং একচ্ছত্র আধিপত্যঃ নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত ক্ষমতা

**ফোকাসঃ** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ, যা অন্য শাখাগুলোর (যেমন সংসদ ও বিচার বিভাগ) তদারকি ও ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি করে।

**মূল ক্ষেত্রঃ** গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রিপরিষদের দুর্বল ভূমিকা এবং নির্বাহী আদেশের ব্যাপক ব্যবহার।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** জবাবদিহির অভাব, স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি।

### ২. রাজনৈতিকীকরণ এবং আমলাতন্ত্রের মেরুকরণঃ দলীয় আনুগত্যের প্রাধান্য

**ফোকাসঃ** সরকারি প্রশাসনে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব, যার ফলে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলিতে মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যের অগ্রাধিকার।

**মূল ক্ষেত্রঃ** উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, বিরোধী মতাদর্শের কর্মকর্তাদের কোণঠাসা করা এবং প্রশাসনকে দলীয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** অদক্ষতা, পক্ষপাতিত্ব এবং জনসেবার মান হ্রাস, যা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।

### ৩. ক্রোনিজম ও স্বজনপ্রীতিঃ সরকারি নিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব

**ফোকাসঃ** সরকারি নিয়োগ, চুক্তি এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বজনপ্রীতি ও 'ক্রোনিজমের' (ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠদের সুবিধা প্রদান) প্রভাব।

**মূল ক্ষেত্রঃ** আত্মীয়স্বজন ও দলীয় অনুগতদের সরকারি পদে নিয়োগ, যোগ্যতাহীন ঠিকাদারদের প্রকল্প প্রদান এবং এর মাধ্যমে জনসম্পদের অপচয়।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** অদক্ষতা, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি, কাজের নিম্নমান এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি।

### ৪. নিয়ন্ত্রক ও তদারককারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতাঃ দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা

**ফোকাসঃ** দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (CAG) এবং অন্যান্য তদারককারী সংস্থার দুর্বলতা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে তাদের অকার্যকারিতা।

**মূল ক্ষেত্রঃ** এসব প্রতিষ্ঠানের আইনি ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব, পর্যাপ্ত জনবল ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং তাদের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অনীহা।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** দুর্নীতির প্রতিরোধ ও দমনে ব্যর্থতা এবং সুশাসনের অনুপস্থিতি।

### ৫. আইনের অপপ্রয়োগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনঃ নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা

**ফোকাসঃ** নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর (যেমন পুলিশ, র‍্যাব, আনসার) ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ।

**মূল ক্ষেত্রঃ** বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি এবং এসব ঘটনার বিচারহীনতা।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** আইনের শাসনের অবক্ষয়, ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি এবং নাগরিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন।

## সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর প্রতিবেদনের ধারণা

### ১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাতের দীর্ঘসূত্রতা

**ফোকাসঃ** স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত ও অসহযোগিতার ঐতিহাসিক ধারা বিশ্লেষণ করা।

**মূল ক্ষেত্রঃ** প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর জন্ম ও বিবর্তন, সামরিক শাসনের প্রভাব, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু এবং প্রধান দুই দলের বিদ্বেষের ঐতিহাসিক প্রভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সংঘাতপূর্ণ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, যা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ফল নয়, বরং দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত রাজনৈতিক বিভাজনের ফল।

### ২. 'উইনার টেকস অল' মানসিকতা: ক্ষমতার একচেটিয়া দখল ও বিরোধী দলের প্রতি অসহিষ্ণুতা

**ফোকাস:** নির্বাচনে বিজয়ী দলের 'সবকিছু আমার' (winner takes all) মানসিকতা এবং এর ফলে বিরোধী দলকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার প্রবণতা।

**মূল ক্ষেত্র:** রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ) রাজনৈতিকীকরণ, বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে বাধা এবং ভিন্নমতের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, সংসদীয় গণতন্ত্রের দুর্বলতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি।

### ৩. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি: গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বিনষ্ট

**ফোকাস:** বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জনের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি এবং এর ফলে আইন প্রণয়ন ও জনবিতর্কের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সংসদের কার্যকারিতার অবনতি।

**মূল ক্ষেত্র:** সংসদীয় বিতর্কে অংশ না নেওয়া, জনগণের প্রতিনিধিত্বের অভাব এবং সংসদকে অকার্যকর করার মাধ্যমে রাজপথের আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়া।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমূল্যায়ন, জবাবদিহির অভাব এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ঐকমত্যের অভাব।

### ৪. রাজনৈতিক সহিংসতা এবং এর সামাজিক প্রভাব: জনজীবন ও অর্থনীতির ওপর আঘাত

**ফোকাস:** হরতাল, অবরোধ এবং রাজনৈতিক সংঘাতের সময় সংঘটিত প্রাণহানি, সহিংসতা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, জানমাল বিপর্যস্ত হওয়ার ঘটনা এবং এর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রভাব।

**মূল ক্ষেত্র:** সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব, বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** অর্থনৈতিক ক্ষতি, জনগণের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি এবং দেশের ভাবমূর্তির অবনতি।

### ৫. যুব ও ছাত্ররাজনীতির সহিংস রূপ: ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সংকট

**ফোকাস:** রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলোর মধ্যে সহিংসতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চাঁদাবাজির প্রবণতা, যা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।

**মূল ক্ষেত্র:** ক্যাম্পাসে সংঘাত, টেন্ডারবাজি এবং দলীয় স্বার্থে পেশিশক্তি হিসেবে এদের ব্যবহার।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে রাজনীতিবিমুখতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে অযোগ্য ও সহিংস নেতৃত্বের উত্থান।

### ৬. সংবাদমাধ্যম ও মেরুকৃত রাজনীতি: সংঘাতকে উসকে দেওয়ার ভূমিকা

**ফোকাস:** সংবাদমাধ্যমগুলো কীভাবে সংঘাতপূর্ণ রাজনীতিকে তুলে ধরে এবং কখনো কখনো নিজেরাই রাজনৈতিক মেরুকরণের অংশ হয়ে ওঠে।

**মূল ক্ষেত্র:** পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন, রাজনৈতিক প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে সংবাদমাধ্যমের ব্যবহার এবং ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** তথ্যের বিকৃতি, জনমতকে বিভ্রান্ত করা এবং সমাজে বিভেদ বাড়ানো।

### ৭. বিচার বিভাগের ওপর প্রভাব: রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ন্যায়বিচারের অবমূল্যায়ন

**ফোকাস:** সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার ওপর প্রভাব, বিশেষ করে রাজনৈতিক মামলায়।

**মূল ক্ষেত্র:** রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের, দীর্ঘসূত্রতা এবং ন্যায়বিচারের অপব্যবহার।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থার সংকট, আইনের শাসনের দুর্বলতা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন।

### ৮. জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যের অভাব: উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে বাধা

**ফোকাস:** জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে (যেমন নির্বাচন, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছানোর অক্ষমতা এবং এর ফলে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব।

**মূল ক্ষেত্রঃ** ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া, দূরদৃষ্টির অভাব এবং ফলপ্রসূ সংলাপের অনুপস্থিতি।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** নীতিগত অস্থিতিশীলতা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির বাধা।

### ৯. সুশীল সমাজ ও নাগরিক সমাজের কণ্ঠরোধঃ গণতন্ত্রের সীমিত পরিসর

**ফোকাসঃ** সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে সুশীল সমাজ বা নাগরিক প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী এবং স্বাধীন সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করার প্রবণতা।

**মূল ক্ষেত্রঃ** মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ, সরকারের সমালোচনা করায় হয়রানি এবং স্বাধীন সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের ওপর চাপ।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হওয়া, জনমত প্রকাশের সুযোগের অভাব এবং সরকারের জবাবদিহির দুর্বলতা।

### ১০. সংঘাত নিরসনের সম্ভাব্য উপায় ও সুপারিশঃ একটি শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের রূপরেখা

**ফোকাসঃ** বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সমাধান এবং সুপারিশমালা তুলে ধরা।

**মূল ক্ষেত্রঃ** রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের পরিবেশ তৈরি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ যা সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করতে পারে।

## মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে প্রতিবেদনের ধারণা

### ১. গুম ও জোরপূর্বক অন্তর্ধানঃ স্বজনদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা

**ফোকাসঃ** রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী বা সাধারণ নাগরিকদের গুম ও জোরপূর্বক অন্তর্ধানের ঘটনাগুলো এবং এর পেছনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ।

**মূল ক্ষেত্রঃ** নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর দুর্দশা, তদন্তের ধীরগতি বা অনুপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক চাপের পরেও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক।

### ২. রাজনৈতিক গ্রেপ্তার ও হয়রানিঃ ভিন্নমত দমনের কৌশল

**ফোকাসঃ** রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সমালোচক এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, হয়রানিমূলক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দায়ের এবং গণগ্রেপ্তারের প্রবণতা।

**মূল ক্ষেত্রঃ** জামিন পেতে দীর্ঘসূত্রতা, কারাগারে অমানবিক আচরণ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য আইনের অপব্যবহার করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচন, গণতান্ত্রিক পরিসর হ্রাস এবং ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি।

### ৩. বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপব্যবহারঃ নাগরিক অধিকারের সংকোচন

**ফোকাসঃ** বিশেষ ক্ষমতা আইন বা অন্যান্য কঠোর আইনের অপব্যবহার করে রাজনৈতিক কারনে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার, আটক এবং মৌলিক অধিকার খর্ব করার ঘটনা।

**মূল ক্ষেত্রঃ** এসব আইনের অধীনে গ্রেপ্তারকৃতদের বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, আইনি সহায়তার সীমিত সুযোগ এবং আইনের শাসনের প্রতি হুমকি।

**সম্ভাব্য ফলাফলঃ** নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচন, আইনের শাসনের দুর্বলতা এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তারের প্রবণতা।

### ৪. সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকর্মীদের ওপর রাজনৈতিক হামলা ও হয়রানিঃ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন

**ফোকাসঃ** সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকর্মীদের ওপর শারীরিক হামলা, মিথ্যা মামলা এবং হয়রানির ঘটনা, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

**মূল ক্ষেত্রঃ** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য আইনের অপব্যবহার, সাংবাদিকদের ভীতি প্রদর্শন এবং স্বাধীন সংবাদ পরিবেশনে বাধা।

**সম্ভাব্য ফলঃ** সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হ্রাস, ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি এবং জনগণের তথ্য জানার অধিকার খর্ব হওয়া।

## ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অর্থনীতিবিষয়ক প্রতিবেদনের ধারণা

### ১. "ক্রোনি ক্যাপিটালিজম"-এর রাজত্ব: রাজনৈতিক সংযোগে ব্যবসা ও শিল্পের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ

**ফোকাস:** কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে, যা প্রকৃত প্রতিযোগিতা ও সুস্থ অর্থনৈতিক পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করে।

**মূল ক্ষেত্র:** সরকারি টেন্ডার, ব্যাংক ঋণ, লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানে রাজনৈতিক প্রভাব এবং এর ফলে নতুন ও যোগ্য উদ্যোক্তাদের বঞ্চিত হওয়া।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি, সীমিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া।

### ২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন: ক্ষমতাসীনদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ও অর্থ পাচার

**ফোকাস:** রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে কীভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ (যেমন ব্যাংক, সরকারি জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ) আত্মসাৎ করা হচ্ছে এবং সেই অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে।

**মূল ক্ষেত্র:** ঋণ কেলেঙ্কারি, সরকারি খাতের বড় প্রকল্পে দুর্নীতি এবং অর্থ পাচারের রুট ও জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তি।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ, বিনিয়োগের জন্য মূলধনের অভাব এবং দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি।

### ৩. রাজনৈতিক নিয়োগ ও আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা: সেবার মান ও সুশাসনের পতন

**ফোকাস:** সরকারি প্রশাসন ও বিভিন্ন সংস্থায় রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ফলে কীভাবে সরকারি সেবার মান হ্রাস পাচ্ছে এবং সুশাসন ব্যাহত হচ্ছে।

**মূল ক্ষেত্র:** অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং এর ফলে জনগণের ভোগান্তি।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সরকারি কার্যকারিতার পতন, জনগণের আস্থার অভাব এবং জনসেবার মান হ্রাস।

### ৪. কালোটাকা ও নির্বাচনী রাজনীতি: গণতন্ত্রের বিকৃতি

**ফোকাস:** কীভাবে অবৈধভাবে অর্জিত কালোটাকা নির্বাচনের সময় ব্যয় করা হয় এবং এটি কীভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে।

**মূল ক্ষেত্র:** মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অর্থের ব্যবহার, নির্বাচনী প্রচারে কালোটাকার ভূমিকা এবং এর ফলে অযোগ্য কিন্তু ধনী ব্যক্তিদের সংসদে প্রবেশ।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব, নীতিহীন রাজনীতি এবং ভোটারদের ইচ্ছার বিকৃতি।

### ৫. আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও বিচারহীনতা: বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা ঝুঁকি

**ফোকাস:** রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে দুর্নীতিবাজদের দায়মুক্তি এবং আইনের শাসনের দুর্বল প্রয়োগ, যা দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে।

**মূল ক্ষেত্র:** অপরাধীদের বিচার না হওয়া, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের আইনের ঊর্ধ্বে থাকা এবং এর ফলে ব্যবসায়িক নিরাপত্তা ও আইনি নিশ্চয়তার অভাব।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** বিনিয়োগে অনীহা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়া।

### ৬. Rent-Seeking Economy: উৎপাদনশীলতার পরিবর্তে শোষণ

**ফোকাস:** কীভাবে রাজনৈতিক সংযোগ ব্যবহার করে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ না করে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা হয় (যেমন লাইসেন্স, পারমিট, সরকারি জমি দখল করে)।

**মূল ক্ষেত্র:** সিন্ডিকেট তৈরি করে বাজারের নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, সরকারি কাজের ঠিকাদারি থেকে কমিশন আদায় এবং ভূমি দখল।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** উৎপাদনশীল বিনিয়োগে বাধা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং একটি অনুৎপাদনশীল শ্রেণির উত্থান।

### ৭. বেসরকারি খাতের ওপর রাজনৈতিক চাপ: ব্যবসার স্বাধীনতা খর্ব

**ফোকাস:** রাজনৈতিক দল এবং তাদের সংশ্লিষ্টদের বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ, যার ফলে ব্যবসার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

**মূল ক্ষেত্র:** চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অর্থ প্রদানে বাধ্য করা, পছন্দের ঠিকাদার নিয়োগে চাপ এবং সরকারের সমালোচনাকারী ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** ব্যবসার সম্প্রসারণে বাধা, বিনিয়োগে অনীহা এবং অর্থনৈতিক মন্দার ঝুঁকি।

**৮. ট্যাক্স এড়িয়ে চলা ও রাজস্ব ফাঁকি: রাষ্ট্রের দুর্বল আর্থিক ভিত্তি**

**ফোকাস:** রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ব্যাপক হারে কর ফাঁকি দেওয়া এবং কীভাবে এটি রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহকে দুর্বল করে।

**মূল ক্ষেত্র:** কর আইনের ফাঁকফোকর, কর কর্মকর্তাদের ওপর রাজনৈতিক চাপ এবং কর ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** সরকারি সেবার জন্য তহবিলের অভাব, বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব।

**৯. প্রভাবশালী গোষ্ঠী** (Vested Interest Groups) **ও নীতি প্রণয়ন: জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত**

**ফোকাস:** কীভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলো (যেমন ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, আমলাতান্ত্রিক চক্র) নিজেদের স্বার্থে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

**মূল ক্ষেত্র:** নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসার জন্য সুবিধা তৈরি করা, পরিবেশ বা শ্রম আইন শিথিল করা এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

**সম্ভাব্য ফলাফল:** নীতিগত অন্যায়, সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি এবং জনগণের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ উপেক্ষিত হওয়া।

# বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা

রাজনৈতিক সাংবাদিকতা করার জন্য বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। আসুন, সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এর অর্থ:

- **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র:** ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে, ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে বিভক্ত থাকে না।
- **সংসদীয় গণতন্ত্র:** সরকারের প্রধান হন প্রধানমন্ত্রী, তিনিই নির্বাহী প্রধান। তিনি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের (জাতীয় সংসদ) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (বা জোট) থেকে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তাঁর ক্ষমতা মূলত আলংকারিক।
- **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র:** জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকেই সরকার কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে। অর্থাৎ জনগণই ক্ষমতার উৎস, আর তা হলো সাধারণ মানুষ।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার মূল উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ দেখে নেওয়া যাক।

**১. নির্বাহী বিভাগ** (Executive Branch)

- **রাষ্ট্রপতি** (President): রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ভূমিকাটি মূলত আনুষ্ঠানিক, বেশির ভাগ নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যস্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া বাকি সব কাজ রাষ্ট্রপতি করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী।
- **প্রধানমন্ত্রী** (Prime Minister): সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বা জোটের নেতা হন। প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, মন্ত্রিসভা নির্বাচন করেন এবং সরকারের নীতি ও প্রশাসন পরিচালনা করেন।
- **মন্ত্রিসভা** (Cabinet): প্রধানমন্ত্রীর বেছে নেওয়া মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভা সব কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

**২. আইন বিভাগ** (Legislative Branch)

- জাতীয় সংসদ (Jatiya Sangsad): একটি এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদ।
- সংসদে মোট আসন ৩৫০টি।
- ৩০০ জন সদস্য সরাসরি ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।
- বাকি ৫০টি আসন সংরক্ষিত থাকে শুধু নারীদের জন্য। সংসদে নির্বাচিত দলের প্রাপ্ত আসনের ওপর ভিত্তি করে পরোক্ষভাবে তাঁরা নির্বাচিত হন।

- জাতীয় সংসদের কাজ হলো আইন প্রণয়ন, সরকারের কাজকর্ম তদারক করা এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

**৩. বিচার বিভাগ** (Judicial Branch)

- **সুপ্রিম কোর্ট** (Supreme Court): বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর দুটি ভাগ রয়েছে:
  - হাইকোর্ট বিভাগ (High Court Division): প্রাথমিকভাবে মূল, আপিল এবং রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগ করে।
  - আপিল বিভাগ (Appellate Division): আপিলের চূড়ান্ত আদালত।
- **নিম্ন আদালত** (Lower courts): দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহ।

বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং আইন ও সংবিধান ব্যাখ্যার অভিভাবক বলে বিবেচিত হয়।

## বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জ

- **বহুদলীয় ব্যবস্থা:** বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা রয়েছে, তবে ঐতিহ্যগতভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে দুটি প্রধান দলই আধিপত্য বিস্তার করে। এর একটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৫ সালে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাহী আদেশে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত করে, যা তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকেও বারিত করেছে।) এবং অন্যটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এই দ্বিদলীয় রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সব সময় অত্যন্ত মেরুকৃত ও সংঘাতপূর্ণ একটি বলয়ের মধ্যেই আবর্তিত হয়। তবে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন, তাঁর দেশ ছেড়ে যাওয়া এবং আওয়ামী লীগ কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হওয়ার পর দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। মাঠে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিএনপি। আর তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে জামায়াতে ইসলামী। এভাবে জামায়াতসহ অন্যান্য ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল বিএনপির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এর বাইরে দৃশ্যপটে এসেছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র-তরুণদের গড়ে তোলা রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আবার এমন পরিস্থিতির মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়েও রাজনীতিতে প্রভাব টিকিয়ে রাখতে তৎপর রয়েছে এরশাদের জাতীয় পার্টির (জাপা) দুটি ধারা। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থাকা ১৪ দলীয় জোটভুক্ত জাসদ-ওয়ার্কার্স পার্টিসহ অন্যরা ম্রিয়মাণ। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাসদসহ বাম দলগুলো সক্রিয় রয়েছে তাদের স্বকীয় ধারায়। এ ছাড়া আরও কিছু নতুন দল নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পেয়েছে। তবে শেষমেশ নির্বাচনেই প্রমাণিত হবে বর্তমান বাস্তবতায় রাজনীতিতে কার প্রভাব কতটা এবং নবতর কোনো রাজনৈতিক মেরুকরণ রূপপরিগ্রহ করে কি না।

- **রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্র:** বাংলাদেশের রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিবারতন্ত্রের ব্যাপকতা। এখানে নেতৃত্ব পরিবারের মধ্যে (যেমন শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের পরিবার) প্রবাহিত হয়।
- **সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি:** এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস রয়েছে। এর ফলে ঘন ঘন সংসদ বর্জন, ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধসহ রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে।
- **প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিকীকরণ:** আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিকীকরণ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, যা তাদের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা দুর্বল করতে পারে।
- **দুর্নীতি:** দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।
- **সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ:** এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদের কোনো সদস্য দলের সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিতে পারবেন না। নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে। সমালোচকদের মতে, এর কারণে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত দিতে পারেন না এবং দলের নেতার (সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী) ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়।
- **অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা (ঐতিহাসিকভাবে):** ২০১১ সালে বিলুপ্ত হওয়ার আগে, বাংলাদেশে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর একটি অনন্য ব্যবস্থা ছিল, যা নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধান করত। এই ব্যবস্থা থাকার কারণ ছিল ক্ষমতাবলয়ে থাকা প্রধান দলগুলোর মধ্যে চরম অবিশ্বাস। শেষমেশ, সুপ্রিম কোর্ট নভেম্বর, ২০২৫ সালে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন।

# সরকার

সরকার হলো একটি সংগঠিত সম্প্রদায়; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্র বা দেশ পরিচালনাকারী ব্যবস্থা বা ব্যক্তিগোষ্ঠী। সরকার নামক এই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মূল দায়িত্ব শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জনসেবা প্রদান এবং সমাজের জন্য সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

একটি সরকারের ক্ষমতা সাধারণত তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত থাকে (ক্ষমতা পৃথক্করণ নীতি অনুযায়ী)

১. **আইন প্রণয়নের ক্ষমতা** (Legislative Power): আইন তৈরি করার ক্ষমতা। সাধারণত দেশের সংসদ বা আইনসভা এই কাজ করে থাকে।

২. **নির্বাহী ক্ষমতা** (Executive Power): আইন প্রয়োগ ও সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষমতা। সরকারপ্রধান (যেমন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি) এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এই দায়িত্ব পালন করে।

৩. **বিচারিক ক্ষমতা** (Judicial Power): আইন ব্যাখ্যা করা, বিরোধ নিষ্পত্তি করা ও বিচার নিশ্চিত করার ক্ষমতা। আদালত আর বিচারকদের ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

## নির্বাহী ক্ষমতা

আইন প্রণয়নকারী শাখা (আইনসভা) যেসব আইন প্রণয়ন করে, সেসব আইন প্রয়োগ, পরিচালনা ও কার্যকর করা হয় নির্বাহী ক্ষমতার আওতায়। সহজ কথায়, নির্বাহী ক্ষমতা হলো সরকারের 'কার্যনির্বাহী' হাত, যা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি ও দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে।

সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা বলতে আইন প্রয়োগ, জননীতি পরিচালনা এবং একটি রাষ্ট্রের দৈনন্দিন বিষয়গুলো পরিচালনার কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে বোঝায়। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এই ক্ষমতা সাধারণত রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর মতো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের হাতে থাকে।

নির্বাহী ক্ষমতার মূল কার্যাবলির একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

- **আইন প্রয়োগ:** এটি সবচেয়ে মৌলিক কাজ। নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলো কার্যকর ও পালন করছে কি না, তা নিশ্চিত করে নির্বাহী শাখা। এর মধ্যে সরকারি সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন ও তদারকি অন্তর্ভুক্ত।
- **নীতি বাস্তবায়ন:** বিদ্যমান আইন প্রয়োগের বাইরেও বিস্তৃত আইনি নির্দেশগুলোকে কার্যকর সরকারি কর্মসূচি ও নীতিমালায় রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নির্বাহী শাখা। নীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিস্তারিত প্রবিধান, পদ্ধতি ও উদ্যোগ তৈরি করাও এ শাখার দায়িত্ব।
- **জনপ্রশাসন পরিচালনা:** নির্বাহী শাখা সরকারি বিভাগ, সংস্থা ও বেসামরিক কর্মচারীদের বিশাল আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর তত্ত্বাবধান করে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে প্রধান কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বাজেট পরিচালনা, সরকারি পরিষেবাগুলোর দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।
- **পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি:** নির্বাহী শাখা বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা, চুক্তি ও আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা, বিশ্বমঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং কূটনৈতিক পরিষেবাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান সাধারণত পররাষ্ট্রনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- **সামরিক নেতৃত্ব:** বেশির ভাগ দেশেই রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক নির্বাহী প্রধানই (যেমন রাষ্ট্রপতি) সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়ে থাকেন।
- **জরুরি ক্ষমতা:** সংকটকালে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি) শক্ত হাতে হাল ধরার জন্য নির্বাহী শাখার থাকে দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করার নির্দিষ্ট ক্ষমতা। জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য কখনো কাজটি করা হয় নির্বাহী আদেশে, কখনো বা ডিক্রি জারির মাধ্যমে।
- **বাজেট প্রণয়ন:** নির্বাহী শাখা সাধারণত জাতীয় বাজেট প্রস্তুত ও প্রস্তাব করে। বাজেটে জন-তহবিল কীভাবে সংগ্রহ ও ব্যয় করা হবে, তার রূপরেখা দেওয়া হয়। সেই বাজেট প্রস্তাব পরে অনুমোদনের জন্য আইনসভায় পাঠাতে হয়।
- **নিয়োগ:** সরকারের বড় বড় পদে; যেমন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রদূত, বিচারক বা বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতাও নির্বাহী শাখার হাতে থাকে।

## নির্বাহী ক্ষমতার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

নির্বাহী ক্ষমতার পরিধি একেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একেক রকম হয়:

- **রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা (যেমন যুক্তরাষ্ট্র):** এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। তিনি নির্বাচিত হন সরাসরি জনগণের ভোটে। সরকারের তিন বিভাগের ক্ষমতা কঠোরভাবে আলাদা করা। এ ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র আইনসভা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ একে অপরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (checks and balances) হিসেবে কাজ করে। ক্ষমতা অনেক হলেও আইনসভা (যেমন ভেটো বাতিল, অভিশংসন) ও বিচার বিভাগ (যেমন নির্বাহী কাজের বিচারিক পর্যালোচনা) তার ক্ষমতায় লাগাম পরাতে পারে।
- **সংসদীয় ব্যবস্থা (যেমন বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, ভারত):** এই ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ (সরকার, যার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী থাকেন) গঠিত হয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোট থেকে। নির্বাহী বিভাগকে আইনসভার কাছে জবাবদিহি করার পাশাপাশি এর আস্থাও ধরে রাখতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার মতো এখানে ক্ষমতার ততটা কঠোর পৃথক্করণ নেই (যেহেতু নির্বাহীর সদস্যরা সাধারণত আইনসভারও সদস্য হন)। তবে এ ব্যবস্থায় নির্বাহীর ক্ষমতা আইনসভা থেকে উদ্ভূত এবং এর মাধ্যমে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রপ্রধান (যেমন রাষ্ট্রপতি বা রাজা/রানি) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূলত আনুষ্ঠানিক বা আলংকারিক ভূমিকা পালন করেন।
- **স্বৈরাচারী শাসন:** এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় নির্বাহী ক্ষমতা অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে এখানে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ঘাটতি থাকে। নির্বাহী নেতা সরকার ও সমাজের সমস্ত শাখার ওপর সীমাহীন, অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন।

### নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Checks and Balances)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে নির্বাহী ক্ষমতা সাধারণত আইনসভা ও বিচার বিভাগ দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থা নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করে:

- সংসদ বা আইনসভা নির্বাহী বিভাগের ওপর নজর রাখে, আইন প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদন করে এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বা অভিশংসন করতে পারে।
- বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের বৈধতা পর্যালোচনা করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেগুলোকে অসাংবিধানিক বা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। আইনের ব্যাখ্যা ও বিরোধ নিষ্পত্তিও বিচার বিভাগের কাজ।

এককথায়, নির্বাহী ক্ষমতা হলো সরকারের সেই শক্তি, যা আইনগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয় এবং দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সরকারের দৈনন্দিন কাজ করার জন্য এটি অপরিহার্য। কিন্তু গণতন্ত্রে এই ক্ষমতা অসীম নয়, বরং অন্য দুটি বিভাগের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয়।

## নির্বাহী বিভাগ

নির্বাহী বিভাগ হলো সরকারের সেই অংশ, যা আইনসভার প্রণীত আইনগুলো বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে। মূলত সরকারের এই 'কার্যকরী' বিভাগই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করে।

### অধিকাংশ আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাহী শাখার অন্তর্ভুক্ত হলো

- **সরকারপ্রধান:** সাধারণত প্রধানমন্ত্রী (সংসদীয় ব্যবস্থায়) বা রাষ্ট্রপতিই (রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায়) সরকারপ্রধান হয়ে থাকেন। তিনিই সরকার এবং এর নীতিগুলো পরিচালনা করেন।
- **মন্ত্রিপরিষদ (ক্যাবিনেট):** সরকারপ্রধানের নিয়োগ করা মন্ত্রীদের দল, যাঁরা নির্দিষ্ট সরকারি বিভাগগুলোর (যেমন অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা) তত্ত্বাবধান করেন।
- **সরকারি বিভাগ/মন্ত্রণালয় ও সংস্থা:** সরকারের নীতিগুলোকে কর্মে রূপান্তরিত, জনসেবা প্রদান ও আইন প্রয়োগ করে বিশাল আমলাতন্ত্র। এর মধ্যে বেসামরিক কর্মচারী, পুলিশ বাহিনী ও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা অন্তর্ভুক্ত।

### নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানে যা বলা হয়েছে

বাংলাদেশ চলে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায়। অর্থাৎ নির্বাহী ক্ষমতা থাকে মূলত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের হাতে, আর তাঁরা জবাবদিহি করেন সংসদের কাছে। সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে; যার শিরোনাম 'নির্বাহী বিভাগ'; এ-সংক্রান্ত সব বিধান পরিষ্কারভাবে বলা আছে।

সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তার একটি বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. **নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্তকরণ [অনুচ্ছেদ ৫৫(২)]:** সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা এই সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হইবে।' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অনুচ্ছেদ প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাহী ক্ষমতার প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. **মন্ত্রিপরিষদ [অনুচ্ছেদ ৫৫(১)]:** 'বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হইবে এবং প্রধানমন্ত্রী সময়ে সময়ে যেসকল মন্ত্রীকে উপযুক্ত মনে করিবেন তাহাদের সমন্বয়ে এই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইবে।' এই অনুচ্ছেদ মন্ত্রিপরিষদকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্বাহী বিভাগের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩. **মন্ত্রিপরিষদের সম্মিলিত দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৫৫(৩)]:** 'মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকিবে।' এটি সংসদীয় ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। এর অর্থ, সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্ত ও নীতির জন্য সব মন্ত্রী একযোগে সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। সরকার সংসদের আস্থা হারালে (যেমন অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে) পুরো মন্ত্রিপরিষদকেই পদত্যাগ করতে হবে।

৪. **রাষ্ট্রপতির নামে নির্বাহী পদক্ষেপ [অনুচ্ছেদ ৫৫(৪)]:** 'সরকারের সকল নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।' যদিও নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের সব কাজ জারি করা হয় আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নামে।

৫. **রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করা [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]:** 'প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ [অনুচ্ছেদ ৫৬-এর দফা (৩) অনুসারে] এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ [অনুচ্ছেদ ৯৫-এর দফা (১) অনুসারে] ব্যতীত তাহার অন্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবেন।' এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতির ভূমিকার আনুষ্ঠানিক প্রকৃতিকে সুদৃঢ় করে। তিনি প্রায় সব নির্বাহী কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে বাধ্য। ব্যতিক্রমগুলো; প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নির্দিষ্ট; তবে সেই কাজও প্রায়ই রাজনৈতিক বাস্তবতা দিয়েই পরিচালিত হয়।

৬. **রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৫)]:** 'প্রধানমন্ত্রী দেশীয় ও পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য এমন যেকোনো বিষয় উপস্থাপন করিবেন যা রাষ্ট্রপতি তাকে উল্লেখ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন।' এটি সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

৭. **প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ [অনুচ্ছেদ ৫৬(৩)]:** 'সংসদ সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান এমন সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।' এই অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ প্রক্রিয়ার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। সাধারণত সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

৮. **অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ [অনুচ্ছেদ ৫৬(২)]:** 'রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে তাহার বিবেচনামতো নিয়োগ করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রীদের অন্যূন ১০ ভাগের ৯ ভাগ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন।' এর মানে হলো, প্রায় সব মন্ত্রীকেই সংসদ সদস্য হতে হবে। এতে আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সংহতি বাড়ে।

৯. **কার্য পরিচালনার বিধিমালা [অনুচ্ছেদ ৫৫(৬)]:** 'রাষ্ট্রপতি সরকারের কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করবেন।' এই অনুচ্ছেদ 'কার্যপরিচালনা বিধিমালা, ১৯৯৬'-এর সাংবিধানিক ভিত্তি। এ বিধিমালায় নির্বাহী বিভাগের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

**এককথায়, বাংলাদেশের সংবিধান একটি সংসদীয় নির্বাহী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে যেখানে:**

- প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রধান নির্বাহী এবং নির্বাহী ক্ষমতার প্রকৃত ধারক।
- মন্ত্রিপরিষদ, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, সম্মিলিতভাবে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং সরাসরি সংসদের কাছে জবাবদিহি করে।
- রাষ্ট্রপতি হলেন আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন।
- পুরো ব্যবস্থাটি ওয়েস্টমিনস্টার মডেলে তৈরি, যেখানে সরকার নির্বাচিত সংসদ থেকে জন্ম নেয় এবং তার কাছেই দায়বদ্ধ থাকে। এ মডেলে নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার সংমিশ্রণে জোর দেওয়া হয়।

### নির্বাহী শাখাকে কেন 'সরকার' বলা হয়

সরকারের নির্বাহী শাখাকে প্রায়ই কথোপকথনে 'সরকার' বলা হয়। কারণ, এই বিভাগই সরকারের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও সক্রিয় অংশ, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগ হয় সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে সংসদীয় ব্যবস্থায় এই পার্থক্য কেন করা হয়, তার কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও বাস্তবায়ন:** দেশের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাহী শাখার। এসব দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে আইন প্রয়োগ, জনসেবা প্রদান (স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, অবকাঠামো), কর আদায়, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী পরিচালনা এবং পররাষ্ট্র সম্পর্ক। একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে নির্বাহীর কার্যাবলিই মূলত 'সরকার কী করছে' বলে বিবেচিত হয়।
- **নেতৃত্ব ও নীতি প্রণয়ন:** অনেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, বিশেষত বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, ভারতের মতো সংসদীয় ব্যবস্থায় (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে) নির্বাহী শাখা গঠন করে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোট। এর অর্থ হলো:
  - **তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী:** আইন যদিও সংসদে পাস হয়, কিন্তু বেশির ভাগ আইনের প্রস্তাব বা উদ্যোগ নির্বাহী শাখাই নেয়। জাতীয় অ্যাজেন্ডা তৈরি ও প্রধান প্রধান নীতি প্রণয়ন নির্বাহীই করে।
  - **তারা আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে:** বেসামরিক কর্মচারী ও সরকারি বিভাগগুলোর বিশাল নেটওয়ার্ক নির্বাহীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা তাদের নীতি বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম করে তোলে।
  - **তারা রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে:** নির্বাহী শাখা ক্ষমতাসীন দলের নীতিকে মূর্ত করে এবং প্রায়শই দেশের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার প্রতিনিধিত্ব করে।
- **দৃশ্যমানতা ও জবাবদিহি:** সরকারপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি) ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা হলেন সরকারের জনসমক্ষে পরিচিত মুখ। তাঁরাই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন, সংবাদ সম্মেলন করেন, নীতি ঘোষণা করেন এবং সরকারের কর্মক্ষমতার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন।
- **ক্ষমতার সংমিশ্রণ (সংসদীয় ব্যবস্থায়):** সংসদীয় ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও 'ক্ষমতার সংমিশ্রণ' দেখা যায়। নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা (মন্ত্রী) প্রায় সব সময় আইনসভারও সদস্য হন। এর মানে, একই ব্যক্তি আইন তৈরি ও প্রয়োগ– উভয় কাজেই জড়িত থাকেন। এই আন্তঃসম্পর্কের কারণে এই সম্মিলিত সংস্থাকে কেবল 'সরকার' বলাই সহজ। এর বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় এই দুটি বিভাগ স্পষ্টভাবে আলাদা।
- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:** ঐতিহাসিকভাবেও, 'সরকার' বলতে সাধারণত সার্বভৌম শাসক ও তাদের পরিষদকেই বোঝাত। তাদের হাতেই থাকত শাসনের মূল ক্ষমতা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন হলেও এই নির্বাহী কার্যকারিতা আজও শাসনের ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে গেছে।

আইনসভা (সংসদ/কংগ্রেস) আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার বিভাগ তার ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু সেই আইনকে কার্যকর করে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা পালন করে নির্বাহী বিভাগ। তাই যখন মানুষ বলে, 'সরকার অমুক কাজটা করছে' বা 'সরকারের নতুন নীতি', তখন তারা আসলে নির্বাহী শাখার কাজ বা সিদ্ধান্তের কথাই বলে।

## সরকারের প্রয়োজনীয়তা

মৌলিক মানবিক চাহিদা এবং সংগঠিত সমাজের জটিলতা থেকে সরকারের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। সরকার ছাড়া যেকোনো সমাজ বিশৃঙ্খলায় ডুবে যাবে, যাকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক অবস্থা' (state of nature)। দার্শনিক থমাস হবসের ভাষ্যমতে, এই অবস্থা হবে 'নিঃসঙ্গ, দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, জঘন্য, পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী।'

সরকার কেন দরকার, তার কয়েকটি প্রধান কারণ হলো–

### ১. আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা

অরাজকতা প্রতিরোধ: সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হলো আইন প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা, যাতে নাগরিকদের প্রত্যাশিত ও নিরাপদ পরিবেশে বসবাস নিশ্চিত হয়। আইনের প্রতিষ্ঠা মানুষকে সহিংসতায় লিপ্ত হওয়া বা নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া থেকে বিরত রাখে।

অধিকার সুরক্ষা: সরকার ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করে, অন্যদের দ্বারা এর লঙ্ঘন প্রতিরোধ করে।

বিরোধ নিষ্পত্তি: সরকার শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্যভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালত ও বিচারব্যবস্থা সরবরাহ করে।

### ২. জনসাধারণের পণ্য ও সেবা সরবরাহ

অবকাঠামো: সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে, যা সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের জন্য নির্মাণ করতে পারে না; যেমন রাস্তা, সেতু, গণপরিবহন ও ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন)।

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা: বাইরের শত্রুর হুমকি থেকে দেশের সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী আর দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করে সরকার।

সামাজিক কল্যাণ: অনেক সরকার স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বয়স্ক ও অক্ষমদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং বেকারত্ব সুবিধার মতো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা করে। এসব সেবার লক্ষ্য হলো জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও অসমতা কমানো।

জনস্বাস্থ্য: মহামারি নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বা জনস্বাস্থ্যবিধি প্রচার; জনস্বাস্থ্যের এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজও সরকার করে থাকে।

### ৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা: আর্থিক (কর ও ব্যয়) ও মুদ্রানীতির (মুদ্রা সরবরাহ ও সুদের হার) মাধ্যমে অর্থনীতি পরিচালনা করে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বেকারত্ব কমার কাজ করে সরকার।

নিয়ন্ত্রণ: সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতে, ভোক্তাদের সুরক্ষা দিতে, পরিবেশ রক্ষায় এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণ করতে বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করে সরকার।

ব্যবসা-বাণিজ্য: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করে দেয় সরকার, ব্যবসার উন্নতির জন্য তৈরি করে স্থিতিশীল পরিবেশ।

### ৪. সম্মিলিত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সম্মিলিত সমাধান: বড় কিছু সমস্যা আছে; যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি বা বড় কোনো দুর্যোগ। এসব একা সামলানো যায় না; একজোট হয়ে লড়তে হয়। আর সেই কাজের সমন্বয় করতে পারে কেবল সরকার।

প্রতিনিধিত্ব: গণতন্ত্রে সরকার হলো জনগণের আয়নার মতো। এ ব্যবস্থায় সরকার নানা মানুষের নানা মত আর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে; সেগুলোকে রূপ দেয় নীতিতে।

জাতীয় পরিচয় ও ঐক্য: নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় পরিচয়, ঐক্য ও সম্মিলিত উদ্দেশ্য বোধ গড়ে তোলে সরকার।

### বাংলাদেশে সরকার কীভাবে বৈধতা পায়

একটি সরকারের প্রকৃত জোর আসল বৈধতায়। এই বৈধতার মানে হলো, জনগণ বিশ্বাস করে কি না যে তাদের সরকারের শাসন করার 'অধিকার' আছে। জনগণ বিশ্বাস করে কি না, সরকারের কাজগুলো উপযুক্ত ও বাধ্যতামূলক। জোর-জবরদস্তি বা পেশিশক্তি দিয়ে নয়, বৈধ সরকার শাসন করে সম্মতি দিয়ে।

সরকারের ওপর যখন মানুষের ব্যাপক আস্থা থাকে, তখন নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় আইন মানতে, কর দিতে ও নাগরিক জীবন অংশ নিতে বেশি আগ্রহী হয়। আনুগত্যকে তারা নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখে। আর আস্থা না থাকলে ঘটে ঠিক তার উল্টো। চারদিকে দেখা দেয় আইন অমান্য, প্রতিবাদ; এমনকি বিদ্রোহের আগুনও জ্বলে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের মতো একটা গণতান্ত্রিক দেশে বৈধতা আসে মূলত যুক্তিপূর্ণ আইনি উৎস থেকে। তবে আরও কিছু উৎসও রয়েছে–

- **অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন:** এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জনগণ যদি বিশ্বাস করে, তাঁদের ভোটেই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, তাহলেই সরকার উল্লেখযোগ্য বৈধতা পায়।
- **সংবিধান ও আইনের শাসন:** এরপর আসে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য এবং এই নীতি যে সরকার হোক বা সাধারণ মানুষ; আইনের চোখে সবাই সমান।
- **কার্যকারিতা ও দক্ষতা:** প্রতিশ্রুতি পূরণের সক্ষমতা, কার্যকরভাবে জনসেবা দেওয়া, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা একটি সরকারের বৈধতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সরকারকে যদি যোগ্য এবং মানুষের প্রয়োজনে সাড়া দিতে সক্ষম মনে করা হয়, তবে এটি আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।
- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি:** সরকার যদি স্বচ্ছভাবে কাজ করে, সব তথ্য মানুষকে জানায় এবং নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করে, তাহলেও তার বৈধতা বাড়ে। সংসদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ ও মুক্ত সংবাদমাধ্যম সরকারের এই জবাবদিহি নিশ্চিত করে।
- **মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা:** মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের অধীনে সমান আচরণ ও বৈষম্য দূর করলেও সরকারের বৈধতা বাড়ে।
- **নাগরিকদের অংশগ্রহণ:** শুধু ভোটদান নয়, দেশের কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগও থাকতে হয়। জনসাধারণের প্রতিবাদ, পরামর্শ ও সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের বৈধতা বাড়ে।

মোদ্দাকথা হলো, মানবসভ্যতার জন্য সরকার হয়তো অপরিহার্য, কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা পুরোপুরি নির্ভর করে বৈধতার ওপর। অর্থাৎ শাসিতরা বিশ্বাস করে কি না যে সরকারের ক্ষমতার প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে।

## প্রধানমন্ত্রী

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পদ হলো প্রধানমন্ত্রী। তবে এর জন্ম রাতারাতি হয়নি। এর বিবর্তনের পেছনে আছে রাজা আর সংসদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের আকর্ষণীয় গল্প।

### পদের বিবর্তন

'প্রধানমন্ত্রী' বা প্রধান যে মন্ত্রী, এই ধারণা নতুন কিছু নয়, প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। আব্বাসীয় খিলাফতের উজির-এ-আজম বা প্রাচীন চীনের গ্র্যান্ড চ্যান্সেলর মূলত সেই আমলের প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন। তবে বর্তমান সময়ের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা যেভাবে চিনি; অর্থাৎ যিনি নির্বাচিত সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য; তাঁর জন্ম আঠারো শতকে, গ্রেট ব্রিটেনে।

**এই পদের বিবর্তনের ধাপগুলো এ রকম–**

**১. রাজকীয় উপদেষ্টা থেকে প্রধানমন্ত্রী (আঠারো শতকের আগে)**

- **রাজার ব্যক্তিগত শাসন:** শত শত বছর ধরে রাজাই ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁরাই ধারণ করতেন সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা। তাঁদের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চলতেন রাজার ইচ্ছায় ও ইশারায়। তাঁদের ক্ষমতা টিকে থাকত কেবল রাজার অনুগ্রহের ওপর। কোনো আইনসভা জাতীয় সংস্থার কাছে রাজাকে জবাবদিহি করতে হতো না।
- **'প্রথম মন্ত্রী'র আবির্ভাব (অনানুষ্ঠানিক):** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজার বিশ্বস্তদের মধ্যে কেউ কেউ খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। রাজার 'প্রথম মন্ত্রী' বা 'প্রধান মন্ত্রী' বলতে যা বোঝায়, অনেকটা তা-ই হয়ে ওঠেন তারা। যেমন সতেরো শতকের ফ্রান্সে কার্ডিনাল রিশেলিউ। তবে এটা কোনো আনুষ্ঠানিক পদ নয়, ছিল কেবল একটা পরিচয়।

**২. ব্রিটিশ প্রভাব: সংসদের দিকে ক্ষমতার পালাবদল (আঠারো শতক)**

- **গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮):** ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লবের পর রাজার ক্ষমতা গেল কমে, লাগাম চলে এল সংসদের হাতে। বিল অব রাইটসের (১৬৮৯) ফলে কর আরোপ বা আইন বানানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সংসদের নিয়ন্ত্রণ আরও সুসংহত হয়। ফলে রাজাও দিন দিন সংসদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।
- **হ্যানোভারিয়ান উত্তরাধিকার (১৭১৪):** প্রথম জর্জ ব্রিটিশ সিংহাসনে বসার পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল ঘটে। জার্মানভাষী এই রাজার ব্রিটিশ শাসন নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও প্রায়ই থাকতেন না। ফলে সরকারপ্রধানের জায়গায় তৈরি হলো বড় শূন্যতা।
- **'ফার্স্ট লর্ড অব দ্য ট্রেজারি'র উত্থান:** রাজা সক্রিয় সরকার থেকে অনেকটাই হাত গুটিয়ে নেওয়ায় ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে 'ফার্স্ট লর্ড অব দ্য ট্রেজারি' পদটা। পার্লামেন্টের মাধ্যমে রাজকীয় ব্যবসা সামলাতে গিয়ে, সরকারি নীতি সমন্বয় করতে গিয়ে এই ব্যক্তিই অন্যান্য মন্ত্রীর ওপর প্রভাব বিস্তার শুরু করেন।
- **রবার্ট ওয়ালপোল এবং কার্যত প্রধানমন্ত্রীর পদ:** রাজার শূন্যস্থান পূরণ করতে দৃশ্যপটে এলেন স্যার রবার্ট ওয়ালপোল। টানা বিশ বছরের বেশি সময় (১৭২১-১৭৪২) ফার্স্ট লর্ড অব দ্য ট্রেজারি পদে ছিলেন তিনি। তাকেই বলা হয় ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী; যদিও তখন এই পদের কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না। মজার ব্যাপার হলো, 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটা তখন ব্যবহার হতো গালি হিসেবে! নিন্দুকেরা ক্ষমতার অযাচিত কেন্দ্রীভূত হওয়া বোঝাতে এই নাম ধরে গালি দিত। কিন্তু ওয়ালপোলের হাত ধরেই জন্ম নিল প্রধানমন্ত্রীর পদের মূল ভিত্তিগুলো:
  - **মন্ত্রিসভার সংহতি:** আশা করা হতো, মন্ত্রীরা সবাই সরকারি নীতিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করবেন, নয়তো পদত্যাগ করবেন।
  - **নিয়োগে নিয়ন্ত্রণ:** অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ওপর প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব তৈরি হলো।
  - **সংসদ পরিচালনা:** সরকার টেকাতে হলে হাউস অব কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে হবে; এই নিয়মও চালু হলো।

**৩. আনুষ্ঠানিকীকরণ ও একত্রীকরণ (উনিশ ও বিশ শতক)**

- **ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি:** ক্রমেই বাড়তে লাগল এ পদের স্বীকৃতি। আঠারো ও উনিশ শতকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা আর গুরুত্ব– দুটোই বাড়তে লাগল সমানতালে। বিশেষ করে জাতীয় সংকটের সময় কিংবা উইলিয়াম পিট দ্য ইয়ংগারের মতো কোনো শক্তিশালী নেতার উত্থানে এই পদের কদর গেল বেড়ে। 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটা ধীরে ধীরে হারাল তার পুরোনো অবমাননাকর তকমা; আরও সাধারণভাবে চালু হলো এর ব্যবহার।
- **আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি:** আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি মিলল ১৯০৫ সালে। এর আগে ব্রিটিশ অগ্রাধিকার তালিকায় 'প্রধানমন্ত্রী' উপাধির কোনো আনুষ্ঠানিক অস্তিত্বই ছিল না। হেনরি ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান প্রথম ব্যক্তি, যিনি সরকারিভাবে এই উপাধি পেলেন।

- **ওয়েস্টমিনস্টার মডেলের রপ্তানি:** ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর উপনিবেশগুলোও পেল স্বায়ত্তশাসন। এভাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাসংবলিত ওয়েস্টমিনস্টার সংসদীয় ব্যবস্থা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে (যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত এবং পরে বাংলাদেশ) গভীর শিকড় গেড়ে বসল।

### ৪. আধুনিক প্রধানমন্ত্রীর পদ: ক্ষমতা ও দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি

- **মন্ত্রিপরিষদে আধিপত্য:** আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এখন আর কেবল 'সমানদের মধ্যে প্রথম' নন, বরং তিনিই দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়নের অ্যাজেন্ডা নিয়ন্ত্রণ এবং বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা– সবই করেন তিনি।
- **আন্তর্জাতিক ভূমিকা:** বিশ্ব কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের যুগে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব বেড়ে গেল আরও কয়েক গুণ। তিনিই এখন বিশ্বমঞ্চের অন্যতম প্রধান খেলোয়াড়।

### প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে, 'প্রথম' বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে, তার ওপর:

- **সাধারণভাবে স্বীকৃত প্রথম (কার্যত) প্রধানমন্ত্রী:** গ্রেট ব্রিটেনের স্যার রবার্ট ওয়ালপোল। ১৭১২ থেকে ১৭৪২ সাল পর্যন্ত তিনি ট্রেজারির ফার্স্ট লর্ড হিসেবে কাজ করেন। যদিও তাঁর কোনো আনুষ্ঠানিক উপাধি ছিল না, কিন্তু তিনিই আধুনিক প্রধানমন্ত্রীর পদের মৌলিক ভিত্তি গড়ে দেন।
- **যুক্তরাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রধানমন্ত্রী' খেতাব পাওয়া প্রথম ব্যক্তি:** হেনরি ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান, ১৯০৫ সালে।
- **আনুষ্ঠানিক কাজে প্রথম এই উপাধি ব্যবহার করলেন:** বেঞ্জামিন ডিসরালি। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেন 'হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিস প্রাইম মিনিস্টার' হিসেবে।

### বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর পদের রয়েছে নিজস্ব এক ইতিহাস:

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত। সেই সরকারের অধীনে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনিই কার্যত যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্ব দেন।
- দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান।

রাজতন্ত্রের শাসন থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের ইতিহাস হলো প্রধানমন্ত্রীর পদের এই বিবর্তন। এখানে সরকারপ্রধানের ক্ষমতার উৎস রাজা বা রানি নন, বরং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থা।

### সরকারের কার্যপরিচালনা বিধিমালা কী, কেন জানা দরকার

সংসদ চলে 'সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি' (Rules of Procedure) মেনে। ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী বিভাগ চলে 'কার্যপরিচালনা বিধিমালা' (Rules of Business) অনুসারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই দুটো নিয়মকানুনের সেট আলাদা, কিন্তু দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এখন পর্যন্ত এর সর্বশেষ সম্পূর্ণ সংস্করণ হলো 'কার্যপরিচালনা বিধিমালা, ১৯৯৬', যদিও পরে এতে কিছু সংশোধনী এসেছে। এই বিধিমালা তৈরির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে সংবিধানের ৫৫(৬) ধারা। সেখানে বলা আছে: 'রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিবেন।'

### বাংলাদেশ সরকারের কার্যপরিচালনা বিধিমালার প্রধান প্রধান ক্ষেত্র

বাংলাদেশের নির্বাহী সরকার কীভাবে চলবে, দায়িত্ব কীভাবে বণ্টন হবে এবং সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে কীভাবে; এসব নীতি ও পদ্ধতির বিস্তারিত নিয়মাবলির নকশার নামই কার্যপরিচালনা বিধিমালা। দেশের মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য এটাই হলো কাজের মূল কাঠামো।

**কার্যপরিচালনা বিধিমালার প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো–**

**১. কার্যাবলি বণ্টন (তফসিল-১):** এটাই সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বিধিমালার প্রথম তফসিলেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, সরকারের কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কী কাজ। প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে কাজ করতে হবে তার জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া ক্ষেত্রগুলোর ভেতরেই। এর ফলে এক কাজের পুনরাবৃত্তি হয় না, বিচারিক সীমাও থাকে স্পষ্ট। যেমন শিক্ষার ভার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, অর্থের দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের, আর বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় সামলাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

**২. কাজ সম্পাদন:** এক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ভেতর কাজ চলবে কীভাবে, তারও সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে এই বিধিমালায়।

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী:** মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সব কাজের নিষ্পত্তি হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনায়।
- **প্রশাসনিক প্রধান:** মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। প্রশাসন, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর।
- **অধীনস্থ অফিস:** মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত বিভাগ ও অধীনস্থ অফিসগুলোর মাধ্যমে কীভাবে কাজ পরিচালিত হবে, তার নিয়মও বাতলে দেওয়া আছে বিধিমালায়।

**৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ:** এই বিধিমালায় স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপারে এক মন্ত্রণালয়কে অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে যখন কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একাধিক বিভাগ জড়িত, কিংবা আইনি, আর্থিক বা বৈদেশিক সম্পর্কের মতো বিষয় চলে আসে। এতে সমন্বয় বাড়ে এবং ঐকমত্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

যেমন বড় কোনো নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলক পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে।

**৪. মন্ত্রিপরিষদ সভা ও কার্যপ্রণালি:** মন্ত্রিপরিষদ সভা কীভাবে চলবে, তার কার্যপ্রণালিও ঠিক করে দেয় এই বিধিমালা। যেমন:

- কোন বিষয়গুলো অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় তুলতে হবে।
- সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং তা লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি।
- বিভিন্ন মন্ত্রিপরিষদ কমিটি গঠন ও তাদের কার্যকারিতা।
- মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত কীভাবে জানানো হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে।

**৫. উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয় উপস্থাপন:** প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো বিষয় পাঠাতে হলে তারও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যে সারাংশ পাঠানো হয়, তা হতে হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। ঘটনার আদ্যোপান্ত এবং সিদ্ধান্তের কারণগুলো এতে উল্লেখ থাকে। সেই সঙ্গে থাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ।

**৬. সরকারি তথ্যের সুরক্ষা ও যোগাযোগ:** সরকারি গোপন তথ্য পরিচালনা এবং অনুমোদন ছাড়া তা ফাঁস করার ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞার নিয়মাবলি।

**৭. বিদেশি সরকার ও সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক:** নিয়ম হচ্ছে, অন্য দেশ, মিশন বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সাধারণত চিঠি চালাচালি হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে।

**৮. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা:** প্রধানমন্ত্রীর হাতে রয়েছে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা। তিনিই ঠিক করে দেন কোন মন্ত্রী কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবেন। এ ছাড়া নতুন মন্ত্রণালয় গঠন, জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে কোনো বিধিমালা কঠোরভাবে পালন থেকে অব্যাহতি বা ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

**কার্য পরিচালনা বিধিমালা কেন গুরুত্বপূর্ণ**

বাংলাদেশ সরকারকে কার্যকরভাবে চলতে হলে কিছু নিয়মকানুন মানতেই হয়। এখানেই চলে আসে কার্য পরিচালনা বিধিমালার গুরুত্ব। **বেশ কয়েকটি কারণে এই বিধিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:**

১. **শৃঙ্খলা ও দক্ষতা:** সরকারের কার্যপ্রবাহ অত্যন্ত জটিল। এই বিধিমালা সেই জটিলতার মধ্যে পথ দেখায়, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কার্য সম্পাদনের জন্য একটি স্পষ্ট কাঠামো তৈরি করে দেয়। এই বিধিমালা ছাড়া বিশৃঙ্খলা, কাজের পুনরাবৃত্তি ও সরকারি কার্যক্রমে বিলম্ব দেখা দিত।

২. **দায়িত্ব ও জবাবদিহি:** কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলোর কী কাজ, তা নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে কে কোন কাজের জন্য দায়ী, তা নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা থাকে না। নীতি বাস্তবায়ন হোক বা জনগণকে সেবাপ্রদান; সাফল্য আর ব্যর্থতার জন্য কে জবাবদিহি করবে, তা সহজে বোঝা যায়।

৩. **সমন্বয় ও কাজের পুনরাবৃত্তি রোধঃ** আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ বাধ্যতামূলক করে এই বিধিমালা। এতে সরকারের বিভিন্ন অংশ সমন্বিতভাবে কাজ করে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা এড়িয়ে চলে। সুসংগত নীতি প্রণয়নের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **প্রশাসনে আইনের শাসন বজায় রাখাঃ** এই বিধিমালার ফলে সরকারি কার্যক্রম চলে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি মেনে, স্বেচ্ছাচারীভাবে নয়। সব প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পেছনে থাকে একটা আইনি ভিত্তি; প্রশাসনে বাড়ে ন্যায্যতা।

৫. **মন্ত্রিপরিষদের সম্মিলিত দায়িত্ব সহজ করাঃ** মন্ত্রিপরিষদে কীভাবে সিদ্ধান্ত উপস্থাপন ও নেওয়া হয়, তার খুঁটিনাটি বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। ফলে সম্মিলিত দায়িত্বের নীতি আরও শক্তিশালী হয়। এর মানে হলো, পুরো মন্ত্রিসভা সংসদে তাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকে।

৬. **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি (কিছুটা)ঃ** এই বিধিমালাগুলো যদিও সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের জন্য, তবে এসবের অস্তিত্ব ও প্রয়োগ সরকারি কাজে স্বচ্ছতা একটু বাড়ায়। কারণ, সবকিছুই একটা স্পষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে।

৭. **জনসেবা উন্নত করাঃ** সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ঠিকঠাক মানা হলে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানো যায় পদ্ধতিগতভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে। এতে দেশের মানুষেরই ভালো হয়।

৮. **ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতিঃ** এই বিধিমালাগুলো এক দিনে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এগুলো বিকশিত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা বা কর্মকর্তা বদল হলেও তাই সরকারি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে না।

এককথায়, কার্যপরিচালনা বিধিমালা হলো নির্বাহী শাখার জন্য প্রশাসনিক নকশা। সংবিধান শাসনের যে পথ দেখায়, এই বিধিমালা তাকেই বাস্তবে রূপ দেয়; সরকারকে কাজ করার এবং জাতির সেবা করার ক্ষমতা জোগায়।

### মন্ত্রিপরিষদের সম্মিলিত বনাম মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব

বাংলাদেশের মতো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় একজন মন্ত্রীর দায়িত্ব দুই ধরনের। এ দায়িত্ব দুটি সাংবিধানিক প্রথা থেকে জন্ম নিয়েছে: একটি হলো সম্মিলিত মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব (Collective Ministerial Responsibility), অপরটি ব্যক্তিগত মন্ত্রীর দায়িত্ব (Individual Ministerial Responsibility)। এই নীতিগুলো সংসদ এবং এ মাধ্যমে দেশের জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করে।

### সম্মিলিত মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব

এই নীতির মূলকথা হলো, মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে সরকারের নেওয়া সব সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রকাশ্যে সমর্থন করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে দ্বিমত পোষণ করলেও এর কোনো বিকল্প নেই। এর মানে, সরকার চলে একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসেবে।

এর কয়েকটি মূল দিক:

- **ঐক্য ও সংহতিঃ** সব মন্ত্রীকে সংসদ ও জনগণের সামনে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরতে হবে। মন্ত্রিসভায় কোনো সিদ্ধান্ত একবার নেওয়া হয়ে গেলে, তা মানতে সব মন্ত্রী বাধ্য।
- **গোপনীয়তাঃ** মন্ত্রিসভার আলোচনা গোপনীয় থাকে, যাতে মন্ত্রীদের মধ্যে জনসমক্ষে মতবিরোধ প্রকাশের ভয় ছাড়াই স্বাধীন ও খোলামেলা বিতর্ক হতে পারে।
- **'সবার জন্য এক, একের জন্য সবাই':** সংসদে যদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়, তাহলে কোনো একজন মন্ত্রী নন, পদত্যাগ করবে পুরো সরকার। হয় তারা 'একসঙ্গে দাঁড়ায়, নয়তো একসঙ্গে পড়ে যায়'।
- **নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণতিঃ** কোনো মন্ত্রী যদি সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রকাশ্যে দ্বিমত পোষণ করেন, তাহলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। নিজে থেকে পদত্যাগ না করলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বরখাস্ত করতে পারেন।
- **সংসদের কাছে জবাবদিহিঃ** পুরো সরকার তার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য সংসদের কাছে সম্মিলিতভাবে জবাবদিহি করে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়, সরকার যেন আইনসভার আস্থা নিয়েই দেশ চালায়।

উদ্দেশ্য: এই সম্মিলিত দায়িত্বের মূল্য উদ্দেশ্য হলো সরকারের ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। এর ফলে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সরকারের শাসন করার ক্ষমতা এবং সুসংহত নীতিগত অ্যাজেন্ডা উপস্থাপনের ক্ষমতাকে দুর্বল করা থেকে বিরত রাখে।

**মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব** (Individual Ministerial Responsibility)

এই নীতি অনুযায়ী, একজন মন্ত্রী তাঁর নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যক্রম, ত্রুটি, সামগ্রিক আচরণ এবং তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত আচরণের জন্য চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকেন।

**মূল দিকসমূহ**

- **বিভাগীয় জবাবদিহি:** প্রত্যেক মন্ত্রী তাঁর নিজ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের রাজনৈতিক প্রধান। তাই তাঁর দপ্তরের মধ্যে কিছু ঘটে, তার জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন। তাঁর বেসামরিক কর্মচারীদের কার্যক্রমের জন্যও তিনি জবাবদিহি করেন।
- **ব্যক্তিগত আচরণ:** একজন মন্ত্রীকে উচ্চ মানের সততা ও নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে। যেকোনো বড় ধরনের ব্যক্তিগত অসদাচরণ পদত্যাগের চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- **জ্ঞান বনাম দায়িত্ব:** মন্ত্রণালয়ের কোনো অন্যায় বা ভুলের কথা যদি মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে অবগত না-ও হন, তাতে কিছু যায়-আসে না। সাংবিধানিকভাবে এর দায়টা তাঁরই। কারণ, তিনিই বিভাগের প্রধান।
- **সংসদে জবাবদিহি:** নিজের মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে সংসদে ওঠা যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করা এবং সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা; এগুলো মন্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।
- **লঙ্ঘনের শাস্তি:** মন্ত্রণালয়ের বড় কোনো ব্যর্থতা, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি বা মন্ত্রীর নিজের কোনো ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটলে তাঁর পদত্যাগ প্রত্যাশা করা হতে পারে। তবে বাস্তবে মন্ত্রীদের পদত্যাগ নির্ভর করে রাজনৈতিক সুবিধা আর প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনের ওপর, কঠোরভাবে এই প্রথা মেনে চলার ওপর নয়।

**উদ্দেশ্য:** ব্যক্তিগত দায়িত্বের লক্ষ্য হলো সরকারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে জবাবদিহি নিশ্চিত করা, মন্ত্রী এবং তাঁর বিভাগগুলোর সততা ও যোগ্যতার ওপর জনগণের আস্থা বজায় রাখা। এটি মন্ত্রীদের উৎসাহিত করে, তাঁরা যেন নিজের মন্ত্রণালয়ের সব কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

**সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্বতন্ত্র হলেও এই দুটি নীতি একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত**

- **সম্মিলিত দায়িত্ব ব্যক্তিগত দায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল:** মন্ত্রীরা যদি নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব ঠিকমতো না নেন, তবে পুরো সরকারের সম্মিলিত দায়িত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **ঐক্য বনাম জবাবদিহি:** সম্মিলিত দায়িত্ব সরকারের ঐক্যের ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব জোর দেয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহি করার ওপর।

সমসাময়িক রাজনীতিতে এই দুটি নীতির প্রয়োগ কখনো কখনো জটিল হতে পারে এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে এগুলো মৌলিক প্রথা হিসেবে রয়ে গেছে।

**উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী**

বাংলাদেশের 'কার্যপ্রণালি বিধি, ১৯৯৬' বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীকে উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়। সরকারের কাজ কীভাবে বণ্টন ও সম্পাদিত হবে, তা নির্ধারণের জন্য এই বিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা যাক, এই বিধিমালা কীভাবে কাজ করে:

উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী নিয়োগের মূল বিধান

এই ক্ষমতার উৎস হলো কার্যপ্রণালি বিধি, ১৯৯৬-এর ৩বি ধারা। সেখানে যা বলা আছে:

- **বিবেচনামূলক ক্ষমতা:** 'এই বিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থে যতজন উপযুক্ত মনে করেন, ততজন উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারীকে তিনি যে শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন, সেই অনুযায়ী নিয়োগ করতে পারেন।' অর্থাৎ দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী যতজনকে দরকার মনে করবেন, ততজন উপদেষ্টা বা বিশেষ সহকারী নিয়োগ দিতে পারবেন। সংখ্যার কোনো বাঁধাধরা সীমা নেই।
- **উপদেশ ও সহায়তাবিষয়ক ভূমিকা:** 'প্রধানমন্ত্রী একজন উপদেষ্টা বা একজন বিশেষ সহকারীকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহ নির্ধারণ করে দিতে পারেন, যাতে তিনি সে বিষয়ে উপদেশমূলক সেবা ও সহায়তা প্রদান করতে পারেন। একজন উপদেষ্টা বা একজন বিশেষ সহকারী প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সময়-সময় নির্ধারিত বিশেষ কাজগুলোও সম্পাদন করবেন।' এর অর্থ, তাঁদের মূল কাজ হলো প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া। প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া যেতে পারে।

- **নিয়োগের শর্ত:** তাঁদের পদমর্যাদা (যেমন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা সচিবের সমতুল্য), পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা; সবই নির্ধারণ করবেন প্রধানমন্ত্রী।
- **নিয়োগের অবসান:** নিয়োগ যেমন প্রধানমন্ত্রীর হাতে, তেমনি তাঁদের নিয়োগ বাতিলের ক্ষমতাও তাঁরই। বিধিতে বলা হয়েছে: 'একজন উপদেষ্টা বা একজন বিশেষ সহকারী প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন; এবং প্রধানমন্ত্রী যেকোনো সময় উপদেষ্টা বা বিশেষ সহকারীর নিয়োগ বাতিল করতে পারেন।'

**প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য**

- **সাংবিধানিক ভিত্তি:** প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কার্যপ্রণালি বিধি থেকে এলেও এ ধরনের বিধি প্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আসে সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ থেকে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'রাষ্ট্রপতি সরকারের কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিবেন।' বাংলাদেশের মতো সংসদীয় ব্যবস্থায় এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই।
- **শাসনের জন্য নমনীয়তা:** উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী নিয়োগের বিধান প্রধানমন্ত্রীকে কয়েক ধরনের সুবিধা দেয়:
  - **বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসা:** এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন, যাঁরা সংসদ সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তা নন। এই বিধানের ফলে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন।
  - **ক্ষমতা বৃদ্ধি:** আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভার আকার না বাড়িয়েই নির্দিষ্ট কোনো নীতি ক্ষেত্র বা জরুরি কাজ পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রী সরকারের ক্ষমতা বাড়াতে পারেন।
  - **রাজনৈতিক নিয়োগ:** প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মিত্র বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও এই পদগুলো ব্যবহার করেন, যাঁরা হয়তো মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি।

মোদ্দাকথা হলো, কার্যপ্রণালি বিধিগুলো প্রধানমন্ত্রীকে উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী নিয়োগের আইনি কাঠামো দেয়। এর ফলে এই পদগুলো শাসনকাজ ও নীতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়। তবে এই ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে।

**বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 'সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী'**

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেন 'সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী' (all-powerful) বলা হয়; এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সাংবিধানিক বিধান, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ও দেশের রাজনৈতিক গতিশীলতার ভেতর। সংবিধানগতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যবস্থা থাকলেও, বাস্তবে বেশ কিছু কারণে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই কেন্দ্রীভূত হয় প্রায় সব ক্ষমতা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেন অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়, তার কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

সরকারপ্রধান হিসেবে ব্যাপক নির্বাহী ক্ষমতা

- **সাংবিধানিক ক্ষমতা:** সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা এই সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা বা তার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হইবে।' এই অনুচ্ছেদের বলে প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা পান প্রধানমন্ত্রী। ফলে রাষ্ট্রপতি মূলত আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা পালন করেন; কারণ ৪৮(৩) ধারা অনুযায়ী, প্রায় সব কাজই তাঁকে করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী।
- **মন্ত্রিসভা গঠন ও নিয়ন্ত্রণ:** কারা মন্ত্রী হবেন, কে কোন দপ্তর পাবেন; সবই ঠিক করেন প্রধানমন্ত্রী। তাই মন্ত্রীরাও জানেন, তাঁদের থাকা না-থাকা নির্ভর করে মূলত প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার ওপর। ফলে মন্ত্রিসভায় তৈরি হয় তীব্র আনুগত্য; ভিন্নমত দেখাতে নিরুৎসাহিত হন মন্ত্রীরা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী, সরকারের সব নীতিগত অ্যাজেন্ডাও কার্যকরভাবে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।
- **আমলাতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ:** প্রায় সব সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। দেশের বিশাল আমলাতন্ত্র, আইন প্রয়োগকারী বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন নির্বাহী বিভাগের হাতেই।

**আইনসভায় (সংসদীয় ব্যবস্থায়) প্রভাবশালী অবস্থান**

- **সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা:** সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী হন সংসদ নেতা এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (বা জোটের) নেতা।
- **৭০ অনুচ্ছেদ (ফ্লোর ক্রসিং বিরোধী আইন):** এটা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অন্যতম বড় উৎস। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অত্যন্ত কঠোর। সংসদ সদস্যদের তাঁদের নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ করে এই অনুচ্ছেদ। একজন সংসদ সদস্য যদি তাঁর

দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, অনুপস্থিত থাকেন বা যে দল তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেই দল থেকে পদত্যাগ করেন, তবে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর আসন হারান। এটি দলে চূড়ান্ত শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। এর অর্থ হলো, প্রধানমন্ত্রীর দলের যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তবে সংসদে সরকারের আনা যেকোনো বিল পাস হয়ে যায় প্রায় বিনা চ্যালেঞ্জে।

- **আইন প্রণয়নের অ্যাজেন্ডা নিয়ন্ত্রণ:** সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই সংসদীয় অ্যাজেন্ডা নিয়ন্ত্রণ করেন। কোন বিল উঠবে, কোনটি পাস হবে; সবই ঠিক হয় তাঁর নির্দেশে। ফলে সংসদ বাস্তবে প্রায়ই সরকারের অ্যাজেন্ডার জন্য রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়; শক্তিশালী স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ তাঁর কমই থাকে।

### বিচার বিভাগের ওপর প্রভাব

- **বিচারপতি নিয়োগ:** প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সেই নিয়োগও হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেক্রমেই (প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিয়োগ ব্যতীত)। এর ফলে বিচার বিভাগের ওপরও প্রধানমন্ত্রীর একটি পরোক্ষ কিন্তু জোরালো প্রভাব তৈরি হয়, বিশেষত উচ্চ আদালতের গঠনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে। তবে, নভেম্বর ২০২৫-এ এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়েছে। সেটা কতখানি কার্যকর হয়, তা সময় বলে দেবে।

### বাস্তবে সীমিত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য

- **দুর্বল বিরোধী দল:** বাংলাদেশে প্রায়ই সংসদে দুর্বল বা সংসদ বর্জনকারী বিরোধী দল দেখা গেছে। এতে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বের ওপর যেকোনো অর্থপূর্ণ আইনগত যাচাই বা চ্যালেঞ্জ আরও কমেছে।
- **স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অভাব:** সমালোচকদের মতে, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে; যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন; কখনো কখনো প্রকৃত স্বাধীনতার অভাব দেখা যায় বা রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতি তারা সংবেদনশীল থাকে।
- **রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বংশীয় রাজনীতি:** দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাই এমন যে, এখানে নেতার প্রতি থাকে দৃঢ় আনুগত্য। সঙ্গে আছে বংশীয় রাজনীতির ধারা, যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের হাতে। এই দুটি জিনিস প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে আরও শক্তিশালী করে।

### জরুরি ও বিশেষ ক্ষমতা

দেশের কোনো সংকটময় মুহূর্তে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নির্বাহী বিভাগ ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। আর সেই বিভাগের নেতৃত্বে থাকেন প্রধানমন্ত্রী, যা তাঁর ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সংক্ষেপে, সাংবিধানিক নকশা (বিশেষ করে ৭০ অনুচ্ছেদ), দুর্বল বিরোধী দল ও নির্বাহী বিভাগের ওপর প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ; সবকিছু মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা। এ কারণে কিছু পর্যবেক্ষক এই ব্যবস্থাকে সত্যিকারের গণতন্ত্র না বলে 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র' বা 'ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ'-এর আদলে আখ্যা দিয়েছেন।

### মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক কভার করার কার্যকর পদ্ধতি

মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক সাধারণত রুদ্ধদ্বার হয়। উচ্চপর্যায়ের সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এসব বৈঠকে। তাই সাংবাদিকদের জন্য এসব বৈঠক সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা সেখান থেকে সরাসরি প্রতিবেদন করা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, তাঁদের বৈঠকে প্রবেশের অনুমতি নেই; বাংলাদেশে তো বটেই, বেশির ভাগ সংসদীয় গণতন্ত্রেই এই নিয়ম।

তাই সাংবাদিকদের নির্ভর করতে হয় কিছু পরোক্ষ পদ্ধতির ওপর। দেখা যাক, কীভাবে তাঁরা কাজটা করেন:

### ১. বৈঠক-পরবর্তী ব্রিফিং/সংবাদ সম্মেলন

- **প্রাথমিক উৎস:** এটাই মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সবচেয়ে সাধারণ ও আনুষ্ঠানিক রাস্তা। বৈঠক শেষ হলে একজন মনোনীত সরকারি কর্মকর্তা (সাধারণত মন্ত্রিপরিষদ সচিব, একজন সরকারি মুখপাত্র বা একজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী) প্রেস ব্রিফিং করেন।
- **কী তথ্য জানানো হয়:** এই ব্রিফিংয়ে সরকারের মুখপাত্র সাধারণত গৃহীত মূল সিদ্ধান্ত, অনুমোদিত নীতি, নতুন আইনের খসড়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তের পেছনের যুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিতে পারেন।
- **প্রশ্নোত্তর পর্ব:** এরপর সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করার সুযোগ পান। তাঁরা আরও বিস্তারিত তথ্য চান, সিদ্ধান্তের প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

- **সীমাবদ্ধতা:** এই ব্রিফিংয়ের সমস্যা হলো, প্রদত্ত তথ্য প্রায়ই সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে সাংবাদিকেরা ততটুকুই জানতে পারেন, সরকার যতটুকু জানাতে চায়। আলোচ্যসূচি বা কোনো অ্যাজেন্ডা নিয়ে মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, বিস্তারিত আলোচনা বা ভিন্নমত– এসবের তেমন কিছুই বাইরে আসে না। যা-ও আসে, খুব কম। সরকারি কর্মকর্তা সংবেদনশীল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন।

**২. খবর ফাঁস ও অফ-দ্য-রেকর্ড ব্রিফিং**

- **অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল:** এখানেই আরও 'নেপথ্যের' প্রতিবেদন আসে। সাংবাদিকেরা সরকারের, আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক মহলের ভেতর নিজেদের সূত্র (সোর্স) তৈরি করেন। এই সূত্রগুলো মন্ত্রিপরিষদের আলোচনা, অভ্যন্তরীণ বিতর্ক বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার আগেই তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
- **ঝুঁকি:** ফাঁস হওয়া তথ্য হতে পারে অনির্ভরযোগ্য কিংবা কৌশলগতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (একটি নির্দিষ্ট বর্ণনাকে সমর্থনের জন্য), এমনকি মিথ্যাও। তাই সাংবাদিকদের অবশ্যই ফাঁস হয়ে আসা প্রতিটি তথ্যের সত্যতা কঠোরভাবে যাচাই করতে হবে।
- **অফ-দ্য-রেকর্ড:** অনেক সময় সরকারি কর্তারা 'অফ-দ্য-রেকর্ড' তথ্য দেন। মানে, এই তথ্য পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু উৎস হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। এটি সাংবাদিকদের তাঁদের সূত্রকে বিপদে না ফেলে সূক্ষ্মতা বুঝতে সাহায্য করে।

**৩. অফিশিয়াল ডকুমেন্ট ও রিলিজ**

- **সিদ্ধান্ত-পরবর্তী ডকুমেন্ট:** মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অফিশিয়াল গেজেট, সার্কুলার বা বিস্তারিত নীতিগত ডকুমেন্ট প্রকাশ করে। সাংবাদিকেরা এসব ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তের পূর্ণ পরিধি ও আইনি প্রভাব বের করেন।
- **মন্ত্রিপরিষদের কাগজপত্র (কখনো কখনো গোপনীয়তা তুলে নেওয়া হয়):** কিছু দেশে মন্ত্রিপরিষদের কাগজপত্র বা কার্যবিবরণীর ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর গোপনীয়তা তুলে নেওয়া হয় এবং জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়। এগুলো তাৎক্ষণিক খবরের জন্য কাজে না লাগলেও, ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

**৪. রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও বৈঠকের আগে গুঞ্জন**

- **চোখ-কান খোলা রাখা:** মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের আগেই সাংবাদিকেরা রাজনৈতিক অঙ্গনের ঘটনাপ্রবাহ, মন্ত্রীদের বিবৃতি, জন-আলোচনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এসব থেকে তাঁরা প্রায়ই আঁচ করতে পারেন, বৈঠকে কোন বিষয়গুলো আলোচ্যসূচিতে থাকবে।
- **লবিং:** কোনো গোষ্ঠী বা মন্ত্রণালয় কোন নীতির জন্য চাপ দিচ্ছে, তা বুঝতে পারলে বৈঠকের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।
- **দলের অবস্থান:** জোট সরকারের জন্য সাংবাদিকেরা মূল বিষয়গুলোতে জোট শরিকদের ভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন করতে পারেন, যা মন্ত্রিপরিষদে সম্ভাব্য বিতর্কের ইঙ্গিত দেয়।

**৫. ফলো-আপ রিপোর্টিং**

- **প্রভাব বিশ্লেষণ:** সরকারি ঘোষণার খবর সংগ্রহ করেই সাংবাদিকদের কাজ শেষ হয় না। এরপর তাঁরা ছোটেন বিশেষজ্ঞ, প্রভাবিত পক্ষ ও জনসাধারণের সাক্ষাৎকার নিতে। সিদ্ধান্তের আসল প্রভাব কী হবে, তা বের করে আনাই তখন তাঁদের লক্ষ্য।
- **বাস্তবায়ন ট্র্যাকিং:** সরকারের নেওয়া নীতিগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কি না, লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে কি না; সেসবও পর্যবেক্ষণ করেন সাংবাদিকেরা। অনেক সময় এর জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার আশ্রয় নিতে হয়।

**বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক কভার করা কঠিন কেন?**

- **সীমিত তথ্য:** সরকারি কাজের, বিশেষত মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন।
- **অ্যাক্রিডিটেশন সমস্যা:** সাংবাদিকদের সরকারি পরিচয়পত্র (অ্যাক্রিডিটেশন) বাতিল করে দেওয়া হতে পারে। এর ফলে সরকারি অফিস বা আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে প্রবেশাধিকার সীমিত বা বন্ধ হয়ে যায়।
- **প্রতিশোধের ভয়:** সরকারকে অসন্তুষ্ট করার মতো কোনো সংবেদনশীল বা ফাঁস হওয়া তথ্য প্রকাশ করলে সাংবাদিকদের ওপর নেমে আসে চাপ, এমনকি আইনি প্রতিক্রিয়া।

- **নিয়ন্ত্রিত তথ্য:** আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে যেসব তথ্য দেওয়া হয়, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ফলে বৈঠকের প্রকৃত ও ব্যাপক চিত্র তুলে ধরা সাংবাদিকদের জন্য একরকম কঠিন হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক কভার করা সাংবাদিকদের জন্য সরাসরি পর্যবেক্ষণ নয়। এর মানে, বৈঠক-পরবর্তী আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং থেকে তথ্য সংগ্রহ, অনানুষ্ঠানিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্র তৈরি, আনুষ্ঠানিক ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করা এবং জনগণের জন্য সম্পূর্ণ গল্প একত্র করার জন্য বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝা।

# সংসদ

### সংসদের ইতিহাস

শাসকের তাঁর সিদ্ধান্তে পরামর্শ বা সম্মতি দেওয়ার জন্য আলোচনা সভার ধারণাটা বহু পুরোনো। মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন গ্রিস (যেমন এথেনিয়ান এক্লেসিয়া) ও রোমেও এর আদিরূপ দেখা যায়। তবে বিশেষত প্রতিনিধি ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে আধুনিক সংসদের আসল শিকড় গাড়া আছে মধ্যযুগের ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে।

**১. প্রাথমিক সভা ও পরিষদ:** 'সংসদ' শব্দটি প্রচলিত হওয়ার আগে অ্যাংলো-স্যাক্সন ইংল্যান্ডে ছিল 'উইটেনাজেমোট' (Witenagemot)। দেশের জ্ঞানীগুণী, অভিজাত ও পাদ্রিদের নিয়ে গড়া এই পরিষদ রাজাকে পরামর্শ দিত। ১০৬৬ সালে নরম্যানরা দেশ দখল করার পর এর নাম হলো 'কিউরিয়া রেগিস' (Curia Regis) বা 'গ্রেট কাউন্সিল' (Great Council)। তবে এর কাজ একই রইল; বিশেষ করে অর্থ ও বিচার-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিত।

**২. ম্যাগনা কার্টা (১২১৫):** রাজা জনের সই করা এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল যুগান্তকারী। রাজার যা খুশি তা-ই করার ক্ষমতায় পড়ল শক্ত লাগাম এ দলিলের সুবাদে। ম্যাগনা কার্টায় ঘোষণা দেওয়া হলো: 'রাজ্যের সাধারণ পরামর্শ' (common counsel of the realm) ছাড়া রাজা নির্দিষ্ট কর আরোপ করতে পারবেন না। এই ঘোষণাই করারোপে সম্মতির ধারণা এবং শেষ পর্যন্ত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার বিকাশে ভিত্তি স্থাপন করে।

**৩. 'সংসদ'-এর উদ্ভব (তেরো শতক):** 'পার্লামেন্ট' শব্দটি এসেছে পুরোনো ফরাসি শব্দ 'পারলেমেন্ট' থেকে। এর অর্থ 'আলোচনা' বা 'কথা বলা'। ইংল্যান্ডে তেরো শতকে গ্রেট কাউন্সিলের বৃহত্তর সভাগুলোকে এই নামে ডাকা শুরু হয়।

- **সাইমন ডি মন্টফোর্টের সংসদ (১২৬৫):** সাইমন ডি মন্টফোর্ট নামে এক বিদ্রোহী ব্যারন একটি বড় কাজ করেন। ১২৬৫ সালে তিনি এমন এক সংসদ আহ্বান করেন, যেখানে শুধু অভিজাত আর যাজকেরা নয়, প্রথমবারের মতো শায়ার (নাইট) ও বরো (বার্গেস) থেকে যোগ দিলেন সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও। সাধারণ মানুষের এই অন্তর্ভুক্তি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- **মডেল পার্লামেন্ট (১২৯৫):** ডি মন্টফোর্টের দেখানো পথকে আরও সুসংহত করেন রাজা প্রথম এডওয়ার্ড। তাঁর ডাকা 'মডেল পার্লামেন্ট' লর্ড ও যাজকদের পাশাপাশি প্রতিটি কাউন্টি থেকে দুজন নাইট আর প্রত্যেক বড় শহর থেকে দুজন বার্গেসকে এক ছাদের নিচে নিয়ে এল। জন্ম নিল প্রতিনিধিত্বের এক নতুন ধারা।

**৪. দুই কক্ষের বিকাশ (চৌদ্দ শতক):** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত ও যাজকদের প্রতিনিধিরা নাইট ও বার্গেসদের থেকে আলাদাভাবে বৈঠক করতে শুরু করলেন। এভাবেই জন্ম নিল দুটো আলাদা কক্ষ: অভিজাত ও জ্যেষ্ঠ যাজকদের প্রতিনিধিত্বকারী হাউস অব লর্ডস এবং সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের জন্য হাউস অব কমন্স। তৈরি হলো দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।

**৫. সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি (সতেরো-আঠারো শতক)**

- **ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-১৬৫১):** এই সংঘাত ঘটেছিল মূলত রাজা ও সংসদের মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। সেই লড়াইয়ে সংসদের জয় তার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল বহুগুণ।
- **গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮) ও বিল অব রাইটস (১৬৮৯):** এই সময়কাল রাজার ওপর সংসদের আধিপত্যকে সুদৃঢ় করে। বিল অব রাইটস নিশ্চিত করে, এখন থেকে আইন প্রণয়ন, কর আরোপ ও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে সংসদের হাতে। সংসদের ভেতরে বাক্‌স্বাধীনতাও নিশ্চিত করে এই দলিল। আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হলো এভাবেই।

### ৬. ভোটের অধিকার ও আধুনিক সংসদ

আঠারো, উনিশ ও বিশ শতাব্দীজুড়ে এরপরের কয়েক শতক ধরে চলল আরেক লড়াই; ভোটের অধিকারের লড়াই। ধীরে ধীরে ভোটের অধিকার শুধু ধনী অভিজাতদের হাতে না থেকে ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ মানুষের মধ্যেও। সংসদ হয়ে উঠল জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি। ব্রিটিশরা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই ওয়েস্টমিনস্টার সংসদীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করে অনেক সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ।

### গণতন্ত্রে সংসদ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলোর একটি হলো সংসদ। কারণ, এখানেই জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি ও আইনের শাসনে নীতির বাস্তব রূপ দেখা যায়।

### ১. জনগণের প্রতিনিধিত্ব

- **ভোটারদের কণ্ঠ:** সংসদকে এমন প্রাথমিক ফোরাম হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে দেশের আপামর জনসাধারণের নানা মত, স্বার্থ ও দাবি শোনা হয়, সেসব নিয়ে বিতর্ক করা হয়। নির্বাচিত সদস্যরা নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরেন জাতীয় পর্যায়ে।
- **বৈধতা:** সংসদের সদস্যরা নির্বাচিত হন জনগণের ভোটে। তাই তাঁদের সব কাজের পেছনে থাকে শাসিতদের সম্মতি। আর তাঁদের সম্মতিই গণতান্ত্রিক সরকারের সিদ্ধান্তগুলোকে বৈধতা দেয়।

### ২. আইন প্রণয়ন (Legislation)

- **প্রাথমিক আইন প্রণয়নকারী সংস্থা:** দেশের আইনকানুনের খসড়া প্রস্তুত; আলোচনা, সংশোধন ও পাস করার মূল কেন্দ্র হলো সংসদ। আইনগুলো যেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করে এটি।
- **সামাজিক চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া:** সমাজ বদলায়, নতুন নতুন সমস্যা সামনে আসে। সংসদ পুরোনো আইনকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদা মেটাতে নতুন আইন তৈরি করে।

### ৩. নির্বাহী বিভাগের তদারকি ও জবাবদিহি

- **সরকারকে জবাবদিহি:** নির্বাহী শাখার (সরকার) কার্যক্রম পরীক্ষা করা সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মন্ত্রীদের প্রশ্ন করা, তাঁদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিতর্ক করা, অনুসন্ধান চালানো ও সরকারি ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা– সবই এর মধ্যে পড়ে।
- **ক্ষমতার ভারসাম্য:** সংসদ সরকারের ক্ষমতার ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এতে ক্ষমতার অপব্যবহারের ভয় কমে, সরকার আইনের সীমার মধ্যে কাজ করে এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকাও নির্ভর করে সংসদের আস্থার ওপর।

### ৪. বাজেট নিয়ন্ত্রণ (Power of the Purse)

- **জনগণের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ:** সরকারের রাজস্ব (কর) ও ব্যয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতা সাধারণত সংসদের হাতেই থাকে। জনগণের আরোপ করা কর কোথায়, কীভাবে খরচ হবে, তার নিয়ন্ত্রণ করে সংসদ। এই 'অর্থের ক্ষমতা' সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। সাধারণত সংসদের অনুমোদন ছাড়া নতুন কোনো কর আরোপ করা যায় না।

### ৫. বিতর্ক ও আলোচনার ফোরাম

- **জনসাধারণের আলোচনা:** গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে জাতীয় বিতর্কের মূল মঞ্চ হলো সংসদ। এখানে সব ধরনের মত তুলে ধরা হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়। এই খোলা আলোচনাগুলোই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং জনমত তৈরি করতে সাহায্য করে।

### ৬. অভিযোগের প্রতিকার

- **নাগরিকদের উদ্বেগ:** সংসদ সদস্যরা শুধু আইনই প্রণয়ন করেন না, তাঁরা নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষের অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরার একটি মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেন। এর মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়।

মূলত সংসদ হলো সেই জায়গা, যেখানে গণতন্ত্র প্রাণ খুলে শ্বাস নেয়। এখানেই জনগণের ইচ্ছাকে নীতিতে পরিণত করা হয়, ক্ষমতাকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয় এবং স্ব-শাসনের মৌলিক নীতিগুলো চর্চা করা হয়।

### সংসদ সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধান যা বলে

১৯৭২ সালে গৃহীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। তাতেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে জাতীয় সংসদের পরিচিতি, এর ভূমিকা, গঠন ও কার্যাবলি। যেহেতু বাংলাদেশ চলে সংসদীয় পদ্ধতিতে, তাই আইন প্রণয়ন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষমতা আছে সংসদের।

সংসদ-সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি মূলত সংবিধানের পঞ্চম খণ্ডের 'আইনসভা' শিরোনামের প্রথম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়।

#### ১. প্রতিষ্ঠা ও গঠন (অনুচ্ছেদ ৬৫)

- **প্রতিষ্ঠা:** অনুচ্ছেদ ৬৫(১)-এ বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে একটি সংসদ থাকিবে (যাহা জাতীয় সংসদ নামে অভিহিত হইবে) এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা এই সংসদের ওপর ন্যস্ত হইবে।' এই অনুচ্ছেদই সংসদকে দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে।
- **গঠন:** সাধারণত ৩০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই সদস্যরা আসবেন সরাসরি জনগণের ভোটে, নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে (অনুচ্ছেদ ৬৫(২)০। এ ছাড়া নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে, যাঁরা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই বিধান পর্যায়ক্রমে বর্ধিত করা হয়েছে (যেমন সপ্তদশ সংশোধনী আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ২৫ বছরের জন্য) (অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)।
- **আসন:** সংবিধানে আরও বলা হয়েছে, 'সংসদের অধিবেশন হইবে রাজধানীতে' [অনুচ্ছেদ ৬৫(৪)]।

#### ২. সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (অনুচ্ছেদ ৬৬)

সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মানদণ্ড ও পদ ধারণের অযোগ্যতার শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছে সংবিধান। এসব মানদণ্ড নিশ্চিত করে যে কেবল যোগ্য নাগরিকেরাই এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করেন।

#### ৩. সংসদের অধিবেশন (অনুচ্ছেদ ৭২)

রাষ্ট্রপতি সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সংসদ আহ্বান, স্থগিত (prorogue) ও ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। অধিবেশনগুলোর মধ্যে বিরতির জন্য প্রয়োজনীয়তাও নির্ধারণ করে সংবিধান।

#### ৪. স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার (অনুচ্ছেদ ৭৪)

সংসদ তার সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করে, যাঁরা অধিবেশন পরিচালনা করেন এবং সংসদীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত করেন।

#### ৫. কার্যপ্রণালি বিধি (অনুচ্ছেদ ৭৫)

সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে সংসদ তার কার্যপ্রণালি ও কার্য পরিচালনার জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে।

### সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মূল কার্যাবলি

সংবিধান সংসদকে কয়েকটি ভাগে মূল ক্ষমতাগুলো দিয়েছে:

#### ১. আইন প্রণয়নমূলক কার্য (Legislative Function)

- **প্রাথমিক আইন প্রণয়নকারী সংস্থা:** অনুচ্ছেদ ৬৫(১) অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত। এর অর্থ হলো দেশের সব আইন প্রণয়ন, বিতর্ক, সংশোধন ও কার্যকর করার দায়িত্ব সংসদের। যেকোনো বিল আইনে পরিণত হওয়ার জন্য সংসদে নানা ধাপ পেরোতে হয়; উপস্থাপন, বিবেচনা, কমিটি পর্যালোচনা, বিতর্ক ও ভোটদান।
- **প্রত্যায়িত আইন** (Delegated Legislation): সংবিধান সংসদকে সদস্যদের আইন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আইনগত প্রভাব রয়েছে এমন বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা অন্যান্য দলিল তৈরি করার ক্ষমতা অর্পণের অনুমতি দেয়।

#### ২. আর্থিক কার্য (Financial Function)

- **কর আরোপের ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ৮৩):** সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে: 'সংসদের কোনো আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা আদায় করা যাইবে না।' করের ওপর সংসদের এই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ দেয় এই অনুচ্ছেদ, যা 'প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়' নিশ্চিত করে।

- **জনগণের ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ (অনুচ্ছেদ ৮৪-৯২)**
  - **সমন্বিত তহবিল** (Consolidated Fund): সরকারের প্রাপ্ত সব রাজস্ব ও উত্থাপিত সব ঋণ একত্রিত তহবিলে জমা হয়।
  - **অর্থ বরাদ্দ** (Appropriation of Money): সংসদের আইন ব্যতীত সমন্বিত তহবিল থেকে কোনো অর্থ বরাদ্দ (উত্তোলন) করা যাবে না।
  - **বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (বাজেট-অনুচ্ছেদ ৮৭):** অর্থমন্ত্রী (সরকারের পরামর্শক্রমে) সংসদের সামনে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (বাজেট) উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে রাজস্ব ও ব্যয়ের অনুমান অন্তর্ভুক্ত থাকে।
  - **অনুদান দাবির ওপর ভোটদান:** সংসদ কোনো অনুদান দাবি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা পরিমাণ কমানোর শর্তে অনুমোদন করার ক্ষমতা রাখে। এটি সংসদকে জনসম্পদ কীভাবে ব্যয় করা হয়, তার ওপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ দেয়।
  - **বাজেট বিল** (Appropriation Bill): অনুদান অনুমোদিত হওয়ার পর, সমন্বিত তহবিল থেকে ব্যয়ের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য বাজেট বিল উপস্থাপন ও সংসদে পাস করা হয়।
- **নিরীক্ষা প্রতিবেদন:** মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রতিবেদন, যিনি সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করেন, তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংসদে উপস্থাপন করা হয় (অনুচ্ছেদ ১৩২)।

**৩. নির্বাহী বিভাগের (সরকার) তদারকি ও জবাবদিহি**

- **সম্মিলিত দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৫৫(৩)]:** সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, 'মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকিবেন।' এর অর্থ, সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে হলে সংসদের আস্থা অর্জন করে চলতে হবে।
- **জবাবদিহির মাধ্যম:** যদিও সব পদ্ধতি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোতে স্পষ্টভাবে বিস্তারিত নেই, সংবিধান সংসদীয় প্রক্রিয়াগুলোকে সমর্থন করে, যা জবাবদিহি সক্ষম করে:
  - প্রশ্ন: সংসদ সদস্যরা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন করতে পারেন।
  - বিতর্ক: সংসদ সরকারি নীতি ও কর্মের ওপর বিতর্কের জন্য একটি ফোরাম সরবরাহ করে।
  - প্রস্তাব (Motions): এর মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত, যা পাস হলে সরকারের পতন হতে পারে।
  - স্থায়ী কমিটি (অনুচ্ছেদ ৭৬): সংসদ বিল যাচাই-বাছাই, সরকারি নীতি পর্যালোচনা এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারে, যা তদারকি বাড়ায়।
- **রাষ্ট্রপতির ভূমিকা:** রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন (অনুচ্ছেদ ৪৮) এবং সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করেন। তবে সংসদে ভাষণ দেওয়া ও বার্তা পাঠানোর সাংবিধানিক দায়িত্বও তার রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৭৩), যা নিরীক্ষা ও ভারসাম্যের ব্যবস্থায় অবদান রাখে।

**৪. সংবিধান সংশোধন (অনুচ্ছেদ ১৪২):** মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংসদ সংবিধানের যেকোনো বিধান সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে। তবে সংবিধানের কিছু 'মৌলিক বিধান' সংশোধনযোগ্য নয় (অনুচ্ছেদ ৭বি)।

**৫. নির্বাচনী কার্যাবলি**

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদের ভূমিকা রয়েছে [অনুচ্ছেদ ৪৮(১)]।
- স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন।

**৬. অভিশংসন:** গুরুতর অসদাচরণ বা দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারকে অভিশংসন করার ক্ষমতা রয়েছে সংসদের।

**৭. সরকার গঠন এবং অবসান:** সংসদ যেমন নতুন সরকারের জন্ম দেয়, তেমনি গঠিত সরকারের মেয়াদের অবসানও ঘটাতে পারে। প্রধানমন্ত্রী কখনো সংসদের আস্থা হারালে তিনি নিজ পদে বহাল থাকতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভারও অবসান ঘটে।

## সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি কী, কেন পড়বেন

জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত বাংলাদেশের সংসদ চলে একটি বিস্তৃত কার্যপ্রণালি বিধি মেনে। এর দৈনন্দিন কাজকর্মের সবটাই পরিচালিত হয় এই বিধির আওতায়। সুশৃঙ্খল বিতর্ক, কার্যকর আইন প্রণয়ন ও সরকারের সঠিক জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য এই বিধিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান নিজেই [অনুচ্ছেদ ৭৫(১)(ক)] সংসদকে এই বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে।

### বাংলাদেশ সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংসদের এই কার্যপ্রণালি বিধি একটি বিস্তারিত নিয়মাবলি। সংসদীয় কার্যক্রম কীভাবে চলবে, তার নির্দেশনা দেওয়া আছে এতে। ন্যায্যতা, দক্ষতা ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

জেনে নেওয়া যাক কার্যপ্রণালি বিধির প্রধান কিছু বিষয়ের ওপর:

- **সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও বিলুপ্তি:** রাষ্ট্রপতি কখন সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত করবেন বা বিলুপ্ত করে দেবেন পুরো সংসদ; সবকিছুর পদ্ধতি লেখা আছে এখানে।
- **সদস্যদের শপথ ও তালিকা:** নতুন নির্বাচিত সদস্যরা কীভাবে শপথ গ্রহণ করবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হবেন।
- **স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন ও ক্ষমতা:** স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা এবং তাঁদের কর্তৃত্বের সংজ্ঞা, বিতর্কের নির্দেশনা দেওয়া ও কার্যপ্রণালির পয়েন্টগুলোতে রায় দেওয়া; সবই সংজ্ঞায়িত করা আছে।
- **সংসদের বৈঠক:** বৈঠকের দিন ও সময়, কোরামের প্রয়োজনীয়তা [একটি বৈধ বৈঠকের জন্য উপস্থিত সদস্যদের সর্বনিম্ন সংখ্যা, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৫(২) অনুসারে ৬০ জন] এবং মুলতবির পদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মাবলি।
- **কার্যক্রমের বিন্যাস:** সংসদীয় কাজকর্ম কীভাবে সংঘটিত হয়, তার নিয়ম। এসবের মধ্যে রয়েছে সরকারি কাজ, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও দিনের কার্যসূচি।
- **রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বার্তা:** সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার ও সংসদের মধ্যে বার্তা বিনিময়ের পদ্ধতি।
- **প্রশ্নাবলি:** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান সংসদ সদস্যরা। লিখিত উত্তর, মৌখিক উত্তর (তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জন্য) ও সম্পূরক প্রশ্নের নিয়ম আছে এর মধ্যে। কী ধরনের প্রশ্ন করা যাবে, তার ওপরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে (যেমন বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কিত নয়, ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, বিচারিক আচরণের ইঙ্গিত দেওয়া যাবে না)।
- **প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত:** সাধারণ প্রস্তাব, মুলতবি প্রস্তাব (তাৎক্ষণিক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে), দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ও সিদ্ধান্ত; এসব তোলার পদ্ধতি। কোনটা গ্রহণ করা হবে আর কোনটা হবে না, তারও শর্ত আছে।
- **আইন প্রণয়ন (বিল):** বিল উত্থাপন, বিবেচনা ও পাস করার বিস্তারিত পদ্ধতি। সাধারণত তিনটা পর্যায় পেরোতে হয় একটা বিলকে:
  - উত্থাপন: মন্ত্রী (সরকারি বিলের জন্য) বা কোনো সদস্য (বেসরকারি বিলের জন্য) বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতি চান।
  - বিবেচনা: বিলটি হয় তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়, নয়তো পাঠানো হয় কোনো স্থায়ী বা সিলেক্ট কমিটিতে। জনমত যাচাই করার জন্যও বিতরণ করা হতে পারে। বিলের নীতি ও সাধারণ ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।
  - পাস: বিলটি ধারা অনুসারে আলোচনা করা হয়। আনা হয় সংশোধনী প্রস্তাব। সবশেষে বিলটি ভোটের জন্য উত্থাপন করা হয়।
- **আর্থিক বিষয়াদি:** বার্ষিক বাজেট উপস্থাপন ও তার ওপর আলোচনা, অনুদানের দাবি, ব্যয়-সংক্রান্ত ভোট, ছাঁটাই প্রস্তাব ও বরাদ্দ বিল বা অর্থ বিল পাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয়গুলোর নিয়মকানুন।
- **সংসদীয় কমিটি:** পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, বিশেষাধিকার কমিটিসহ বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি কীভাবে গঠন হবে, তাদের ক্ষমতা ও কাজ কী হবে, সেসবের নিয়ম। বিল ও সরকারি নীতি যাচাই-বাছাইয়ে এই কমিটিগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- **সদস্যদের বিশেষাধিকার ও অধিকার:** সংসদের ভেতরে সদস্যদের বিশেষাধিকার ও অধিকার সুরক্ষার নিয়মাবলি।
- **গোপন বৈঠক:** নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সংসদের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠানের বিধান।
- **বিধি সংশোধনী:** এই কার্যপ্রণালি বিধিগুলোও সময়-সময় বদলানোর দরকার পড়ে। সেই পদ্ধতিও এখানে উল্লেখ করা আছে।

জাতীয় সংসদের কাজ ঠিকঠাক চালাতে এবং পরবর্তীকালে চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এই কার্যপ্রণালি বিধিগুলোকে প্রায়ই হালনাগাদ ও সংশোধন করা হয়।

### সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের গণতন্ত্রের মতো বাংলাদেশেরও আছে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা। আইন প্রণয়নমূলক তদারকি, নীতি যাচাই-বাছাই ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে একে ডিজাইন করা হয়েছে। তবে এর প্রকৃত কার্যকারিতা প্রায়ই তাত্ত্বিক সম্ভাবনা থেকে কম হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ তার কমিটি ব্যবস্থার ক্ষমতা পেয়েছে সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ ও সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি থেকে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে বলা হয় আইনসভার 'চোখ ও কান' বা 'মিনি পার্লামেন্ট'। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের ওপর নজরদারি বা 'ওয়াচডগ' হিসেবে তাদের ভূমিকা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### গঠন ও কাঠামো

- কমিটিতে সদস্য থাকেন সাধারণত ৮ থেকে ১৫ জন।
- স্পিকার সাধারণত সংসদে দলগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে সদস্যদের মনোনীত করেন।
- কমিটিগুলো সাধারণত সংসদের পুরো মেয়াদের জন্য কাজ করে, যদিও প্রয়োজনে পুনর্গঠন করা যেতে পারে।
- নির্দিষ্ট কাজের জন্য তারা আবার উপকমিটিও বানাতে পারে।

### সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যেভাবে 'ওয়াচডগ' হিসেবে কাজ করে

#### জবাবদিহি নিশ্চিত করা

- **সরকারের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই:** ওয়াচডগের মূল কাজ হলো ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় আনা। সরকারি মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর প্রতিটি কাজের ওপর কড়া নজর রাখে তারা। তাদের নীতি, কর্মক্ষমতা, বাজেট ব্যবহার, আইন মানা হচ্ছে কি না; সবই থাকে তাদের আতশি কাচের নিচে।
- **মন্ত্রীদের দায়বদ্ধতা:** সংসদের অধিবেশনে সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না; সেই সুযোগটা করে দেয় এই কমিটিগুলো। মন্ত্রী ও আমলাদের কমিটিতে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে তাদের ব্যাখ্যা করতে হয় নিজেদের সিদ্ধান্তের, জবাব দিতে হয় সব সমালোচনার, তুলে ধরতে হয় প্রমাণ।

#### স্বচ্ছতা বাড়ানো

- কমিটিগুলো সরকারি কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করে। এমন একটি ফোরাম তৈরি করে, যেখানে সংসদীয় ফ্লোরের অত্যন্ত দলীয় ও সময়-সীমাবদ্ধ পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠে নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে চলে বিতর্ক এবং যাচাই-বাছাই করা যায়।
- মাঝে মাঝে কমিটির বৈঠক ব্যক্তিগত হলেও, তাদের প্রতিবেদন ও ফলাফল প্রায়ই জনসমক্ষে চলে আসে। এতে সরকারের স্বচ্ছতা বাড়ে বহুগুণ।

#### আর্থিক তত্ত্বাবধান

- **জনগণের ব্যয়ের যাচাই-বাছাই:** পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি) বা অনুমিত হিসাব কমিটির মতো আর্থিক কমিটিগুলোর দায়িত্ব ব্যাপক। করদাতাদের অর্থ দক্ষতার সঙ্গে, কার্যকরভাবে ও অনুমোদিত বাজেট অনুসারে খরচ হচ্ছে কি না, সেটা নিশ্চিত করে তারা। তারা নিরীক্ষা প্রতিবেদন (প্রায়শই অডিটর জেনারেলের কাছ থেকে) পর্যালোচনা এবং অপচয়, দুর্নীতি বা অব্যবস্থাপনার ঘটনা তদন্ত করে।
- **অর্থের অপব্যবহার রোধ:** খরচের ওপর এই সার্বক্ষণিক নজরদারির ফলে আর্থিক অনিয়ম কমে আসে। সরকারি বিভাগগুলোতে উন্নত হয় সামগ্রিক আর্থিক শৃঙ্খলা।

**আইনের শাসন ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষা**

- সরকারি নীতি ও কাজকর্ম আইন ও সংবিধান মেনে চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখে এই কমিটিগুলো। নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা বা অসাংবিধানিক কার্যকলাপের তদন্ত করার ক্ষমতাও আছে তাদের।
- নাগরিকদের সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগ বা উদ্বেগ প্রকাশ করার এবং এই বিষয়গুলো একটি সংসদীয় সংস্থা দিয়ে তদন্ত করার একটি প্রক্রিয়া দেয় তারা।

**নীতি ও আইন প্রণয়নের গভীর পরীক্ষা**

- সংসদের সাধারণ বিতর্কের মতো নয় বিষয়টি। কমিটিগুলো সময় নিয়ে জটিল নীতি ও প্রস্তাবিত আইন নিয়ে গভীর আলোচনা করতে পারে। বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ ও সাধারণ মানুষের মতামতও শোনে তারা।
- এই বিস্তারিত যাচাই-বাছাই আইন ও নীতির গুণগত মান উন্নত করতে সহায়তা করে, নিশ্চিত করে যে সেগুলো সুচিন্তিত, ব্যবহারিক ও জন-প্রয়োজনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল।
- সংসদীয় দক্ষতার বিকাশ
- কমিটির সদস্যরা নির্দিষ্ট নীতিগত ক্ষেত্রে (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ) বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। এই দক্ষতা তাঁদের আরও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করতে, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে এবং আরও ভালো সুপারিশ করতে সহায়তা করে।
- এতে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরাও দলীয় পরিচয়ের বাইরে বেরিয়ে নজরদারির ভূমিকায় আরও কার্যকর হয়ে ওঠেন।

**চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স**

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার (নির্বাহী বিভাগ) গঠিত হয় সংসদ (আইনসভা) থেকেই। স্থায়ী কমিটিগুলো আইনসভাকে তার তত্ত্বাবধানমূলক কার্যভার প্রয়োগ করতে এবং চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ব্যবস্থা বজায় রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রদান করে, যা নির্বাহীকে খুব বেশি শক্তিশালী বা জবাবদিহিবিহীন হওয়া থেকে বিরত রাখে।

## সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কেন প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ

উদ্দেশ্য মহৎ, ক্ষমতাও কম নয়; তবু কাঠামোগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটিগুলো প্রায়ই তাদের সম্ভাবনা পূরণে ব্যর্থ হয়:

**১. নির্বাহী শাখার আধিপত্য ও দুর্বল সংসদ**

সর্বময় ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী: বাংলাদেশের ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাহী শাখার হাতে সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই নির্বাহী আধিপত্য প্রায়ই একটি 'রাবার স্ট্যাম্প' সংসদে পরিণত হয়, যেখানে সরকারি বিল ও নীতিগুলো ন্যূনতম প্রকৃত যাচাই-বাছাই ছাড়াই পাস হয়।

স্বাধীনতার অভাব: অনেক কমিটির সদস্য, এমনকি চেয়ারপারসনরাও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে প্রায়ই সরকার বা তাঁদের নিজস্ব দলের নেতৃত্বকে সত্যিকার অর্থে চ্যালেঞ্জ করতে আগ্রহী হন না। কমিটি নিয়োগ ও অ্যাজেন্ডার ওপর শাসক দলের নিয়ন্ত্রণ তাদের স্বায়ত্তশাসনকে আরও সীমিত করে।

**২. আন্তঃদলীয় গণতন্ত্রের অভাব:** দলের ভেতরে গণতন্ত্রের অভাব রয়েছে। হাই কমান্ড থেকে যে অবস্থান ঠিক করে দেওয়া হয়, তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ খুব কম। ফলে কমিটির ভেতরে ভিন্নমত বা সমালোচনার তেমন কোনো সুযোগই তৈরি হয় না।

**৩. বিরোধীদের বর্জন ও অনুপস্থিতি:** বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুরোনো সমস্যা হলো বিরোধী দলের সংসদীয় অধিবেশন বর্জন করার প্রবণতা। তারা অধিবেশন বর্জন করে, কমিটির বৈঠকেও গরহাজির থাকে। বিরোধী দল না থাকলে কমিটিগুলো তাদের তদারকি কার্যাবলির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; ভিন্নমত ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি; হারায়। এতে কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রতিবেদনের বৈধতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

**৪. স্বচ্ছতার অভাব:** কমিটির বৈঠকগুলো সাধারণত রুদ্ধদ্বার হয়। জনগণ ও সংবাদমাধ্যমেরও সেখানে প্রবেশ নিষেধ। স্বচ্ছতার এই অভাবে কমিটিগুলোর ওপর কোনো জনমতের চাপ তৈরি হয় না। কমিটিও জনগণের কাছে জবাবদিহি করার তেমন প্রয়োজন করে না। বৈঠকের প্রতিবেদন বেশির ভাগ সময় প্রকাশ পেলেও তা নিয়ে জনগণ বা সংবাদমাধ্যমের মধ্যে তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না।

**৫. অপর্যাপ্ত সম্পদ ও সমর্থন:** পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনার জন্য কমিটিগুলোর প্রায়ই পর্যাপ্ত গবেষণা সমর্থন, বিশেষজ্ঞ কর্মী ও আর্থিক সংস্থান থাকে না। এতে তাদের জটিল নীতিগত বিষয় বা আর্থিক অনিয়মের গভীর বিশ্লেষণের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।

**৬. স্বার্থের সংঘাত:** স্বার্থের সংঘাত এখানে একটি বড় সমস্যা। প্রায়ই অভিযোগ ওঠে, কমিটির সদস্যরা নিজেদের ব্যবসা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে এমন জায়গায় তদারকির দায়িত্ব বাগিয়ে নেন। যেমন একজন ব্যবসায়ী বসতে পারেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে। এটি প্রতিরোধের নিয়ম থাকলেও তার প্রয়োগ কম হতে পারে।

**৭. অনিয়মিত বৈঠক ও কম উপস্থিতি:** প্রতিবেদনগুলো প্রায়ই ইঙ্গিত দেয় যে অনেক স্থায়ী কমিটি নিয়মিত বৈঠক করে না বা সদস্যদের উপস্থিতি কম থাকে। এই বিক্ষিপ্ত কার্যকারিতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর টেকসই তদারকি এবং ফলোআপকে বাধাগ্রস্ত করে।

**৮. সুপারিশের দুর্বল প্রয়োগ:** কমিটিগুলো যদি সমালোচনামূলক প্রতিবেদন তৈরি বা সুপারিশ করেও, তখনো নির্বাহী শাখা যে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে, তা নিশ্চিত করার জন্য কোনো শক্তিশালী প্রক্রিয়া নেই। সরকার প্রায়ই কোনো উল্লেখযোগ্য পরিণতি ছাড়াই সেগুলো উপেক্ষা করে।

শেষ কথা হলো, বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর তদারকির জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা নিয়ে গঠিত হলেও অতি মাত্রায় রাজনৈতিক পরিবেশ, শক্তিশালী নির্বাহী আধিপত্য, প্রকৃত আন্তঃদলীয় গণতন্ত্রের অভাব এবং অপর্যাপ্ত স্বচ্ছতা ও সম্পদের কারণে এর কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এই কমিটিগুলোকে সত্যিকার অর্থে ওয়াচডগ হিসেবে দেখতে চাইলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। জবাবদিহি ও সংসদীয় স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

## স্পিকার

একটি কার্যকরী সংসদের জন্য স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংসদের প্রধান সভাপতি কর্মকর্তা এবং এর কার্যপ্রণালি ও মর্যাদার অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন। একজন শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও কার্যকর স্পিকার ছাড়া সংসদ বিশৃঙ্খলা, দলীয়করণ ও অদক্ষতার দিকে ধাবিত হতে পারে। এতে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার এবং সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এককথায়, স্পিকার হলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তাঁর নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তার ওপরই নির্ভর করে একটি দেশের আইনসভা কতটা কার্যকর হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার সত্যিকারের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভূমিকা পালনে প্রায়ই সংগ্রাম করেন। এই ব্যর্থতা রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সাংবিধানিক বিধান এবং ব্যবহারিক বাস্তবতার একটি জটিল মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত।

### স্পিকার কেন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন

বাংলাদেশের স্পিকার কেন প্রায়ই প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন, তার প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো।

**১. দলীয় সংশ্লিষ্টতা ও পুনর্নির্বাচনের উদ্বেগ**

- **দল থেকে পদত্যাগ না করা:** যুক্তরাজ্যের মতো কিছু পরিপক্ব ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রে স্পিকার নির্বাচিত হবার পর নিজের দল থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্পিকার নিজ রাজনৈতিক দলের সদস্যই থেকে যান।
- **নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব:** স্পিকার তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যান, যার অর্থ তাকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকতে হয়, ভোটারদের অভিযোগ শুনতে হয় এবং তাঁর এলাকার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়।
- **ভবিষ্যৎ মনোনয়ন:** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্পিকার হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী নির্বাচনে সংসদ সদস্য হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে আবারও দলের মনোনয়ন ও জনগণের সমর্থন চাইতে হয়। ভবিষ্যতে রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য দলের ওপর এই প্রত্যক্ষ নির্ভরশীলতা তাকে প্রকৃত নিরপেক্ষ হতে বা তেমন দেখাতে অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন করে তোলে। রাজনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং নিজ দলের নেতৃত্বকে অসন্তুষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে তিনি 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' থাকেন।

**২. নির্বাহী শাখার আধিপত্য এবং দলীয় নিয়ন্ত্রণ**

- **শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী:** বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা মূলত প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক। নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা এখানে আইনের চেয়ে বেশি। সংসদ এখানে স্বাধীনভাবে সরকারি নীতি যাচাই-বাছাই করার চেয়ে তা অনুমোদন করার যন্ত্র হিসেবেই বেশি কাজ করে।
- **৭০ অনুচ্ছেদ:** বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের তাঁদের দলের নির্দেশনার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখে। এই অনুচ্ছেদ ভোটদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বাস্তবে সংসদ সদস্যরা আসন হারানোর ভয়ে নিজ নিজ দলের নীতির সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ থেকেও বিরত থাকেন। এই শক্তিশালী দলীয় শৃঙ্খলা স্পিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; তিনি

আবার ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য হয়ে থাকেন। এর ফলে স্পিকারের পক্ষে জোরালো বিতর্কের অনুমতি দেওয়া বা শাসক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, এমনটা করলে তাঁর নিজের বা তাঁর দলের অবস্থান ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

- **নিয়োগ ও অ্যাজেন্ডা নিয়ন্ত্রণ:** স্পিকারের নিয়োগ ও সংসদীয় অ্যাজেন্ডা নির্ধারণের ওপর শাসক দলের নিয়ন্ত্রণ স্পিকারের স্বায়ত্তশাসনকে আরও সীমিত করে।

**৩. সংসদীয় স্বায়ত্তশাসনের অভাব:** প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদের নিজেরই আর্থিক বিষয় ও ব্যয়ের ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। এর ফলে প্রায়ই অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংসদের টানাপোড়েন দেখা দেয়। আইনসভার এই সাধারণ দুর্বলতা স্পিকারের সীমাবদ্ধ ভূমিকায় অবদান রাখে। স্পিকার যেসব সংসদীয় কমিটির সভাপতিত্ব বা প্রভাবিত করেন, সেগুলোও দুর্বল। এসব কমিটির সুপারিশ প্রায়ই নির্বাহী শাখার জন্য বাধ্যতামূলক হয় না।

**৪. বিরোধী দলের বর্জন এবং অনুপস্থিতি:** বিরোধী দলগুলোর ঘন ঘন সংসদ বর্জন করার প্রবণতা স্পিকারকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। এতে সংসদ হয়ে পড়ে একতরফা আলোচনার মঞ্চ। স্পিকার শতভাগ নিরপেক্ষ থাকলেও বিরোধী দল না থাকলে সংসদের গতিশীল মিথস্ক্রিয়া সীমিত হয়ে পড়ে।

**৫. স্বচ্ছতার অভাব:** অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় প্রক্রিয়া, যার মধ্যে বেশির ভাগ কমিটির বৈঠকও রয়েছে, গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ বা সংবাদমাধ্যমের নজরদারি না থাকায় স্পিকারের ওপর নিরপেক্ষ ও কার্যকর থাকার চাপও কমে যায়।

**৬. সাংস্কৃতিক এবং আচরণগত নিয়ম:** বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা বা অ-দলীয় পদ্ধতির চেয়ে দল ও নেতার প্রতি আনুগত্যের ওপর জোর দেয়। এই মনোভাব স্পিকারের কার্যালয়সহ রাজনীতির সর্বস্তরে প্রবেশ করে। ক্ষমতায় যে দলই থাকুক, স্পিকারের নিরপেক্ষতাকে সমীহ করার মতো 'ভদ্রলোকের চুক্তি' এখানে গড়ে ওঠেনি।

এককথায়, স্পিকারের পদটি কাগজে-কলমে নিরপেক্ষ হলেও রাজনৈতিক বাস্তবতা একে সক্রিয়ভাবে দুর্বল করে। দলীয় সদস্যপদ, পুনর্নির্বাচনের জন্য দলের মনোনয়নের ওপর নির্ভরতা আর নির্বাহী শাখা ও দলের হুইপের আধিপত্য; এই সবকিছু মিলিয়ে স্পিকারের জন্য সত্যিকারের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নেওয়া রাজনৈতিকভাবে অবাস্তব বা অসম্ভব।

## সংসদ নেতা

সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী, সংসদ নেতা মানে প্রধানমন্ত্রী অথবা তাঁর মনোনীত কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য। তবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই দায়িত্ব পালন করেন। ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের সরকারে তিনিই সংসদের মূল নিয়ন্ত্রক। সংসদকে কার্যকর রাখার মূল চাবিকাঠি আসলে তারই হাতে থাকে।

### কার্যকরী সংসদের জন্য সংসদ নেতার ভূমিকা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

**১. সরকারি কার্যক্রম ও আইন প্রণয়নমূলক অ্যাজেন্ডা পরিচালনা**

- **সময়সূচি নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার:** সংসদ নেতার মূল দায়িত্ব হলো আইনসভার সরকারি কার্যক্রম আয়োজন ও সময়সূচি নির্ধারণ করা। এর মধ্যে রয়েছে বিল, প্রস্তাব ও বিতর্কগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ, যাতে সরকারের আইন প্রণয়নমূলক কর্মসূচি কার্যকরভাবে এগিয়ে যায়।
- **হুইপদের সঙ্গে যোগাযোগ:** তিনি হুইপদের সঙ্গে বসে নিশ্চিত করেন, ভোটাভুটির সময় যেন পর্যাপ্ত সরকারি সদস্য হাজির থেকে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।
- **পূর্বাভাসযোগ্যতা:** তিনি আগে থেকে কার্যক্রম ঘোষণা করেন বলে অন্য সদস্যরাও বিতর্ক, কমিটির কাজ ও নির্বাচনী এলাকার বিষয়গুলোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পান।

**২. আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগ**

- **বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ:** একজন ভালো সংসদ নেতা বিরোধী দলের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা ও বিলম্ব এড়িয়ে সংসদকে মসৃণভাবে চালাতে এই আলোচনাটা জরুরি। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করতেও এই সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।
- **বিতর্ক নিশ্চিত করা:** সরকারের অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি বিরোধীদের কথা বলার, প্রশ্ন তোলার এবং চ্যালেঞ্জ করার সুযোগও তিনি করে দেন।

**৩. স্পিকারকে পরামর্শ প্রদান:** সংসদ নেতা স্পিকারকে বিভিন্ন কার্যপ্রণালিগত বিষয়ে পরামর্শ দেন, বিশেষ করে সরকারি কার্যক্রম ও বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রমের জন্য সময় বরাদ্দের বিষয়ে (যেমন রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, বিশেষ বিতর্ক)। এই সমন্বয় স্পিকারকে হাউস কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

**৪. সংসদে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা:** সংসদ নেতা প্রায়শই কার্যপ্রণালিগত বিষয়ে সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। নির্দিষ্ট সংসদীয় দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও কাজ করতে পারেন (যদিও বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীই সাধারণত সংসদ নেতার পদটি ধারণ করেন)। সংসদ নেতা সংসদীয় কার্যক্রমের সরকারের ব্যবস্থাপনা এবং এর আইন প্রণয়নমূলক অগ্রাধিকারগুলো রক্ষা করেন।

**৫. সংসদীয় মান বজায় রাখা:** জন্মগতভাবে দলীয় ভূমিকা (কারণ, তারা ক্ষমতাসীন সরকারের অংশ) হলেও একজন কার্যকর সংসদ নেতার সংসদীয় ঐতিহ্য, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মর্যাদা বজায় রাখারও দায়িত্ব থাকে। তাকে সংসদীয় কার্যপ্রণালি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে দেখা হয়।

মোদ্দাকথা, সংসদ নেতা হলেন ক্ষমতাসীন দলের জন্য আইন প্রণয়নমূলক কাজের স্থপতি ও প্রকৌশলী। নিজ দলের মধ্যে কৌশল তৈরি, আলোচনা ও শৃঙ্খলা প্রয়োগের পাশাপাশি বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার তাঁর ক্ষমতা সংসদের দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও উৎপাদনশীলতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

### সংসদ নেতার ভূমিকা দুর্বল কেন

বাংলাদেশে সংসদ নেতার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নটা বেশ পুরোনো। নকশাটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর কার্যকারিতা প্রায়ই হোঁচট খায় নানা সীমাবদ্ধতা আর চ্যালেঞ্জের দেয়ালে। ফলে একটি সত্যিকার কার্যকরী সংসদ গঠন বাধাগ্রস্ত হয়।

**১. প্রধানমন্ত্রীর দ্বৈত ভূমিকা (সংসদ নেতা = প্রধানমন্ত্রী):** বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীই সাধারণত সংসদ নেতার পদ ধারণ করেন। এতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সরকারি অ্যাজেন্ডা মসৃণভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয় বটে, কিন্তু সংসদীয় বিতর্ক ও যাচাই-বাছাইয়ের বদলে নির্বাহী নিয়ন্ত্রণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

সরকার ও নিজ দলের প্রধান হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর মনোযোগ থাকে মূলত সংসদের বাইরের নীতি বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক কৌশল সামলানোতে। ফলে সংসদের ভেতরের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি বিষয় এবং আন্তঃদলীয় ঐকমত্য গঠনের দিকে সরাসরি মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত মেলে কম। অথচ ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেমের অন্য অনেক দেশে একজন আলাদা সংসদ নেতা থাকেন, যার মূল কাজই হলো এটা।

**২. নির্বাহী আধিপত্য এবং দুর্বল সংসদ:** স্পিকারের ক্ষমতার আলোচনাতেই কথাটা এসেছে; বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ব্যাপক; নির্বাহী বিভাগ প্রায় সব সময় আইনসভাকে প্রভাবিত করে। প্রধানমন্ত্রীই সংসদ নেতা হওয়ায় এই প্রভাব আরও জোরালো হয়। সংসদের পক্ষে তখন সরকারকে কার্যকরভাবে যাচাই করা বা স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিলগুলো কদাচিৎ প্রত্যাখ্যান বা বড় কোনো সংশোধনীর আওতায় আসে। আইন প্রণয়নের যাচাই-বাছাইয়ের কাজটা তাই একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়।

**৩. ৭০ অনুচ্ছেদ ও আন্তঃদলীয় গণতন্ত্রের অভাব:** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ কার্যকরভাবে সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখে। এতে তাঁদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। সংসদ নেতা তাঁর অবস্থানের গুণে এই দলীয় শৃঙ্খলার চূড়ান্ত প্রয়োগকারী। এই চরম দলীয় নিয়ন্ত্রণ মানে হলো সংসদের অভ্যন্তরে বিতর্কগুলোতে; যার মধ্যে সংসদ নেতা দ্বারা পরিচালিত বিতর্কও রয়েছে; প্রায়শই প্রকৃত সারবত্তা বা সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের অভাব থাকে। কারণ, সংসদ সদস্যরা ভিন্নমত প্রকাশ করতে সত্যিই স্বাধীন নন। তাই সংসদ নেতার কাজও আর জোরালো আইন প্রণয়নমূলক আলোচনার পথ সহজ করা থাকে না, বরং দলের নির্দেশ পালন নিশ্চিত করাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

**৪. সংঘাতের রাজনীতি ও বিরোধী দলের বর্জন:** বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত আর অবিশ্বাসের ছায়া দীর্ঘদিনের। প্রায়ই দেখা যায়, বিরোধী দল সংসদ বর্জন করছে। বিরোধী দল না থাকলে সংসদ নেতার কাছে ঐকমত্যভিত্তিক অ্যাজেন্ডার জন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করার মতো কেউ থাকে না। সংসদীয় কার্যক্রম একতরফা হয়ে পড়ে। এতে সব দলের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি বা সবার জন্য ন্যায্য বিতর্ক নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব সংসদ নেতার পালন করার কথা, তার প্রয়োজনও কমে যায়। সংসদীয় সহযোগিতার মূল চেতনাই এতে দুর্বল হয়ে যায়।

**৫. সংসদীয় প্রথা ও শক্তিশালী ঐতিহ্যের অভাব:** পুরোনো ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের দেশগুলোতে শত শত বছর ধরে সংসদীয় সহযোগিতার একটা শক্ত ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়সও কম, আর চলার পথও বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার কোনো শক্তিশালী, অভ্যন্তরীণ ঐতিহ্য নেই, যা কিনা সংসদ নেতার হাত ধরেই গড়ে ওঠার কথা ছিল।

**৬. সংসদীয় কার্যকারিতার চেয়ে নির্বাচনী বিজয়ের ওপর মনোযোগ:** এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রাণবন্ত ও কার্যকর সংসদ গড়ে তোলার চেয়ে নির্বাচনে জেতা আর ক্ষমতা ধরে রাখাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে দলগুলো এমন সব কৌশল নেয়, যাতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ে; কিন্তু দিন শেষে সংসদ দুর্বল হয়ে পড়ে। সংসদ নেতার পদক্ষেপগুলোও তাই সংসদের কার্যকারিতা বাড়ানোর বদলে দলের সাফল্য নিশ্চিত করার কাজেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

এককথায় বললে, কাগজে-কলমে সংসদ নেতার ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, বাংলাদেশের বাস্তবতায় ছবিটা ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই যখন সংসদ নেতা, সঙ্গে আছে নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য, ৭০ অনুচ্ছেদের মতো কড়া নিয়ম আর সংঘাতের রাজনীতি; তখন সব মিলিয়ে এই পদের প্রকৃত ক্ষমতা অনেকটাই খর্ব হয়ে গেছে। এটি এখন সরকারের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার রয়ে গেছে; সংসদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি।

## বিরোধীদলীয় নেতা

সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী, বিরোধীদলীয় নেতা বলতে সেই সংসদ সদস্যকে বোঝায়, যিনি স্পিকারের মতে, হাউসে বিরোধী দলের বা বিরোধী গ্রুপ, যার সংখ্যাগত শক্তি হাউসে সবচেয়ে বেশি, তার নেতা।

সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা একটি সুস্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। তিনি সংসদের বৃহত্তম অ-সরকারি দলের নেতৃত্ব দেন। সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতে, বিকল্প কণ্ঠস্বর প্রদানে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখতে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ

**১. সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনা**

- **যাচাই-বাছাই ও চ্যালেঞ্জ:** বিরোধীদলীয় নেতার প্রধান কাজ হলো সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করা। তিনি মন্ত্রীদের প্রশ্ন করা, আইন নিয়ে বিতর্ক করা এবং যেকোনো ত্রুটি বা ব্যর্থতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। ক্ষমতার অপব্যবহার ঠেকাতে এই ধারাবাহিক চাপ অত্যাবশ্যক। এতে সরকারও জনগণের স্বার্থের ব্যাপারে সতর্ক থাকে।
- **বিকল্প কণ্ঠ:** বিরোধীদলীয় নেতা সরকারের অ্যাজেন্ডার একটি সমালোচনামূলক পাল্টা আখ্যান দিয়ে থাকেন। এতে আইন তৈরির সময় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও শোনা ও বিবেচনাও নিশ্চিত হয়।

**২. 'সরকার-প্রতীক্ষমাণ' ভূমিকা পালন**

- **ছায়া মন্ত্রিসভা:** অনেক ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতিতে, বিরোধীদলীয় নেতা একটি 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠন করেন। সেখানে নির্দিষ্ট বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের সরকারি মন্ত্রীদের ছায়া হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এটি তাঁদের নির্দিষ্ট পোর্টফোলিওতে দক্ষতা বিকাশে এবং শাসন করার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি প্রদর্শনে সহায়তা করে।
- **নীতি প্রণয়ন:** তিনি বিকল্প নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন। ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন ভবিষ্যতের জন্য একটি ভিন্ন পথের দিশা।

**৩. ভিন্নমত ও সংখ্যালঘুদের মতামত উপস্থাপন:** বিরোধীদলীয় নেতা নিশ্চিত করেন, যাঁরা ক্ষমতাসীন দলকে ভোট দেননি, তাঁদের কথাও যেন সংসদে শোনা যায়। তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর উদ্বেগ তুলে ধরেন, আর 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার'-এর প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেন। সরকারের কাজে জনগণের অসন্তোষ প্রকাশের একটি বৈধ পথও তৈরি করে দেন এর মাধ্যমে। এতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেই জনগণের ক্ষোভ প্রশমনের সুযোগ পাওয়া যায়।

**৪. গঠনমূলক বিতর্ক ও আইন প্রণয়ন সহজ করা:** সরকারের প্রতিপক্ষ হলেও দেশের একজন কার্যকর বিরোধীদলীয় নেতা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনায় জড়িত হতে পারেন। এতে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সর্বদলীয় বোঝাপড়া তৈরি হয়, কিংবা অন্তত আলোচনার মাধ্যমে আইনগুলো আরও উন্নত করার সুযোগ মেলে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, এমন বিষয় নিয়ে বিতর্কের প্রস্তাব করে সংসদীয় অ্যাজেন্ডা গঠনে ভূমিকা পালন করেন।

**৫. গণতন্ত্র ও জনগণের আস্থা জোরদার করা:** একটি শক্তিশালী ও কার্যকর বিরোধী দল থাকা মানেই হলো একটি সুস্থ গণতন্ত্র থাকা। এখানে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয় এবং বিকল্প ধারণাগুলোকে স্বাগত জানানো হয়। এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করে। সরকারকে দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে বিরোধীদলীয় নেতা এই ধারণাকে জোরদার করেন যে সমস্ত ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের কাছে জবাবদিহি করে।

### বাংলাদেশে বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকা দুর্বল কেন

তাত্ত্বিকভাবে এত সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা বলা থাকলেও বাংলাদেশে বিরোধীদলীয় নেতা প্রায়ই কার্যকরভাবে কাজ করতে হিমশিম খান। এর পেছনের মূল কারণ হলো এখানকার সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, কিছু কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বল সংসদীয় নিয়মকানুন।

**১. সংসদীয় অংশগ্রহণের অভাব ও আস্থার সংকট**

- বর্জন: বাংলাদেশের রাজনীতির একটি দীর্ঘদিনের বৈশিষ্ট্য হলো বিরোধী দলের সংসদীয় অধিবেশন বর্জন করার প্রবণতা, বিশেষ করে উচ্চ রাজনৈতিক উত্তেজনা বা বিতর্কিত নির্বাচনের পর। এতে সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে সরকারকে যাচাই-বাছাই করার বিরোধীদলীয় নেতার ক্ষমতা মৌলিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **আস্থার অভাব:** ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আস্থার গভীর অভাব রয়েছে। এর ফলে গঠনমূলক আলোচনা ও সহযোগিতা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে; যা বিরোধীদলীয় নেতার সংসদীয় সময় নিয়ে কার্যকরভাবে আলোচনা করা বা আইনকে প্রভাবিত করার জন্য অপরিহার্য।

**২. সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা**

- **নির্বাহী শাখার আধিপত্য:** আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বাংলাদেশের শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী-শাসিত ব্যবস্থায় আইনসভার ওপর নির্বাহী শাখা প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে বিরোধীদলীয় নেতার পক্ষে সরকারি সিদ্ধান্তগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ করা বা বিকল্প আইন প্রবর্তন করাকে চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।
- **'রাবার স্ট্যাম্প' সংসদ:** ক্ষমতাসীন দলের যখন অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে এবং দলীয় শৃঙ্খলার (যেমন ৭০ অনুচ্ছেদ) মাধ্যমে ভিন্নমত দমন করা হয়, তখন সংসদ প্রায়শই সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য একটি 'রাবার স্ট্যাম্পে' পরিণত হয়; যা বিরোধী দলের প্রভাব বিস্তারের জন্য খুব কম সুযোগ রাখে।
- **দুর্বল স্থায়ী কমিটি:** সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সীমিত কার্যকারিতা বিরোধী দলের গভীর যাচাই-বাছাই পরিচালনা এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে জবাবদিহি করার পথগুলোকে আরও সংকুচিত করে।

**৩. সংসদ-বহির্ভূত রাজনীতি:** সংসদের ভেতরে কথা বলে লাভ হয় না দেখে বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো প্রায়ই রাজপথে নেমে আসে। সরকারের ওপর চাপ দিতে হরতাল, বিক্ষোভ ও মিছিলের মতো সংসদ-বহির্ভূত কৌশলের আশ্রয় নেয় তারা। প্রতিবাদের এই ভাষা হয়তো বৈধ, কিন্তু এর ওপর বেশি নির্ভর করলে জোরালো সংসদীয় রাজনীতি থেকে মনোযোগ কমে যায়। এতে বিরোধীদলীয় নেতার সংসদীয় ভূমিকা আরও কমে যায়।

**৪. বৈধতার প্রশ্ন:** ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠা বা প্রধান দলগুলোর বর্জন করা নির্বাচনের পর পুরো সংসদের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। এর প্রভাব পড়ে বিরোধীদলীয় নেতার বৈধতা ও কার্যকারিতার ওপর, যদি তাঁর দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বা নির্বাচনী ফলাফলকে স্বীকৃতি না দেয়। সাধারণভাবে স্বীকৃত প্রধান বিরোধী দল যদি কোনো আসনই না পায়, তখন বিরোধীদলীয় নেতার পদ চলে যেতে পারে কোনো ছোট, কম প্রতিনিধিত্বমূলক দলের কাছে। এতে এই পদের গুরুত্ব আরও কমে যায়।

**৫. সম্পদ ও সহায়তার অভাব:** সরকারের কাছে থাকে ব্যাপক সম্পদ ও লোকবল। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা আর তাঁর দলের কাছে গবেষণা, প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা– কোনোটাই যথেষ্ট থাকে না। ফলে সরকারের নীতির বিপরীতে শক্তিশালী বিকল্প তৈরি করা কিংবা কোনো বিষয়ে গভীর তদন্ত চালানো তাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়ে।

সুতরাং, একটি গণতান্ত্রিক সংসদের জন্য বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকা তাত্ত্বিকভাবে অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন। এখানকার সংঘাতের রাজনীতি, নির্বাহী শাখার আধিপত্য ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এই পদে আসীন ব্যক্তিকে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। যার চূড়ান্ত ফল দাঁড়ায় একটি কম প্রাণবন্ত এবং কম জবাবদিহিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র।

## সংসদে ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা কী

সাধারণ নির্বাচনে যে দল বা জোট সংসদে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়ে সরকার গড়ে, তারাই ক্ষমতাসীন দল। সংসদে এদের ভূমিকা বিশাল এবং বহুমুখী।

১. **আইন প্রণয়ন** (Legislation): ক্ষমতাসীন দলের প্রধান ভূমিকা হলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং সরকারের নীতি অনুসারে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধন করা। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সাধারণত বিল পাস করানো সহজ হয়।

২. **সরকার পরিচালনা** (Governance): সংসদে ক্ষমতাসীন দলই সরকার গঠন করে এবং দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীরা এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা তাদের নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে।

৩. **নীতি বাস্তবায়ন** (Policy Implementation): সরকার সংসদে পাস হওয়া আইন ও ঘোষিত নীতিগুলো বাস্তবায়ন করে। ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে সরকারের নীতি ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন।

৪. **বাজেট অনুমোদন** (Budget Approval): ক্ষমতাসীন দল সরকারের বাজেট সংসদে উপস্থাপন করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তা অনুমোদন করায়। এর মাধ্যমে তারা দেশের অর্থনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করে।

৫. **সরকারের পক্ষে সমর্থন** (Support for Government): ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা সাধারণত সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে সমর্থন দেন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটি ও বিতর্কে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।

৬. **সংসদীয় কমিটির নেতৃত্ব:** ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান এবং অনেক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজ, বিলের খুঁটিনাটি ও সরকারি ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

৭. **জনগণের প্রতিনিধিত্ব:** ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণেরও প্রতিনিধি। এলাকার সমস্যাগুলো তাঁরা সংসদে তুলে ধরেন এবং সরকারের কাছে সমাধান দাবি করেন।

এককথায় বললে, ক্ষমতাসীন দলের কাজ হলো দক্ষতার সঙ্গে আইন প্রণয়ন ও সরকার পরিচালনা করা এবং দেশের উন্নয়নমূলক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করা।

### বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা কেন নিজেদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন

কাগজে-কলমে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের কাঁধে অনেক দায়িত্ব। সংসদকে কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা তাঁদের। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রায়ই তা ঘটে না। এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ।

**১. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ও কঠোর দলীয় শৃঙ্খলা:** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, একজন সংসদ সদস্য তাঁর দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাঁর সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। এই অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সরকারের নীতির গঠনমূলক সমালোচনা বা ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে। এমনকি বিলের খুঁটিনাটি নিয়েও তাঁরা দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলতে বা ভোট দিতে ভয় পান। এর ফলে সংসদীয় বিতর্কের মান কমে যায়, আর ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা হয়ে থাকেন দলের সিদ্ধান্তের 'রাবার স্ট্যাম্প'।

**২. নির্বাহী শাখার অত্যধিক আধিপত্য:** বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাহী শাখার ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা বেশির ভাগ সময় সংসদকে ব্যবহার করেন কেবল নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের মাধ্যম হিসেবে। ফলে সরকারের ওপর নজরদারি করা বা কোনো সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটানোর সুযোগই পান না ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা।

**৩. আন্তঃদলীয় গণতন্ত্রের অভাব:** রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা দুর্বল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংসদ সদস্যরা কেবল সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। তাঁদের নিজেদের স্বাধীন মতামত বা উদ্যোগের সুযোগ খুব কম থাকে। সংসদ সদস্যরা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে নয়, বরং দলীয় নেতৃত্বের কাছেই বেশি জবাবদিহি করতে বাধ্য হন। কারণ, তাঁদের ভবিষ্যৎ মনোনয়ন দলীয় নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল।

**৪. দুর্বল সংসদীয় কমিটি:** সংসদীয় কমিটিগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অনেক কমিটির প্রধানও হন তাঁরা। কিন্তু এই কমিটিগুলোর প্রকৃত ক্ষমতা সীমিত। কমিটির সুপারিশগুলো সরকার মানতে বাধ্য নয়; প্রায়ই সেগুলো উপেক্ষা করতে পারে। ফলে কমিটির কাজেও আগ্রহ কমে যায় সংসদ সদস্যদের।

**৫. বিতর্কের অভাব ও বিরোধী দলের অনুপস্থিতি/দুর্বলতা:** সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি বা দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা। বিরোধী দল যখন সংসদ বর্জন করে বা কোনো গঠনমূলক বিতর্কে অংশ নেয় না, তখন ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় না। এর ফলে সংসদ হয়ে পড়ে প্রাণহীন; আর সরকারি দলের সদস্যদেরও নিজেদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ কমে যায়।

**৬. জ্ঞান ও গবেষণায় ঘাটতি:** অনেক সংসদ সদস্যের নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান বা গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা থাকে না। এর ফলে তাঁরা বিল বা নীতিগুলোর ওপর গভীর বিশ্লেষণাত্মক বিতর্কে অংশ নিতে পারেন না।

**৭. ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগঃ** কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। এতে জনগণের প্রতি তাঁদের জবাবদিহি যেমন কমে, তেমনি ক্ষুণ্ন হয় সংসদীয় কার্যকারিতাও।

এই কারণগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরা তাঁদের তাত্ত্বিক ভূমিকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁরা মূলত দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে সরকারি অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নিতে বাধ্য হন, যা সংসদকে কার্যকর তদারককারী সংস্থা হিসেবে দুর্বল করে তোলে।

### বিরোধী দলের ভূমিকার গুরুত্ব

গণতন্ত্রে সুষম ও জবাবদিহিমূলক সরকার নিশ্চিত করতে বিরোধী দল অপরিহার্য। তারা শাসক দলের বিরুদ্ধে ভারসাম্য হিসেবে কাজ করে, বিকল্প নীতি প্রদান করে এবং সরকারের কর্মকাণ্ড তদারক করে।

**বিরোধী দলের প্রধান ভূমিকা**

১. **জবাবদিহি ও তদারকি নিশ্চিতঃ** বিরোধী দল সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের তদারক করে, শাসক দলকে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।

২. **মাইনরিটি মতামত প্রতিনিধিত্ব করাঃ** তারা জনগণের বিভিন্ন মতামত ও উদ্বেগের প্রতিনিধিত্ব করে। বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি যেন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হয়, তা নিশ্চিত করে।

৩. **বিকল্প নীতি প্রদানঃ** বিরোধী দল বিভিন্ন নীতি প্রস্তাব করে ভোটারদের সামনে পছন্দের সুযোগ তুলে ধরে। আর সরকারকে স্বৈরাচারী হওয়া থেকে বিরত রাখে।

৪. **জনসাধারণকে বিতর্ক উৎসাহিত করাঃ** তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা উৎসাহিত করে, জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বাড়ায়। এতে গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততা শক্তিশালী হয়।

৫. **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করাঃ** শক্তিশালী বিরোধী দল ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রতিরোধ করে। তারাই নিশ্চিত করে যেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীল থাকে।

**বিরোধী দলগুলো যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ কেন**

বাংলাদেশে বিরোধী দল কেন তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ, সেটি এক জটিল প্রশ্ন। এর শিকড় লুকিয়ে আছে দেশের অনন্য রাজনৈতিক ইতিহাস ও দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতর। এর পেছনে কয়েকটি মূল কারণ রয়েছে।

**১. সংঘাতপূর্ণ ও 'জিরো-সাম' রাজনীতি**

- **পারস্পরিক স্বীকৃতির অভাবঃ** বাংলাদেশে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রায়ই এক পক্ষ অপরও পক্ষের বৈধতা স্বীকার করতে চায় না। এতে গভীর অনাস্থার পরিবেশ তৈরি হয় এবং দেশের কল্যাণে তারা একসঙ্গে কাজ করা থেকে বিরত থাকে।
- **'যে জিতবে, সে সব পাবে'** (Winner-Takes-All) **মানসিকতাঃ** এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রায়ই একটি 'জিরো-সাম' খেলা হিসেবে দেখা হয়; যেখানে একদলের লাভ মানেই অন্য দলের ক্ষতি। গঠনমূলক আলোচনা বা আপসের বদলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায়ই সরকারকে অস্থিতিশীল করতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও সংসদ-বহির্ভূত কৌশল অবলম্বন করে।
- **প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার অভাবঃ** সরকার ও বিরোধী দল খুব কমই সংসদীয় রাজনীতির 'শিল্প' শেখার সুযোগ পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার অভাব বাস্তব নীতি আলোচনার পরিবর্তে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের চক্রে অবদান রাখে।

**২. প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক বাধা**

- **কঠোর দলীয় শৃঙ্খলা (অনুচ্ছেদ ৭০)ঃ** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ অনুসারে, কোনো সংসদ সদস্য দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলেই তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের আসন হারাবেন। এটি কার্যত সংসদ সদস্যদের অবাধ ভোট প্রদান কিংবা তাঁদের দলের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত রাখে। এতে সংসদ পরিণত হয় ক্ষমতাসীন দলের অ্যাজেন্ডা পাস করানোর একটা 'রাবার স্ট্যাম্প'-এ।

- **'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' নির্বাচন ব্যবস্থা:** একক সদস্যের আসনবিশিষ্ট 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' ব্যবস্থা সাধারণত একটি দ্বিদল-প্রধান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করে। এতে ছোট দলগুলোর জন্য সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব অর্জন কঠিন হয়ে যায় এবং ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার ওপর নজরদারি কমে।
- **জবাবদিহির অভাব:** প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য তেমন শক্তিশালী ব্যবস্থা নেই। ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত আমলাতন্ত্রের কারণে সরকারের কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয়।

**৩. ক্ষমতাসীন দলের দমন-পীড়ন এবং প্রান্তিকীকরণ**

- **বিরোধী দলকে দমন:** ক্ষমতাসীন দলগুলো ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে বিরোধী দলকে দমন করেছে। গণগ্রেপ্তার, দলীয় কার্যালয়ে অভিযান এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক মামলা দিয়ে বিরোধী নেতা-কর্মীদের কোণঠাসা করা হয়েছে।
- **'একদলীয় রাষ্ট্র' তৈরি:** এমন ঘটনাও ঘটেছে, যেখানে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনকে প্রতিযোগিতামূলক দেখানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করেছে, আবার একই সঙ্গে বিরোধী দলকে কার্যকরভাবে প্রান্তিক করেছে। যেমন 'ডামি' প্রার্থী দাঁড় করানো বা দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা। এটি কখনো কখনো দেশকে কার্যত একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।
- **সংসদীয় প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া:** ক্ষমতাসীন দলগুলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য পরিচিত, যেখানে বিরোধী দল সংসদকে 'অকেজো' মনে করে এবং এর বাইরে কাজ করতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে। এতে সংসদ-বহির্ভূত আন্দোলন ও প্রতিবাদের ওপর মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

**৪. বিরোধী দলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা**

- **জনসমর্থন হারানো:** কিছু বিরোধী দল সুস্পষ্ট অ্যাজেন্ডার অভাব, পুরোনো ও নিষ্প্রভ নেতৃত্ব এবং অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের কারণে জনসমর্থন হারিয়েছে।
- **প্রাসঙ্গিক থাকতে না পারা:** বিরোধী দল কখনো কখনো প্রভাবশালী জন-আন্দোলনে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জনগণের কাছে কার্যকর বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগও হাতছাড়া করেছে।
- **বংশগত ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক রাজনীতি:** দলগুলোর মধ্যে বংশগত রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এবং গোষ্ঠীতান্ত্রিক নেটওয়ার্কের সংস্কৃতি রয়েছে। নেতারা যখন ব্যক্তিগত লাভ ও ক্ষমতাকেই বড় করে দেখেন, তখন বিরোধী দল একটি সুসংহত ও নীতিমান শক্তি হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

**নবীন গণতন্ত্রে দলত্যাগ ও ফ্লোর ক্রসিং আইন কেন প্রয়োজন**

১. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রতিরোধ:** নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলত্যাগ সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কথা ধরা যাক। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে, দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিলে বা দল ছেড়ে দিলেই সংসদ সদস্য পদ বাতিল। এর উদ্দেশ্য একটাই: খেয়ালখুশিমতো দলবদলের ঝুঁকি কমিয়ে সরকারকে টিকিয়ে রাখা।

২. **দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা:** এই আইন দলের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। এ ছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ববান করে তোলে, যাতে তাঁরা দলীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কাজ করেন।

৩. **দুর্নীতি হ্রাস:** দলবদল অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থে (যেমন টাকার বিনিময়ে) হয়। দলত্যাগ আইন এ রকম দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক শুদ্ধতা রক্ষা করে।

৪. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** এই আইন সরকারকে পূর্ণ মেয়াদ পূরণে সহায়তা করে, যা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জরুরি।

**দায়বদ্ধতা বনাম স্বাধীনতার ভারসাম্য**

দলত্যাগবিরোধী আইন যদিও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক, তবে তা সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের দলীয় লাইনের বাইরে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ কমায়, যা তাঁদের বিবেক অনুসারে কাজ করতে বাধা দেয়।

## সংসদীয় ও অসংসদীয় ভাষা

আইনসভার সদস্যদের বিতর্ক ও কার্যবিবরণীর সময় যে আনুষ্ঠানিক এবং সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করা উচিত, সেটাই সংসদীয় ভাষা। এটি মূলত শিষ্টাচার ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য তৈরি করা একগুচ্ছ নিয়ম ও প্রথা।

এর ঠিক উল্টো হলো অসংসদীয় ভাষা। এর মধ্যে আছে সেই সব শব্দ, বাক্যাংশ বা অভিব্যক্তি; যা আপত্তিকর, অপমানজনক বা অনুচিত বলে বিবেচিত। সরাসরি অপমান, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অসততার অভিযোগ থেকে শুরু করে সব ধরনের অসম্মানজনক কথাই এর আওতায় পড়ে।

### কেন অসংসদীয় ভাষা নিষিদ্ধ

আইনসভার বিতর্ক যেন ব্যক্তিগত আক্রমণের কাদা-ছোড়াছুড়িতে পরিণত না হয়, সে জন্যই অসংসদীয় ভাষার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা। এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ:

- **মর্যাদা বজায় রাখা:** এটি একটি সম্মানজনক ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করে, যেখানে সদস্যরা ব্যক্তিগত আক্রমণের আশ্রয় না নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারেন। এতে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা পায়।
- **বাক্‌স্বাধীনতার সুরক্ষা:** শুনতে স্ববিরোধী লাগলেও এই নিয়মগুলো প্রকৃতপক্ষে সদস্যদের অবাধে কথা বলার অধিকারকে রক্ষা করে। ব্যক্তিগত আক্রমণ নিষিদ্ধ হওয়ায় তৈরি হয় এক নিরাপদ পরিবেশ। একজন সদস্য তখন অপবাদ বা মৌখিক নির্যাতনের ভয় ছাড়াই সরকারের বা নীতির সমালোচনা করতে পারেন।
- **গঠনমূলক বিতর্কের প্রচার:** সংসদীয় বিতর্কের লক্ষ্য হলো দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সমাধান খুঁজে বের করা। বিতর্ক যখন ব্যক্তিগত আক্রমণে রূপ নেয়, তখন নীতি ও শাসন থেকে মনোযোগ সরে যায়। অসংসদীয় ভাষা নিষিদ্ধ করলে আলোচনা সঠিক পথে থাকে। এতে আরও ফলপ্রসূ এবং অর্থপূর্ণ বিতর্কের সুযোগ তৈরি হয়।
- **জনগণের আস্থা রক্ষা:** নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জনসাধারণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পেশাদারত্ব আশা করে। অবমাননাকর বা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায়।

কোনো সংসদ সদস্য যদি অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন, তখন স্পিকার বা চেয়ারম্যানের মতো প্রিসাইডিং অফিসার তাঁকে মন্তব্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ওই শব্দগুলো সংসদের কার্যবিবরণী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলার ব্যবস্থাও করতে পারেন তিনি। এই নির্দেশ অমান্য করলে আরও বড় শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

### বক্তব্যের সময় সংসদ সদস্যদের জন্য পালনীয় বিধি

**চেয়ারকে সম্বোধন করুন:** সমস্ত বক্তব্য হতে হবে স্পিকার বা সভাপতির উদ্দেশে। এটা সংসদীয় কার্যপ্রণালির একটি মৌলিক নিয়ম। সুসংগঠিত বিতর্ক ও সদস্যদের মধ্যে সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণ এড়ানোর এটাই সেরা উপায়।

**প্রাসঙ্গিকতা ও স্পষ্টতা:** একজন সংসদ সদস্যের বক্তব্য হতে হবে প্রাসঙ্গিক এবং স্পষ্ট। কোনো সদস্যের কথা যদি অপ্রাসঙ্গিক বা পুনরাবৃত্তিমূলক হয়, স্পিকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন। এমনকি তাঁর বক্তব্য থামিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিতে পারেন।

**সময়সীমা:** কার্যপ্রণালি বিধিতে বিল, প্রস্তাব বা জরুরি কোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রায়ই বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। স্পিকার প্রয়োজনমতো এই সময়সীমা ঠিক করে দেন বা বদলাতে পারেন।

**বক্তব্যের অনুমতি:** একজন সংসদ সদস্যকে কথা বলার আগে অবশ্যই স্পিকারের অনুমতি নিতে হবে। এতে নিশ্চিত হয় যে, একবারে একজনই কথা বলবেন এবং বিতর্ক শৃঙ্খলার মধ্যে চলবে।

**শোভনতা ও শৃঙ্খলা:** সদস্যদের অবশ্যই হাউসে শোভনতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এর মধ্যে যা যা বর্জনীয়:

- অসংসদীয় ভাষা: মানহানিকর, অশ্লীল বা অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। স্পিকার এই ধরনের শব্দ কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।
- অশৃঙ্খল আচরণ: লাগাতার অশৃঙ্খল আচরণের জন্য স্পিকার কোনো সদস্যকে হাউস থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন।
- ব্যক্তিগত মন্তব্য: অন্য কোনো সদস্যের চরিত্র বা উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কুৎসা রটানো যাবে না। বিতর্ক হবে কেবল বিষয় ও নীতির ওপর।

**হাউসের প্রতি শ্রদ্ধা:** সংসদ সদস্যদের অবশ্যই সংসদ নামক প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যপ্রণালির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। সংসদের কার্যবিবরণীর বৈধতা নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। সংসদে দেওয়া কোনো বক্তব্য বা ভোটের জন্য সংসদ সদস্যরা আইনি সুরক্ষা ভোগ করে।

**নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি:** বিধিমালায় বিভিন্ন ধরনের সংসদীয় কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালিও দেওয়া আছে। সংসদ সদস্যদের কথা বলার সময় তা অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

- প্রশ্ন: মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার শর্ত ও সম্পূরক প্রশ্নের পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত।
- প্রস্তাব ও রেজুলেশন: প্রস্তাব বা রেজুলেশন উত্থাপনের জন্য সদস্যদের নোটিশ দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।
- বিল: একটি বিল উত্থাপন, বিতর্ক এবং পাস করার প্রক্রিয়া কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। একজন বিল ইনচার্জ সদস্যের দায়িত্ব থাকে বিলটিকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

### সংসদের মর্যাদা বজায় রাখতে স্পিকারের ক্ষমতা

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে 'অসংসদীয় শব্দ' বলে কোনো সুনির্দিষ্ট, সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। তবে এ বিধি স্পিকারকে সংসদের মর্যাদা বজায় রাখার এবং অনুপযুক্ত ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে।

- নির্দিষ্ট কোনো তালিকা না থাকলেও 'অসংসদীয়' শব্দ ও অভিব্যক্তি সেগুলোকে ধরা হয়, যেগুলো:
    - মানহানিকর (Defamatory)
    - অশোভন (Indecent)
    - মর্যাদাহানিকর (Undignified)
    - ব্যঙ্গাত্মক বা মানহানিকর (যখন কোনো প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়) (Satirical or defamatory in nature)
    - কোনো সদস্য বা সংসদের প্রতি অপমানজনক বা আপত্তিকর (Insulting or offensive)

'অসংসদীয়' শব্দ রোধে বিধি ও সংশ্লিষ্ট সংসদীয় চর্চা অনুযায়ী কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো:

- স্পিকারের ক্ষমতা (The Speakers Authority): সংসদে উচ্চারিত কোনো শব্দকে 'অসংসদীয়' মনে করলে তা কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা আছে স্পিকারের। বিতর্ক চলাকালে শৃঙ্খলা ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য এই ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
- শব্দ বাদ দেওয়া (Expunging Words): 'বাদ দেওয়া' বা 'expunging' প্রক্রিয়ার অর্থ হলো, সংসদীয় কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড থেকে শব্দগুলো বাদ দেওয়া। একবার কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ বাদ দেওয়া হলে তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন করা যায় না। বিতর্কের সরকারি রেকর্ডে দেখানো হবে যে স্পিকারের নির্দেশে একটি বক্তব্যের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।
- বিধির পরিধি (Scope of the Rules): কার্যপ্রণালি বিধিগুলো সংসদে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো প্রদান করে, যার মধ্যে উপযুক্ত ভাষায় আলোচনা নিশ্চিত করাও অন্তর্ভুক্ত। এতে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থার নিয়মও রয়েছে, যেমন অশৃঙ্খল আচরণের জন্য কোনো সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা প্রত্যাহার করা।
- স্পিকারের ভূমিকা (Role of the Speaker): কার্যবিধি সম্পর্কিত বিষয় এবং প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে স্পিকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থাকে। এই ক্ষমতা অসংসদীয় ভাষা কী, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের সংসদীয় ব্যবস্থার একটি সাধারণ চর্চা। স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়।

# বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা একটি সুসংগঠিত শ্রেণিবদ্ধ কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং এর নিচে রয়েছে অধস্তন আদালতগুলো। সংবিধানের (ষষ্ঠ খণ্ড) মাধ্যমে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

**বিচার বিভাগের শ্রেণিবিন্যাস নিচে তুলে ধরা হলো–**

**১. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট**

সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত; আইনের শাসন বজায় রাখতে ও সংবিধান ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত:

১. **আপিল বিভাগ** (Appellate Division): বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। এটি হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়া রায়, ডিক্রি, আদেশ বা সাজার বিরুদ্ধে আপিল শুনানি করে। আইন দ্বারা নির্ধারিত হলে আপিল বিভাগ অন্যান্য আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আপিলও শুনতে পারে। জনগুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির চাওয়া অনুযায়ী মতামত দেওয়ার উপদেশমূলক এখতিয়ার (advisory jurisdiction) এর রয়েছে। আপিল বিভাগে সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি। আপিল বিভাগ ঘোষিত রায় হাইকোর্ট বিভাগ ও সকল অধস্তন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

২. **হাইকোর্ট বিভাগ** (High Court Division)

এই বিভাগের মূল, আপিল ও রিভিশনাল এখতিয়ার রয়েছে।

- **মূল এখতিয়ার** (Original Jurisdiction): এই বিভাগ সরাসরি কিছু মামলা শুনতে পারে। সেসবের মধ্যে রয়েছে সাংবিধানিক বিষয়, রিট আবেদন (মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য), কোম্পানি, নৌ-বিষয়ক ও বৈবাহিক বিষয়। সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত মৌলিক অধিকার রক্ষায় হাইকোর্ট বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- আপিল ও রিভিশনাল এখতিয়ার (Appellate and Revisional Jurisdiction): এটি অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলোর রায়, ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ও রিভিশন শুনানি করে।
- তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ (Superintendence and Control): সব অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে হাইকোর্ট বিভাগের। হাইকোর্ট বিভাগ ঘোষিত আদেশ-নির্দেশ সমস্ত অধস্তন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

**২. অধস্তন আদালত (নিম্ন আদালত)**

অধস্তন আদালতগুলো জেলা পর্যায়ে এবং তার নিচে পরিচালিত হয়। বেশির ভাগ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করে অধস্তন আদালত। এগুলো মূলত দুটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত:

**ক. দেওয়ানি আদালত (দেওয়ানি আদালত আইন, ১৮৮৭ অনুযায়ী)**

এই আদালতগুলো দেওয়ানি বিরোধ, সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিষয়, পারিবারিক মামলা, বাণিজ্যিক মামলা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। দেওয়ানি আদালতের মধ্যে এখতিয়ারের উচ্চতা অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস সাধারণত নিম্নরূপ:

১. **জেলা জজ আদালত** (District Judge Court)

২. জেলা পর্যায়ের সর্বোচ্চ দেওয়ানি আদালত। নিম্ন দেওয়ানি আদালতের আপিল শুনানি করে এবং কিছু উচ্চ মূল্যের দেওয়ানি মামলা ও প্রোবেট বিষয়ে মূল এখতিয়ার রয়েছে।

৩. **অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত** (Additional District Judge Court): জেলা জজের কাছ থেকে স্থানান্তরিত মামলাগুলো শুনানি করে।

৪. **যুগ্ম জেলা জজ আদালত** (Joint District Judge Court): উচ্চ আর্থিক মূল্যের দেওয়ানি মামলাগুলোর জন্য মূল এখতিয়ার রয়েছে (যেমন বর্তমানে ২৫ লাখ টাকা থেকে সীমাহীন)। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিষয় ও জেলা জজ কর্তৃক স্থানান্তরিত মামলাগুলোর রিভিশনও পরিচালনা করে।

৫. **সিনিয়র সহকারী জজ আদালত** (Senior Assistant Judge Court)ঃ নির্দিষ্ট আর্থিক এখতিয়ারসহ দেওয়ানি মামলাগুলো শুনানি করে (যেমন বর্তমানে ১৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত)।

৬. **সহকারী জজ আদালত** (Assistant Judge Court)ঃ নিম্ন আর্থিক এখতিয়ারসহ দেওয়ানি মামলাগুলো শুনানি করে (যেমন বর্তমানে ১৫ লাখ টাকার নিচে)।

৭. **ক্ষুদ্র কারণ আদালত** (Small Causes Courts)ঃ স্বল্প মূল্যের নির্দিষ্ট দেওয়ানি মামলাগুলো পরিচালনা করে, যা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

৮. **পারিবারিক আদালত** (Family Courts)ঃ বিবাহবিচ্ছেদ, দেনমোহর, শিশু হেফাজত এবং ভরণপোষণের মতো পারিবারিক বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন বিশেষায়িত আদালত।

**খ. ফৌজদারি আদালত (ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ অনুযায়ী)**

এই আদালতগুলো ফৌজদারি অপরাধ নিয়ে কাজ করে। এগুলো প্রধানত সেশনস আদালত ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিভক্ত:

**১. সেশনস আদালত** (Sessions Courts)ঃ অধিক গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ (যেমন খুন, মাদক পাচার) পরিচালনা করে।

- **শ্রেণিবিন্যাসঃ** সেশনস জজ আদালত (জেলা পর্যায়ের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত); অতিরিক্ত সেশনস জজ আদালত; যুগ্ম সেশনস জজ আদালত, মহানগর এলাকায় এগুলো মেট্রোপলিটন সেশনস আদালত (মেট্রোপলিটন সেশনস জজ আদালত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন সেশনস জজ আদালত, যুগ্ম মেট্রোপলিটন সেশনস জজ আদালত) নামে পরিচিত।

**২. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত** (Magistrate Courts)ঃ কম গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ ও ফৌজদারি কার্যধারার প্রাথমিক পর্যায়গুলো পরিচালনা করে।

- **মহানগর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার শ্রেণিবিন্যাসঃ** চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত; অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত; সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট নামেও পরিচিত); জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (দ্বিতীয় শ্রেণি, তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটসহ)
- **মহানগর এলাকার শ্রেণিবিন্যাসঃ** চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত; অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত; মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

**৩. বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল**

নিয়মিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বিরোধ বা অপরাধের বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ আইনের অধীনে বিভিন্ন বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল
- শ্রম আদালত এবং শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল
- দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনাল
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
- সাইবার ট্রাইব্যুনাল
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ জন্য)
- অর্থঋণ আদালত
- দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল
- পরিবেশ আদালত
- কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিল ট্রাইব্যুনাল

**মূলনীতিসমূহ**

- **বিচারিক স্বাধীনতা:** সংবিধান বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন রাখতে সচেষ্ট।
- **বাধ্যতামূলক নজির:** আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বিভাগ ও সমস্ত অধস্তন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত সমস্ত অধস্তন আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।
- **তত্ত্বাবধান:** হাইকোর্ট বিভাগ সমস্ত অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

এই শ্রেণিবদ্ধ কাঠামো আপিল চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করে, যা সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা এবং সারা দেশে আইনের প্রয়োগে ধারাবাহিকতা বাড়ায়।

বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো নির্বাহী হস্তক্ষেপমুক্ত বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তবে বাস্তবে প্রায়শই এই সাংবিধানিক আদর্শ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ দেখা যায়।

**বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাংবিধানিক বিধান**

বাংলাদেশের সংবিধান, বিশেষ করে ৬ষ্ঠ খণ্ডে (বিচার বিভাগ), বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে:

- ৯৪(৪) অনুচ্ছেদ: এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পরিচালনায় স্বাধীন থাকিবেন।' এর মাধ্যমে সরাসরি বিচারকদের কার্যনির্বাহী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ২২ অনুচ্ছেদ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি): আদালত দ্বারা সরাসরি বলবৎযোগ্য না হলেও এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।' এটি সুশাসনের জন্য একটি মৌলিক নীতি স্থাপন করে।
- বিচারক নিয়োগ (৯৫ অনুচ্ছেদ): প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারকদের নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। 'পরামর্শ' মানেই ঐকমত্য নয়, তবু এটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের একটি ভূমিকার ইঙ্গিত দেয়।
- পদের মেয়াদ (৯৬ অনুচ্ছেদ): বিচারকেরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অবসর গ্রহণের বয়স পর্যন্ত (বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের জন্য ৬৭ বছর) পদে থাকেন। তবে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার কারণে কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করা যায়। এই ক্ষমতা কার কাছে থাকবে– সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল, নাকি সংসদ; এ নিয়ে রাজনীতি হয়েছে। সংবিধান সংশোধন করে সংসদকে ক্ষমতা দিয়েছিল আদালত। ওই সংশোধনী বাতিল করায় শেখ হাসিনা সরকার প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগ এবং দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল।

তাদের অপসারণ হয় একটি কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাদের অপসারণের জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনসহ একটি প্রস্তাবের প্রয়োজন হয়, যা প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এটি বিচারকদের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক স্বেচ্ছাচারী অপসারণ থেকে রক্ষা করে।

- অধস্তন আদালতসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ (১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ): যদিও বিচার বিভাগীয় সেবায় নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করা হয়, বিচার বিভাগীয় সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং বিচারিক কার্য সম্পাদনকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর নিয়ন্ত্রণ (পোস্টিং, পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা) রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকে। তবে তা 'সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে' প্রয়োগ করতে হয়। এটি নিম্নস্তরের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান।
- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা (১১৬এ অনুচ্ছেদ): পরবর্তীকালে যুক্ত হওয়া এই অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, বিচারিক কার্য সম্পাদনকারী বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা 'তাহাদের কার্যভার পরিপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন'।
- সুপ্রিম কোর্ট রেকর্ড আদালত (১০৮ অনুচ্ছেদ): এই বিধান সুপ্রিম কোর্টকে নিজের অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, যা এর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব রক্ষায় একটি উপায় প্রদান করে।
- সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাঁধাইকারী প্রভাব (১১১ অনুচ্ছেদ): সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অন্যান্য সব আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক। এতে বিচারিক শ্রেণিবিন্যাস ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ, এটি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করে। এটি ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

**স্বাধীন বিচার বিভাগ কেন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য**

একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ বেশ কয়েকটি মূল কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **আইনের শাসন:** গণতন্ত্রে ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল নয়, আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ। অবস্থান, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা-নির্বিশেষে সবার জন্য আইন সমানভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত হয় স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে। এর মানে হলো সরকারও আইনের অধীন।

২. **অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষা:** বাহ্যিক চাপ থেকে মুক্ত বিচারকেরা নিরপেক্ষভাবে সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা করতে পারেন, যাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা পায়। নির্বাহী বা আইনসভা শাখার দ্বারা এই অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাঁরা চূড়ান্ত রক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

৩. **চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স:** বিচার বিভাগ সরকারের তিনটি স্তম্ভের (নির্বাহী ও আইনসভার পাশাপাশি) একটি। এর স্বাধীনতা একে অন্য দুটি শাখার ক্ষমতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করতে দেয়, যা কোনো একটি শাখার অতিরিক্ত শক্তিশালী হওয়া বা তার সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখে। এই 'ক্ষমতার বিভাজন' স্বৈরাচার প্রতিরোধে অপরিহার্য।

৪. **নিরপেক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি:** একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ ব্যক্তি, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে, এমনকি সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিরপেক্ষ ফোরাম হিসেবে কাজ করে। নাগরিকেরা বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের মামলার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক প্রভাব বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে নয়, তথ্য ও আইনের ভিত্তিতে ন্যায্যভাবে নেওয়া হবে।

৫. **জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি:** যখন জনগণ বিশ্বাস করে যে বিচারকেরা রাজনৈতিক কারসাজি ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত, তখন বিচারব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা বাড়ে। এই আস্থা সামাজিক স্থিতিশীলতা, আইনের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি ও আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

৬. **জবাবদিহি নিশ্চিত করা:** সরকারি কর্মকর্তা ও সংস্থাগুলো যদি আইন লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তবে তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে স্বাধীন বিচার বিভাগ। সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য এই জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **আইনের ধারাবাহিকতা ও পূর্বাভাসযোগ্যতা:** স্বাধীন বিচারকেরা আইনকে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা পূর্বাভাসযোগ্য আইনি ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। এই পূর্বাভাসযোগ্যতা স্থিতিশীল সমাজের জন্য, বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে এবং ন্যায্য ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।

**বিচার বিভাগের স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জ**

সাংবিধানিক সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনতার বাস্তব প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

- **নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণে নির্বাহী প্রভাব**
  - **বিচারক নিয়োগ:** কাগজে-কলমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের আগে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের নিয়ম আছে; কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করেন) হাতে। সমালোচকদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। প্রায়ই রাজনৈতিক বিবেচনায় এমন নিয়োগ ঘটে, যা স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।
  - অধস্তন বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ: ১১৬ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন হলেও, ঐতিহাসিক চর্চা ও ব্যাখ্যা কখনো কখনো এই বিষয়গুলোতে নির্বাহী আধিপত্যের দিকে পরিচালিত করেছে। ২০০৭ সালের মাসদার হোসেন মামলার রায়ে (বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ) বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাহী বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা হয়। তবে নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, পোস্টিং ও শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাহী প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ এখনো বিদ্যমান।
- আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব: বিচার বিভাগের বাজেট নিয়ন্ত্রিত হয় নির্বাহী বিভাগ দ্বারা। এই পরিস্থিতির উন্নতি করার চেষ্টা করা হলেও আর্থিক সংস্থানের জন্য নির্বাহীর ওপর নির্ভরতা অন্তর্নিহিত নির্ভরশীলতা তৈরি করতে পারে।
- আদালত অবমাননা ও চাপ: সুপ্রিম কোর্টের আদালত অবমাননার ক্ষমতা থাকলেও, এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিচারক বা বিচারিক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক নেতা বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ, ভীতি প্রদর্শন বা জনরোষের মুখোমুখি হয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদন উদ্বেগজনক প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে আদালত প্রাঙ্গণ কথিতভাবে 'রাজনৈতিক গুণ্ডা ও ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দখলে চলে যায়, যারা আইনজীবীদের সঙ্গে চিৎকার করে, বিচারকদের ভয় দেখায় এবং নিছক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে' এবং 'চাপে' পড়ে বিচারকদের সিদ্ধান্ত দিতে দেখা যায়।

- বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ: বিচারিক সিদ্ধান্ত, বিশেষত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক মামলাগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ ওঠে প্রায়ই। এটি বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করে।
- মামলা জট ও অদক্ষ প্রশাসন: স্বাধীনতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও বিশাল মামলা জট ও পদ্ধতিগত অদক্ষতা জনগণের আস্থা নষ্ট করতে পারে এবং বাহ্যিক হস্তক্ষেপ বা দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করতে পারে, যা পরোক্ষভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার অভাব: ৯৬ অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের জন্য সংসদীয় প্রক্রিয়া নির্ধারণ করলেও ষোড়শ সংশোধনী এনে বিচারকদের অপসারণের জন্য সংসদকে ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্ট তা অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। মূল বিধান (সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল) পুনর্বহাল করা হয়। তবে বিচারক অপসারণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক বিচারিক জবাবদিহি ও স্বাধীনতার মধ্যে টানাপোড়েনকে তুলে ধরে।
- সব বিচারিক নিয়োগের জন্য 'বিচার বিভাগীয় সেবা কমিশন'-এর অভাব: অনেক গণতান্ত্রিক দেশে বিচারপতি নিয়োগের জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগীয় সেবা কমিশন আছে। বাংলাদেশে এর অভাব রয়েছে। এমন একটি কমিশন থাকলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত রাখা যেত।

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বেশ জোর দিয়েই বলা আছে, কিন্তু সেই আদর্শের বাস্তবায়ন নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক চাপ ও পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সত্যিকারের বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা তাই এক বড় লড়াই; যা এখনো চলমান রয়েছে।

## বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বর্তমান অবস্থা ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার বিচার বিভাগের সংস্কারেও হাত দেয় এবং সরকারকে সুপারিশ দিতে গঠন করে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। কমিশনের সুপারিশের আলোকে ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর প্রথম ও পরে ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি সংশোধিত আকারে জারি হয় 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ', যা বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার একটি সর্বশেষ কার্যকরী পদক্ষেপ। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও এর প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করতে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে এই স্বতন্ত্র সচিবালয় হবে জুডিশিয়াল সেক্রেটারিয়েট। এর ফলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা আইন মন্ত্রণালয় থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

তবে, অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের আলোকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে যেভাবে স্থির করেছে, তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে যত শিগগির সম্ভব জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আইনে পরিণত করাই হবে আগামী নির্বাচনে জয় পাওয়া দলের সরকারে গিয়ে বড় দায়িত্ব।

**সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ ২০২৫:** অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে নির্বাহী বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক রাখা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি।

এই নীতির আলোকে এবং সংবিধানের ১০৯ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা এবং বিচার বিভাগের সার্বিক কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রয়োজন।

অধ্যাদেশে আরও বলা হয়েছে, এই সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্ত ঠিক করতে আলাদা বিধান করাও প্রয়োজন।

এ ছাড়া আপিল বিভাগের ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপিল মামলার রায় বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করতে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন সম্পন্ন হওয়া এবং কার্যক্রম পুরোপুরি চালু হওয়ার পর সরকার সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে অধ্যাদেশের ৭ নম্বর বিধানাবলি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করবে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, অন্য কোনো আইন বা বিধিতে যা-ই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানই প্রাধান্য পাবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এ অধ্যাদেশে বলা হয়েছে– (১) সংবিধানের ২২, ১০৯ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় নামে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় থাকবে। (২) সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির হাতে থাকবে। সচিবালয়ের সচিব হবেন প্রশাসনিক প্রধান। (৩) প্রয়োজন হলে সচিবালয় সরকারি মন্ত্রণালয়ের মতোই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। (৪)

সচিবালয়ে একজন সচিবসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। (৫) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব সরকারের সিনিয়র সচিব এর সমমর্যাদা ও সুবিধাদি ভোগ করবেন। (৬) সচিবালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। (৭) প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করে আদেশ জারি করতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যাবলি বিষয়ে এ অধ্যাদেশে বলা হয়েছে: (১) অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যাবলি হবে– (ক) দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনায় সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা করা এবং অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের সব প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন। (খ) অধস্তন আদালতের প্রতিষ্ঠা বা বিলোপ, সংখ্যা, গঠন ও এখতিয়ার নির্ধারণ। (গ) অধস্তন (নিম্ন) আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিচারক, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্ত নির্ধারণ। (ঘ) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃজন, বিলোপ, বিন্যাস, নিয়োগ, কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণ, পদায়ন, বদলি, শৃঙ্খলা, ছুটি, প্রশাসন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ (ঙ) সুপ্রিম কোট রেজিস্ট্রি, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের পদ সৃজন, বিলোপ ও বিন্যাস। (চ) সচিবালয়, রেজিস্ট্রি ও ট্রাইব্যুনালের কাঠামো নির্ধারণ ও হালনাগাদ। (ছ) অধস্তন আদালত, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্টি এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়-সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হালনাগাদকরণ। (জ) সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কমিটিকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়া। (ঝ) বিচারিক কর্মে নিয়োজিত সদস্যদের পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ও ছুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (ঞ) সার্ভিস সদস্যগণের পদায়ন ও বদলিসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন; (ট) অধস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং সচিবালয় সংক্রান্ত বাজেট তৈরি (ঠ) সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়-সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন বা কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। (ড) প্রধান বিচারপতি, আদালত ও বিচারকদের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান। (ঢ) সার্ভিস সদস্যগণের এবং সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের শিক্ষা, বৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও এতৎসংক্রান্ত অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। (ণ) বিচারিক সেবার মানোন্নয়ন ও বিচার বিভাগের সংস্কারে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা, প্রকাশনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ। (ত) অন্যান্য দেশের আদালত, বিচার বিভাগ এবং আইনের শাসন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন। (থ) প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিমালার অধীনে অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন। (দ) অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রধান বিচারপতির আরোপিত দায়িত্ব পালন।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগের কাজ ঠিকভাবে চালাতে আইন ও বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়কে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেবে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যপদ্ধতি বিষয়ে বলা হয়েছে– (১) সচিবালয় সরাসরি সরকারের যেকোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। (২) কোনো ব্যক্তি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানও সচিবালয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে। (৩) প্রধান বিচারপতি চাইলে আদেশের মাধ্যমে সচিবালয়ের কাজের ভাগ-বণ্টন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারবেন।

সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্ব পালন বিষয়ে অধ্যাদেশে বলা হয়েছে– (১) সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হবে। (২) সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সচিবালয় সার্ভিস সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সব প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির পক্ষে পালন করবে। (৩) সার্ভিস সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কার্যাদির বিষয়ে সচিবালয়কে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিটির পরামর্শের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। উক্ত কমিটির সদস্যগণ আপিল বিভাগের বিচারক দ্বারা মনোনীত হবেন। সার্ভিস সদস্যদের পদায়ন বা বদলিসংক্রান্ত কাজ সংবিধানের ১৩৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পন্ন হবে।

অধ্যাদেশে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি বিষয়ে বলা হয়েছে– (১) অধস্তন আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার ও সচিবালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত উন্নয়ন বা কারিগরি প্রকল্প চূড়ান্ত নিরীক্ষা ও সুপারিশ করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। কমিটিতে (ক) আপিল বিভাগের একজন বিচারক (প্রধান বিচারপতি মনোনীত) হবেন কমিটির সভাপতি; (খ) হাইকোর্ট বিভাগের দুজন বিচারক (প্রধান বিচারপতি মনোনীত); (গ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ; (ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। (ঙ) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ; (চ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট; এবং (ছ) কমিটির সদস্য সচিব হবেন সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব।

কমিটি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে এর কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

কোনো প্রকল্পের ব্যয় যদি ৫০ কোটি টাকার মধ্যে থাকে, তবে প্রধান বিচারপতি নিজেই তা অনুমোদন করবেন। আর ব্যয় যদি ৫০ কোটি টাকার বেশি হয়, তবে তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনামন্ত্রীর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে পাঠানো হবে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও যাচাই-বাছাই করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ের সময় 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা, ২০২২' অনুসরণ করা হবে। সরকার সময়ে সময়ে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আর্থিক সীমা বাড়াতে বা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবে।

অধ্যাদেশে আরও বলা হয়েছে, বিচার বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান বিচারপতি প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক বিচার প্রশাসনসংক্রান্ত কমিটি গঠন করতে পারবেন।

এসব কমিটি আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গঠিত হবে। কমিটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক থাকবেন। প্রতিটি কমিটির মেয়াদ ও দায়িত্বের পরিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশন বিষয়ে অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, একটি সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশন গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি এর চেয়ারপারসন হবেন। কমিটির অন্যান্য সদস্য হিসেবে থাকবেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা, প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল।

এই কমিশন দেশের বিচার প্রশাসনের উন্নয়ন এবং বিচার বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে। কমিশন তার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি বাজেট বিবৃতি প্রস্তুত করবে। অর্থবছর শুরুর অন্তত তিন মাস আগে এটি তৈরি করতে হবে।

এতে থাকবে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত আদালত, প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের অনুমোদিত আয় ও ব্যয়। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জন্যও আলাদা আয় ও ব্যয়ের বিবৃতি তৈরি হবে।

বিচারক ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, বিচার প্রশাসন পরিচালনার প্রশাসনিক ব্যয় এবং সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত, সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, কমিশন, ইনস্টিটিউট, একাডেমি ইত্যাদির নিয়মিত ও উন্নয়ন ব্যয়। এ ছাড়া গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের বাজেট বিবৃতিটিকে সরকারের আর্থিক বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে সংসদে উপস্থাপনের জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন। বাজেট প্রণয়নের সুবিধার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় তাদের রাজস্ব, প্রাপ্তি ও সম্ভাব্য খরচের প্রাথমিক হিসাব সরকারের কাছে সময়মতো পাঠাবে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ও ভাতা এবং সচিবালয়ের সব প্রশাসনিক ব্যয় এই তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হবে। জাতীয় বাজেটে সুপ্রিম কোর্টের জন্য বরাদ্দ অর্থ যাবে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির অনুকূলে, আর সচিবালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ যাবে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের অনুকূলে– দুটো আলাদা খাতে।

এই অর্থ ব্যয় করতে সরকারের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সময়মতো সরকার যে ব্যয়সংক্রান্ত নিয়ম জারি করবে, তা এখানে প্রযোজ্য হবে। বাজেটের অর্থ পুনর্বিন্যাস বা পুনর্ব্যবহারের ক্ষমতা থাকবে প্রধান বিচারপতির হাতে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সব খরচ অনুমোদনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হবেন প্রধান বিচারপতি।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী নিয়োগ পাবেন।

বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তা এবং সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালতে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্য থেকে সচিবালয়ে কর্মচারী পদায়ন করতে পারবেন।

আবার, সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও অধস্তন আদালতে বদলি বা পদায়ন করা যাবে, বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের সচিবালয়ে বদলি বা পদায়ন করা যাবে। সবই বিধি অনুযায়ী হবে।

বিধি, প্রবিধি, আদেশ বা পরিপত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য নিয়মকানুন (বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তবে সার্ভিস সদস্যদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের জন্য নির্ধারিত আইন, বিধি ও আদেশ কার্যকর হবে।

শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রণীত বিধি ও আদেশ অনুযায়ী সার্ভিস সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যাঁরা আইন ও বিচার বিভাগ বা সরকারের অন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং আইন ও বিচার বিভাগের বিধি অনুযায়ী।

সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী কার্যকর হবে।

সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার, সচিবালয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন বা পদ সৃষ্টি, বিলোপ ও বিন্যাসের জন্য একটি পদ সৃজন কমিটি গঠিত হবে।

কমিটির সভাপতি হবেন আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক।

সদস্য হিসেবে থাকবেন– প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের দুজন বিচারক, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব ও সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল।

এই কমিটির সুপারিশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সুপারিশ অনুযায়ী পদ সৃষ্টি বা বিলোপের আদেশ জারি করা হবে এবং কমিটি আদেশ জারির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের পদ সৃজনের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা বিষয়ে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ, নির্দেশ বা পরিপত্র জারি করতে পারবেন, যাতে অধ্যাদেশের ধারা কার্যকর হয়।

## আইনের শাসন সূচকে বাংলাদেশের দুর্বল পারফরম্যান্স কেন

ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট (ডব্লিউজেপি) রুল অব ইনডেক্সে বাংলাদেশের নাম ধারাবাহিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় একেবারে তলানির দিকে। দেশের ভেতর আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকার কতটুকু, তা পরিমাপের অন্যতম সূচক এটি।

ডব্লিউজেপি রুল অব ল ইনডেক্স আটটি ফ্যাক্টরের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশে আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকার মূল্যায়ন করে: ১. সরকারের ক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতা ২. দুর্নীতির অনুপস্থিতি ৩. উন্মুক্ত সরকার ৪. মৌলিক অধিকার ৫. শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ৬. নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ ৭. দেওয়ানি বিচার ৮. ফৌজদারি বিচার।

এই কারণগুলোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিকভাবে কম স্কোর পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোর একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

**দুর্বল পারফরম্যান্সের প্রধান কারণ**

**১. সরকারের ক্ষমতার ওপর দুর্বল সীমাবদ্ধতা:** আইনের শাসনের একটি মূলনীতি হলো, সরকারসহ কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের অনুভূত অভাবের কারণে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে দুর্বল পারফরম্যান্স করে। এর মধ্যে আইনসভা, বিচার বিভাগ ও সুশীল সমাজের সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষমতার দুর্বলতাও অন্তর্ভুক্ত। নির্বাহী ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার এবং এই তদারকি প্রক্রিয়াগুলোর কার্যকারিতা হ্রাসের বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

**২. দুর্নীতির সর্বব্যাপী উপস্থিতি:** দুর্নীতি বাংলাদেশের নিম্ন র‍্যাঙ্কিংয়ের অন্যতম কারণ। ডব্লিউজেপি সূচক সরকারি খাতের দুর্নীতি পরিমাপ করে। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এতে দুর্বল স্কোর করেছে। এর প্রধান কারণ পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লিখিত পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো; যেমন রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, দুদকের মতো দুর্বল দুর্নীতি দমনকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি। পুলিশ, বিচার বিভাগ ও সরকারি পরিষেবার মধ্যে দুর্নীতি সামগ্রিক আইনের শাসনের কাঠামোকে দুর্বল করে।

**৩. মৌলিক অধিকারের ক্ষয়:** 'মৌলিক অধিকার' বিষয়ে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। এই সূচক বাক্‌স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকারের মতো বিষয়গুলো পরিমাপ করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার

সংস্থা ও ডব্লিউজেপির নিজস্ব প্রতিবেদনগুলো এই ক্ষেত্রগুলোতে অবনতির ইঙ্গিত দেয়, যেখানে সরকারের সমালোচক, সাংবাদিক ও অধিকারকর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে বাতিল হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) মতো আইনগুলো বাক্স্বাধীনতা ও নাগরিক স্বাধীনতা সীমিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

**৪. বিচারব্যবস্থার ব্যর্থতা (দেওয়ানি ও ফৌজদারি):** সূচকে বাংলাদেশের দুটি দুর্বলতম ক্ষেত্র হচ্ছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা।

- **দেওয়ানি বিচার:** এই ব্যবস্থা বিশাল মামলাজটে জর্জরিত। এতে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটে এবং বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য বিচারকে দুষ্প্রাপ্য করে তোলে। ডব্লিউজেপি সূচক এমন বিচারব্যবস্থাকে দুর্বল আইনের শাসনের একটি মূল সূচক হিসেবে বিবেচনা করে, যা নাগরিকদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়।
- **ফৌজদারি বিচার:** ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা প্রায়শই ধীর, অদক্ষ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সংবেদনশীল বলে সমালোচিত হয়। নির্বিচারে গ্রেপ্তার, হেফাজতে নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ জনগণের ব্যবস্থার ওপর আস্থা দুর্বল করে এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার নীতির সরাসরি বিরোধী।

**৫. নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগের অভাব:** সরকারি নিয়মাবলি ন্যায্য ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় কি না, তা পরিমাপ করা হয় এই উপাদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এমন ধারণা প্রচলিত যে নিয়মকানুন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা নিয়মকানুন এড়িয়ে যেতে পারেন, যেখানে ছোট প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ নাগরিকদের কঠোরভাবে জবাবদিহি করা হয়। আইনের এই অসম প্রয়োগ ন্যায্যতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে, যা একটি শক্তিশালী আইনের শাসনের মূল ভিত্তি।

এককথায়, ডব্লিউজেপি রুল অব ল ইনডেক্সে বাংলাদেশের দুর্বল পারফরম্যান্স কোনো একক সমস্যার কারণে নয়, বরং পদ্ধতিগত ব্যর্থতার একটি সংমিশ্রণের কারণে। এই কারণগুলো সম্মিলিতভাবে একটি দুর্বল আইনের শাসনের পরিবেশ তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন, ন্যায়বিচার ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

## রাজনৈতিক সাংবাদিকদের কেন বিচারিক কার্যাবলি বোঝা দরকার

### ১. বিচারিক সিদ্ধান্ত নীতি ও শাসনকে প্রভাবিত করে

- **প্রত্যক্ষ প্রভাব:** আদালতের, বিশেষ করে উচ্চ আদালতের রায় সরাসরি সরকারি নীতি পরিবর্তন করতে পারে, সংসদ কর্তৃক পাস করা আইন বাতিল করতে পারে অথবা নির্বাহী শাখাকে নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশগত নিয়মাবলি-সংক্রান্ত আদালতের একটি রায় শিল্পগুলোকে তাদের চর্চাগুলো পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে, আবার নির্বাচনী আইন-সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের নির্বাচনকে নতুনভাবে সাজাতে পারে।
- **পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত স্থাপন:** বিচারিক সিদ্ধান্তগুলো পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত (precedents) স্থাপন করে, যা আইনের ভবিষ্যতের ব্যাখ্যাকে পথনির্দেশ করে। এর অর্থ হলো, আজকের একটি রায় আগামী বহু বছর ধরে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজনৈতিক সাংবাদিকদের অবশ্যই এই পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলো বুঝতে হবে বিচারিক কার্যকলাপের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ করার জন্য।

### ২. জবাবদিহি এবং ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ

- **প্রহরীর ভূমিকা:** বিচার বিভাগ নির্বাহী ও আইন প্রণয়নকারী শাখার ক্ষমতার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করে। জনসাধারণের প্রহরী হিসেবে রাজনৈতিক সাংবাদিকদের বুঝতে হবে কীভাবে আদালত রাজনীতিবিদ ও সরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনে, নিশ্চিত করে যে তারা সংবিধান ও আইনের সীমার মধ্যে কাজ করছে।
- **ক্ষমতার অপব্যবহার উন্মোচন:** সাংবাদিকেরা প্রায়ই বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সরকারি সংস্থার দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা অবৈধ কার্যকলাপ উন্মোচন করতে পারেন। আদালতের প্রক্রিয়া ও আইনি নীতিগুলো বোঝা তাঁদের এই তদন্তগুলো কার্যকরভাবে প্রতিবেদন করতে সাহায্য করে।

### ৩. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কৌশল বোঝা

- **রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আইনি চ্যালেঞ্জ:** রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করতে, কিংবা বিরোধী কোনো নীতির বাস্তবায়ন আটকে দিতে আইনি চ্যালেঞ্জকে প্রায়ই কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন রাজনৈতিক কুশীলবেরা। বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন সাংবাদিক সহজে এই কৌশল চিহ্নিত করতে পারেন, আর এর পেছনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েও করতে পারেন রিপোর্ট।
- **রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ওপর প্রভাব:** বিচারিক তদন্ত বা শাস্তি একজন রাজনীতিবিদের ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দিতে পারে। তাই কোনো অভিযোগ বা আইনি তদন্তের মুখে পড়লে তার পরিণতি কী হতে পারে, সাংবাদিকদের তা বোঝাটা খুব জরুরি।

**৪. মৌলিক অধিকার এবং গণতন্ত্র নিয়ে রিপোর্টিং**

- **অধিকারের রক্ষাকবচ:** নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ হলো বিচার বিভাগ। রাজনৈতিক সাংবাদিকেরা প্রায়ই এমন সব স্টোরি কভার করেন, যেখানে এই অধিকারগুলো ঝুঁকির মুখে পড়ে (যেমন বাক্‌স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার, মানবাধিকার লঙ্ঘন)। বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকলে, এই অধিকারগুলোর আইনি ভিত্তি কী এবং আদালত কীভাবে সেগুলোকে সমর্থন দেয় বা চ্যালেঞ্জ করে, তা তারা সহজ করে বুঝিয়ে বলতে পারেন।
- **নির্বাচনী বিচার:** অনেক দেশে নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা, এমনকি ক্ষমতা হস্তান্তর তদারকিতেও বিচার বিভাগ রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এটা অত্যন্ত রাজনৈতিক একটা ক্ষেত্র; আর এখানে নির্ভুল রিপোর্টিংয়ের জন্য বিচারিক জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য।

**৫. জনগণের জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করা**

- **আইনি ভাষার অনুবাদ:** আইনি প্রক্রিয়া আর আদালতের রায় প্রায়ই জটিল সব পরিভাষায় ঠাসা থাকে। রাজনৈতিক সাংবাদিকদের এই ভাষা বুঝতে হয়; তারপর সাধারণ মানুষের জন্য তা সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হয়। এতে নাগরিকেরা বুঝতে পারে, বিচারিক সিদ্ধান্তের আসল প্রভাব তাদের জীবন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঠিক কেমন পড়বে।
- **প্রসঙ্গ প্রদান:** বিচারিক জ্ঞান রাখেন, এমন একজন সাংবাদিক আদালতের রায়ের অপরিহার্য প্রসঙ্গ ধরিয়ে দিতে পারেন। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আইনি নীতি, ঐতিহাসিক পটভূমি ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ব্যাখ্যা করতে পারেন সহজ করে।

**৬. বিচারিক রাজনীতিকে চিহ্নিত করা**

- **নিয়োগ ও মতাদর্শ:** প্রায়ই বিচারকদের নিয়োগ হয় অত্যন্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। কারণ, বিচারিক মতাদর্শ প্রভাবিত করতে পারে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল কোনো মামলার রায়কে। রাজনৈতিক সাংবাদিকদের এই গতিশীলতা বুঝতে হবে। এতে তাঁরা দেশের আইন ও রাজনীতির ওপর বিচারক নিয়োগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- **জনমত এবং সংবাদমাধ্যমের প্রভাব:** বিচারকদের নিরপেক্ষ থাকার কথা থাকলেও কিন্তু জনমত ও সংবাদমাধ্যমের কাভারেজ কখনো কখনো তৈরি করতে পারে প্রচণ্ড চাপ। এই পারস্পরিক সম্পর্ক সাংবাদিকদের মাথায় রাখা উচিত; আর বুঝতে হবে, এটা বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় কেমন প্রভাব ফেলতে পারে।

সোজা কথায়, রাজনৈতিক সাংবাদিকদের জন্য বিচার বিভাগের কার্যকলাপ কোনো বিচ্ছিন্ন আইনি বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক আখ্যানেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আদালত কীভাবে কাজ করে, তাদের ক্ষমতা কতটুকু; এসব না বুঝে একজন সাংবাদিক কোনো দেশের শাসনব্যবস্থার জটিলতা পুরোপুরি ধরতে পারবেন না; পারবেন না বিশ্লেষণ করতে বা কার্যকরভাবে তুলে ধরতে।

## নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য

গণতান্ত্রিক শাসনের একটি মৌলিক নীতি হলো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য। এর নকশাটাই এমন, যাতে সরকারের কোনো একটি শাখা অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে, করতে না পারে ক্ষমতার অপব্যবহার। এটা এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি শাখার হাতেই অন্য শাখার ক্ষমতাকে সীমিত করার ক্ষমতা আছে; যা দিয়ে তৈরি হয় পারস্পরিক তদারকি ও ক্ষমতার অংশীদারত্বের একটি ব্যবস্থা।

'নিয়ন্ত্রণ' (Checks) ও 'ভারসাম্য' (Balances); শব্দ দুটো সূক্ষ্মভাবে ভিন্ন হলেও একটার সঙ্গে আরেকটার সংযোগ আছে।

- নিয়ন্ত্রণ (Checks): নিয়ন্ত্রণ হলো এমন প্রক্রিয়া, যার বলে এক শাখা অন্য শাখার কাজে বাধা দিতে না পারে বা বাধা সীমিত করতে পারে। একে ক্ষমতার ওপর আরোপিত বাধা হিসেবে ভাবা যায়।
- ভারসাম্য (Balances): এটা নিশ্চিত করে, ক্ষমতা যেন কোনো এক শাখার হাতে জমা না হয়ে বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ হয় এবং নিশ্চিত হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যেন বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব থাকে।

## অকার্যকর জাতীয় সংসদ: অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওপর যত প্রভাব

নানা কারণে অকার্যকর হয়ে আছে আমাদের জাতীয় সংসদ। নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতেও ব্যর্থ। সরকার হয়ে পড়ছে লাগামহীন। দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ শুধু নয়, তাদেরকে দলীয় স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবেও অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক-বেসামরিক

আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সব প্রতিষ্ঠান হারিয়েছে স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ। ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বিচারপতি থেকে শুরু করে সামরিক বেসামরিক অনেক আমলার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ভয়াবহ দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে অহরহ।

আলোচনা করা যাক কেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না।

## বেসামরিক প্রশাসন

বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্বল কার্যকারিতা নিয়ে সমালোচনা বহুদিনের। জটিল এই সমস্যার বেশির ভাগই ঔপনিবেশিক আমল থেকে এবং পরে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে উদ্ভূত।

**বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন কেন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, তার কয়েকটি মূল কারণ নিচে দেওয়া হলো**

### ১. রাজনৈতিকীকরণ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের অভাব

সবচেয়ে বড় ও আলোচিত সমস্যা এটাই। বেসামরিক চাকরিতে পদোন্নতি, বদলি, নিয়োগ; এই সবকিছু প্রায়ই রাজনৈতিক আনুগত্য দেখে হয়ে থাকে; মেধা, দক্ষতা বা যোগ্যতা তেমন গুরুত্ব পায় না। এর ফলে এমন এক সিস্টেম তৈরি হয়েছে, যেখানে কর্মকর্তারা জনগণের সেবা করার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি রাখতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তারাও এতে হতাশ হন; ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তি না করলে হতে হয় একঘরে বা পেতে হয় শাস্তি।

### ২. আমলাতান্ত্রিক জট ও সংস্কারে বাধা

বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার, তৈরি হয়েছিল মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য নয়; বরং নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের জন্য। স্বাধীনতার পর থেকে সংস্কারের জন্য অনেক কমিশন ও কমিটি গঠন করা হলেও তাদের বেশির ভাগ সুপারিশই উপেক্ষা করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সংস্কারকে ভয় পান; মনে করেন, এতে তাঁদের ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও ক্যারিয়ার হুমকিতে পড়বে। তাই তাঁরা অর্থপূর্ণ পরিবর্তনকে সফলভাবে বাধা দেন।

### ৩. ব্যাপক দুর্নীতি

দুর্নীতিতে জর্জরিত বেসামরিক প্রশাসন। এর ফলে অদক্ষতা, বিলম্ব আর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব ঘটে। দুর্নীতি দমনের কার্যকর ব্যবস্থা নেই, অসদাচরণের শাস্তিও সামান্য। তাই ঘুষ খাওয়া, সরকারি তহবিলের অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতি হয়ে উঠেছে আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ।

### ৪. জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার অভাব

জবাবদিহির অভাব রয়েছে সিস্টেমে। কাজে ফাঁকি, দায়িত্বে অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য কর্মকর্তাদের প্রায় কখনোই শাস্তির মুখে পড়তে হয় না। তার ওপর সরকারের নীতি ও প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানার সুযোগও খুব কম। এতে জন্মায় অবিশ্বাস, কর্মকর্তাদেরও আর দায়বদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

### ৫. কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা

- **শ্রেণিবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত কাঠামো:** বেশির ভাগ সময় সব সিদ্ধান্ত আসে অত্যন্ত ধীরে, ওপরের স্তর থেকে। এতে কাজে বিলম্ব হয় এবং নিম্ন-স্তরের কর্মকর্তাদের স্বায়ত্তশাসন থাকে না।
- **দায়িত্বের পুনরাবৃত্তি:** এক মন্ত্রণালয়ের কাজ আরেক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে যায়, একই কাজ করা হয় একাধিকবার। ফলে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। তৈরি হয় 'দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার' সংস্কৃতি।
- **অকার্যকর নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:** নিয়োগ প্রক্রিয়া কাগজে-কলমে মেধাভিত্তিক হলেও প্রায়ই চলে দুর্নীতি। জোর দেওয়া হয় মুখস্থবিদ্যার ওপর, বাস্তব দক্ষতার ওপর নয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোও বেশির ভাগ সময় অপর্যাপ্ত হয়, আধুনিক শাসনব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরি হয় না।

### ৬. 'ঔপনিবেশিক প্রভাব' ও সাংস্কৃতিক সমস্যা

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শ্রেণিবিন্যাস, অধীনতা এবং 'তোষামোদের' (sycophancy) সংস্কৃতি এখনো বিদ্যমান। এতে জনগণের স্বার্থের চেয়ে ঊর্ধ্বতনদের খুশি করার দিকেই নজর থাকে বেশি। আবার বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সাধারণ বনাম বিশেষজ্ঞ– এ রকম রেষারেষি তো আছেই। এতে ঐক্য ও কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়।

এককথায়, বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের এই অদক্ষতা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পদ্ধতিগত দুর্নীতি এবং সেকেলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংমিশ্রণের ফল। এর ওপর আছে পরিবর্তনের প্রতি আমলাতন্ত্রের তীব্র প্রতিরোধ ও জবাবদিহির অভাব, যা উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

## সংসদের 'নিরীক্ষক': কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থা। এর কাজ সরকারি ব্যয় ও আয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা। সংস্থাটি 'জনগণের অর্থের পাহারাদার' হিসেবে কাজ করে। সরকার করদাতাদের অর্থ কীভাবে ব্যবহার করছে, তা স্বাধীনভাবে যাচাই করে এই প্রতিষ্ঠান।

### কার্যাবলি ও গুরুত্ব

সিএজির প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে সমস্ত সরকারি বিভাগ, দপ্তর, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি অর্থায়ন পায় এমন অন্যান্য সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করা। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তুলে ধরে এর প্রতিবেদন। কাজেই সংসদীয় তদারকির জন্য এগুলো অপরিহার্য।

সিএজির গুরুত্ব এর স্বাধীনতায় নিহিত, সরকারের নির্বাহী শাখা থেকে যা সম্পূর্ণ আলাদা। সুস্থ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো এই স্বাধীনতা। কারণ, এটাই নিশ্চিত করে যে, নিরীক্ষার ফলাফল হবে নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। সংসদের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়ে সিএজি জনগণকে সরকারের কাজ আর খরচের জন্য জবাবদিহি আদায় করতে সাহায্য করে।

সিএজির নিরীক্ষাকে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- আর্থিক নিরীক্ষা: আর্থিক বিবরণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। নিশ্চিত করে, সব লেনদেন সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে কি না।
- সম্মতি নিরীক্ষা: সরকারি ব্যয় প্রাসঙ্গিক আইন, নিয়ম ও বিধিমালা মেনে চলছে কি না, তা পরীক্ষা করে।
- কার্যকারিতা নিরীক্ষা: সরকারি কর্মসূচি ও প্রকল্পের কার্যকারিতা, দক্ষতা ও ব্যয়-সাশ্রয়ী কি না, তা মূল্যায়ন করে 'অর্থের সঠিক মূল্য' নিশ্চিতের জন্য।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি অর্থের জবাবদিহির ক্ষেত্রে সংসদ ও সিএজি কার্যালয়ের সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই সম্পর্ক ক্ষমতা যাচাই এবং ভারসাম্যের ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে সিএজি সরকারের ব্যয়ের জবাবদিহি নিশ্চিতে সংসদের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

### সম্পর্কের মূল দিক

সিএজি ও সংসদের সম্পর্ককে তিনটি মূল কাজের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায়:

১. **সংসদের নিরীক্ষক হিসেবে সিএজি:** সিএজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংসদের হয়ে নিরীক্ষা করা। সরকারের সব বিভাগ ও মন্ত্রণালয় তাদের আর্থিক কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করে সংসদের কাছে। সংসদের নিজস্ব বিস্তারিত নিরীক্ষা করার মতো কারিগরি দক্ষতা ও সম্পদ নেই। সিএজি সংসদের পক্ষ থেকে নিরীক্ষা পরিচালনা করে এবং জনগণের অর্থ কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দেয়।

২. **সংসদে প্রতিবেদন পেশ:** সিএজি তার নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয় সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে। তিনি সেটা পেশ করেন সংসদে। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে, নির্বাহী শাখা (সরকার) যেন প্রতিবেদনে প্রভাব বিস্তার বা পাল্টাতে না পারে। আর্থিক অনিয়ম, নিয়ম ভাঙার ঘটনা এবং সরকারি ব্যয়ের অদক্ষতা তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে। এতে সংসদের সামনে সরকারের আর্থিক অবস্থার এক পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে।

৩. **কমিটির মাধ্যমে সংসদীয় নজরদারি:** সংসদে পেশ হওয়ার পর প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সংসদীয় কমিটির কাছে; যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারি হিসাব কমিটি (পিএসি)। এই কমিটির প্রধান থাকেন সাধারণত বিরোধী দলের কোনো সদস্য; তারা সিএজির অনুসন্ধান পর্যালোচনা করেন। পিএসি সরকারি কর্মকর্তাদের তলব করে। জানতে চায়, প্রতিবেদনে ওঠা অভিযোগগুলোর কী ব্যাখ্যা আছে তাঁদের কাছে। এই প্রক্রিয়াই সংসদকে ক্ষমতা দেয় জবাবদিহি চাওয়ার, পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করার এবং সরকার যেন ভুল শুধরে নেয়, তা নিশ্চিত করার।

### সম্পর্কের গুরুত্ব

এই সম্পর্ক বেশ কয়েকটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

- **জবাবদিহি নিশ্চিত করে:** আইনসভার কাছে সরকারের জবাবদিহি করার একটা সরাসরি পথ খুলে দেয় এটি। জনগণের অর্থ কোথায়, কীভাবে খরচ হলো, সিএজির প্রতিবেদন সংসদকে সেই প্রশ্ন করার সুযোগ করে দেয়।
- **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** সরকারের আর্থিক কার্যক্রমকে জনসমক্ষে এনে স্বচ্ছতা বাড়ায় এই ব্যবস্থা। নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো পরিণত হয় পাবলিক রেকর্ডে। এই রেকর্ড ব্যবহার করে সংবাদমাধ্যম ও সুশীল সমাজ সরকারের কাছে জবাবদিহি দাবি করতে পারে!
- **স্বাধীনতা রক্ষা:** নির্বাহী শাখা থেকে সিএজির স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিএজির নিয়োগ ও অপসারণের পদ্ধতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের মতোই; আর প্রতিবেদনও জমা দেয় সরাসরি আইনসভার কাছে। এ কারণেই এর অনুসন্ধান হয় নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য। এ স্বাধীনতাই সিএজিকে সংসদের জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার বানিয়েছে।
- **নীতি সংস্কারের ভিত্তি:** সিএজি প্রতিবেদনের বিভিন্ন অনুসন্ধান ও সুপারিশ প্রায়ই নতুন নীতি বা প্রশাসনিক সংস্কারের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভেতরের দুর্বলতাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এগুলো, সেই সঙ্গে শাসনব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে।

মোদ্দাকথা, সিএজি এবং সংসদ হলো আর্থিক নজরদারির এক শক্তিশালী ব্যবস্থার দুটি অংশ। সিএজি করে নিরীক্ষার কারিগরি কাজটা, আর সংসদ সেই নিরীক্ষার ফল কাজে লাগানোর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে।

### বাংলাদেশের পরিস্থিতি

বাংলাদেশে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের বা সিএজির কার্যালয় সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এর কার্যাবলি ও ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত এবং ১৯৭৪ সালের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলি) আইন দ্বারা আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সিএজি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। আর তাকে অপসারণও করা হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মতো একই পদ্ধতিতে, যা তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

সাংবিধানিক ম্যান্ডেট ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সিএজি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এর প্রতিবেদনগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হয়, তিনি সেগুলো সংসদে পেশও করেন। তবে এসব প্রতিবেদনের ওপর সংসদীয় নজরদারির কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু সমালোচকের মতে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলোর প্রতি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি (পিএসি) প্রয়োজনীয় মনোযোগ ও ফলো-আপ দেয় না। এ ছাড়া বাজেট বরাদ্দ ও কর্মী নিয়োগের মতো প্রশাসনিক বিষয়ে নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরতার কারণে সিএজির স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের সিএজি কার্যালয় ডিজিটাল সিস্টেম চালু এবং সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য কার্যকারিতা নিরীক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে এর কার্যপদ্ধতি আধুনিকীকরণ করছে। এসব সংস্কারের লক্ষ্য হলো দেশের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা শক্তিশালী করা।

সাংবিধানিক ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সিএজি কিছু পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এতে দেশের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে এর কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়। সিএজির কার্যালয় যদিও গত কয়েক বছরে কিছু অগ্রগতি করেছে, তবে এই সমস্যাগুলো তার সামগ্রিক কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে চলেছে।

সিএজি কেন তার উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জনে ব্যর্থ হন, এর কিছু প্রধান কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

### ১. দুর্বল ফলোআপ ও সংসদীয় নজরদারি

- **অকার্যকর সরকারি হিসাব কমিটি (পিএসি):** সিএজির প্রতিবেদনগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া হয়। তিনি সেগুলো সংসদে পেশ করেন। এই প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা ও সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংসদের সরকারি হিসাব কমিটির (পিএসি)। তবে একটি প্রধান দুর্বলতা হলো পিএসির সীমিত সক্ষমতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এসব দুর্বলতার কারণে প্রতিবেদনগুলোর যথাযথভাবে নিরীক্ষণ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রায়ই প্রচুর কাজ জমে থাকে; সুপারিশও ধারাবাহিকভাবে কার্যকর করা হয় না।
- **জনগণ ও সংবাদমাধ্যমের মনোযোগের অভাব:** অন্য কিছু দেশের মতো বাংলাদেশে সিএজির প্রতিবেদন সাধারণত জনগণ ও সংবাদমাধ্যমের মনোযোগ কম পায়। জনমতের চাপ না থাকলে সরকারি সংস্থাগুলোর নিরীক্ষা ফলাফল অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার এবং অনিয়ম সংশোধনের জন্য আগ্রহ খুব কম থাকে।

**২. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতা**

- **নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীলতা:** সিএজি তার কার্যকারিতায় সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও বাস্তবে এর সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এর কার্যালয়ের বাজেট, কর্মী নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়গুলো বেশির ভাগই নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে এর কার্যগত স্বাধীনতাকে ব্যাহত এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।
- **শাস্তিমূলক ক্ষমতার অভাব:** সিএজির ভূমিকা হলো নিরীক্ষা করা ও প্রতিবেদন দেওয়া। তবে সুপারিশ প্রয়োগ বা শাস্তি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা এর নেই। এটি আর্থিক অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনা তুলে ধরতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভর করে। ফলে নিরীক্ষার আপত্তির ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা খুব কমই নেওয়া হয়। এতে প্রতিবেদনগুলোর প্রভাব কমে যায়।

**৩. অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ ও দুর্নীতি**

- নিরীক্ষা কার্যালয়ের মধ্যে দুর্নীতি: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ২০১৫ সালের এক গবেষণায় সিএজি কার্যালয়ের মধ্যেই দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। এটি নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করতে পারে, প্রতিবেদনগুলোতেও দেখা দিতে পারে স্বচ্ছতার অভাব। কারণ, কর্মকর্তারা কিছু বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রভাবিত হতে পারেন।
- সক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব: যদিও সিএজি কার্যালয় আধুনিকীকরণ করছে এবং কার্যকারিতা নিরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, তবু জটিল নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নত আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে।

**৪. পুরোনো আইনি কাঠামো**

- বিস্তৃত নিরীক্ষা আইনের অভাব: বৃহত্তর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে একটি খসড়া নিরীক্ষা আইনের কথা বলা হলেও সিএজির ক্ষমতা ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করার মতো আধুনিক ও বিস্তৃত আইনের অভাব একটি সীমাবদ্ধতা হতে পারে। সাংবিধানিক হলেও বিদ্যমান আইনি কাঠামো আধুনিক সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার জটিলতাগুলো মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী না-ও হতে পারে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের সিএজি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থা হলেও এর কার্যকারিতা প্রায়শই দুর্বল সংসদীয় তদারকি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। সিএজির স্বাধীনতা বাড়ানো, সরকারি হিসাব কমিটির ক্ষমতায়ন করা এবং নিরীক্ষা ফলাফলগুলোর ওপর ধারাবাহিক ফলো-আপ নিশ্চিত করা দেশের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

## দুর্নীতি দমন কমিশন

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও সংসদের মধ্যে সম্পর্ক দেশের দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাগজে-কলমে এই সম্পর্ক আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত। আর এ আইনের উদ্দেশ্য হলো দুদক যেন একটি স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা। তবে বাস্তবে বিষয়টি বেশ জটিল এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত।

**আইনি কাঠামো: স্বাধীনতা ও তদারকি**

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী, দুদক একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার কাজ হলো দুর্নীতি প্রতিরোধ ও তদন্ত করা। এই আইন রাষ্ট্রপতির ও সংসদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক তৈরি করেছে, যা সংস্থাটির অপারেশনাল অটোনমির সঙ্গে আপস না করে এর জবাবদিহি নিশ্চিতের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

- **সংসদে প্রতিবেদন জমা দেওয়া:** আইন অনুসারে, দুদককে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি এই প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের সামনে পেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। এই প্রক্রিয়া সংসদকে তদারকির ক্ষমতা দেয়, যা তাদের দুদকের কর্মক্ষমতা যাচাই, এর চ্যালেঞ্জ মূল্যায়ন এবং জনগণের কাছে একে জবাবদিহি করার সুযোগ করে দেয়।
- **কমিশনারদের নিয়োগ:** দুদক কমিশনারদের নিয়োগও সংসদের প্রভাবের সঙ্গে জড়িত। যদিও রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত নিয়োগ দেন, সাধারণত একটি বাছাই কমিটি এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এমন ব্যক্তিরা থাকেন। তবে প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট স্বচ্ছ না হওয়া এবং রাজনৈতিক বিবেচনা দ্বারা নিয়োগকে প্রভাবিত করার জন্য সমালোচিত হয়েছে।

- **সংসদের ক্ষমতা:** সংসদে দুদকের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষমতা রয়েছে, যা নীতি পরিবর্তন বা আইন প্রণয়নের সংস্কারের জন্য সুপারিশ তৈরি করতে পারে। সংসদের নতুন আইন পাস করার বা বিদ্যমান আইনগুলোকে সংশোধন করারও ক্ষমতা রয়েছে, যা দুদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে, যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন নিজেই।

**বাস্তবতা: রাজনৈতিক প্রভাব ও সদিচ্ছার অভাব**

স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক দুদকের জন্য আইনি বিধান আছে বটে, কিন্তু মাঠের চিত্রটা প্রায়ই অন্য রকম। দুদক ও সংসদের সম্পর্ক প্রায়ই রাজনৈতিক চাপের কারণে প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।

- **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** সমালোচকরা বলেন, দুদকের ক্ষমতা প্রায়ই সীমিত থাকে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বেড়াজালে, বিশেষ করে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বা সরকারি কর্মকর্তাদের তদন্তের ক্ষেত্রে। অভিযোগটা আছে, দুদক মূলত রাজনৈতিক বিরোধীদেরই টার্গেট করে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা প্রায়ই থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই রাজনীতিকরণের ফলে দুদকের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে গিয়ে ঠেকে, আর ভয় বা পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাও যায় কমে।
- **সীমাবদ্ধকারী সংশোধনী:** মাঝেমধ্যে সংসদ এমন সব সংশোধনী পাস করেছে, যা দুদকের কাজ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে বলে মনে করা হয়। একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮। এই আইন অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক! এই বিধান সরাসরি দুদকের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য বানানো বলে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এর ফলে আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি তদন্ত করা আরও কঠিন হয়ে যাবে।
- **দুর্বল তদারকি:** সংসদের তদারকির ভূমিকাও প্রায়ই দুর্বল বলে বিবেচিত হয়। যেসব সংসদীয় কমিটির ওপর সরকার ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে তদারকির দায়িত্ব থাকে, তাদের কার্যকারিতার অভাব নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে প্রায়ই দায়ী করা হয় 'উইনার-টেকস-অল' রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে; যেখানে ক্ষমতাসীন দলই কমিটিগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে, আর বিরোধী দলের কণ্ঠকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়। ফলে দুদকের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো প্রায়ই কোনো কঠোর বা স্বাধীন পর্যালোচনার মুখ দেখে না।

শেষ কথা হলো, দুদক ও সংসদের সম্পর্কের মধ্যে আইনি উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতার ফারাকটা চোখে পড়ার মতো। আইন স্বাধীনতা ও সংসদীয় তদারকির কথা বললেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সীমাবদ্ধকারী আইন আর দুর্বল প্রয়োগের প্রক্রিয়া; সব মিলিয়ে একটা সত্যিকারের কার্যকর ও নিরপেক্ষ দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা হিসেবে দুদকের কাজ করার ক্ষমতাকে ঐতিহাসিকভাবেই বাধাগ্রস্ত করেছে।

## দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

দেশের দুর্নীতি দমনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা হলো দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক। এর কাজ, গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জগুলো জাতির সুশাসনের প্রতি অঙ্গীকার বোঝার জন্য ভীষণ জরুরি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ, তদন্ত ও বিচারের জন্য গঠিত প্রধান প্রতিষ্ঠান হলো দুদক। এর কাজ ও তাৎপর্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **তদন্ত ও বিচার:** দুদকের সবচেয়ে দৃশ্যমান কাজ হলো দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করা। এর মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি অসদাচরণ, ঘুষ, আত্মসাৎ, অর্থ পাচার ও অন্যান্য ক্ষমতার অপব্যবহার। তদন্তে পর্যাপ্ত প্রমাণ মিললে আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করার দায়িত্ব দুদকের।
- **দুর্নীতি প্রতিরোধ:** দুদকের ভূমিকা শুধু দুর্নীতি শনাক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতেও বাধ্য তারা। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পদ্ধতিগত দুর্বলতা খুঁজে বের করা এবং সেগুলো সংস্কারের সুপারিশ করাও তাদের দায়িত্ব। সততার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচিও পরিচালনা করতে পারে সংস্থাটি।
- **গণসচেতনতা ও শিক্ষা:** দুদক প্রায়ই দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজ করে। নাগরিক, স্কুল ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ তারা গড়তে চায়, যেখানে মানুষ নিজের অধিকার নিয়ে সচেতন থাকবে এবং দুর্নীতি দেখলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করতে আগ্রহী হবে।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** বিশ্বায়িত অপরাধের এই যুগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকল্প নেই। তাই অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ উদ্ধারের মতো আন্তঃসীমান্ত দুর্নীতি মোকাবিলায় দুদক প্রায়ই আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের দুর্নীতিবিরোধী এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর মধ্যেই দুদকের আসল গুরুত্ব। একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন দুদকই সুশাসনের অন্যতম মূল ভিত্তি; আর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যও তা অপরিহার্য।

### দুর্নীতি দমন কমিশন কেন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশে; বিশেষ করে বাংলাদেশে, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারিতা বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে সীমিত।

- **রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব:** একে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দুদকের কার্যকারিতা বেশির ভাগ সময় ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সরকার যদি দুদককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে আগ্রহী না হয়; বিশেষত শক্তিশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক মিত্রদের বিরুদ্ধে তদন্তকালে; তখন এর প্রচেষ্টাগুলো বাধাগ্রস্ত হয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতা:** দুদককে প্রায়ই এমন আইনের অধীনে কাজ করতে হয়, যা হয় পুরোনো, নয়তো এর ক্ষমতা কমানোর জন্যই বানানো। যেমন বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের একটি সংশোধনীতে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বা মামলা করার জন্য সরকারের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক করা হয়েছে, যা এর স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে খর্ব করে।
- **সীমিত সম্পদ ও সক্ষমতা:** দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলো প্রায়শই পর্যাপ্ত মানব, আর্থিক ও কারিগরি সম্পদের অভাবে ভোগে। জটিল আর্থিক অপরাধের মামলা পরিচালনার জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত দক্ষ তদন্তকারী, ফরেনসিক এক্সপার্ট বা ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের অভাব থাকতে পারে।
- **স্বাধীনতার অভাব:** কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ প্রক্রিয়া প্রায়ই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়। এতে দুদক নিরপেক্ষ সংস্থা নয় বলে ধারণা তৈরি হয়। এর ফলে জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হতে পারে। একই সঙ্গে দুদককে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে লড়াইয়ের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে লক্ষ্যবস্তু করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পথ খুলে দিতে পারে।
- **অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি:** কিছু ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমনের জন্য গঠিত, সেটি নিজেই দুর্নীতির শিকার হতে পারে। দুদকের নিজস্ব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- **দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া:** দুদক যখন সফলভাবে কোনো মামলা করে, তখন বিচারিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর এবং হস্তক্ষেপের ঝুঁকিতে থাকে। এর ফলে দণ্ডদানের হার কম হয় এবং বিচারের প্রতিরোধমূলক প্রভাব কমে যায়।

### কী করা উচিত

দুদককে দুর্নীতি দমনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন–

১. **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা শক্তিশালীকরণ:** দুদককে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য আইনি কাঠামোর সংস্কার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণের জন্য স্বচ্ছ এবং অরাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা; দুদককে তার বাজেট ও জনবলের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া। সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য সরকারের অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া উচিত।

২. **সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি:** দুদকের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো এবং বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। এসবের মধ্যে রয়েছে আর্থিক ফরেনসিক, সাইবার ক্রাইম ও ডিজিটাল প্রমাণের মতো ক্ষেত্রে দক্ষতা তৈরি।

৩. **গণসম্পৃক্ততা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** দুদকের উচিত নাগরিক সমাজ, সংবাদমাধ্যম ও জনগণের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে আস্থা তৈরি করা এবং দুর্নীতির খবর দিতে উৎসাহিত করা। নিজস্ব কার্যক্রম এবং অনুসন্ধান সম্পর্কে সংস্থাটির আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিত। তাদের প্রতিবেদনও জনগণের জন্য সহজলভ্য করা উচিত।

৪. **কার্যকর ফলো-আপ নিশ্চিত করা:** এমন একটি প্রক্রিয়া থাকতে হবে, যা দুদকের সুপারিশ ও নিরীক্ষা ফলাফলগুলো সরকারি মন্ত্রণালয়গুলো দ্বারা কার্যকর করা নিশ্চিত করবে। এর জন্য সংসদীয় সরকারি হিসাব কমিটিকে আরও ক্ষমতায়ন করা বা সম্মতি কার্যকর করার ক্ষমতাসহ একটি নতুন সংস্থা তৈরি করা যেতে পারে।

৫. **সততার সংস্কৃতি গড়ে তোলা:** দুর্নীতি দমন শুধু আইন প্রয়োগের বিষয় নয়, এটি সামাজিক মানসিকতা পরিবর্তনেরও বিষয়। দুদকের উচিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সরকারি সেবার সব স্তরে নৈতিক আচরণ প্রচারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

## জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) আছে বটে, কিন্তু বাস্তবে এর কার্যকারিতা খুব কম। সংসদ যথাযথ দায়িত্ব পালন না করায় আইনি ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও একে অকার্যকর সংস্থা মনে করা হয়। এর পেছনে রয়েছে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ; যা একে সত্যিকারের স্বাধীন ও শক্তিশালী মানবাধিকার রক্ষক হয়ে উঠতে বাধা দেয়।

এনএইচআরসির অকার্যকারিতার প্রধান কারণগুলো–

মূল সমস্যাগুলো নিম্নলিখিত বিষয়ে বিভক্ত করা যেতে পারে:

- **স্বাধীনতার অভাব ও রাজনৈতিক প্রভাব:** কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। নির্বাচন কমিটি মূলত সরকারি প্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে সাধারণত এমন ব্যক্তিরা নিয়োগ পান, যাঁদেরকে রাজনৈতিকভাবে সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করা হয়। এতে কমিশনের নিরপেক্ষতা ও জনগণের আস্থা নষ্ট হয়। এনএইচআরসি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা বা দুর্বল প্রতিক্রিয়ার জন্য সমালোচিত হয়েছে, বিশেষ করে যখন এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয় জড়িত থাকে।

- **সীমিত ক্ষমতা ও আইনি সীমাবদ্ধতা:** ২০০৯ সালের এনএইচআরসি আইনে এমন কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা কমিশনকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর হতে বাধা দেয়।
  - **বাধ্যবাধকতাহীন সুপারিশ:** এনএইচআরসি শুধু সরকারের কাছে বাধ্যবাধকতাহীন সুপারিশ করতে পারে। সংস্থাটির নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকর করার বা সরকারি সংস্থাগুলোকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করার ক্ষমতা নেই। ফলে এর প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো অনেকাংশেই অকার্যকর হয়ে পড়ে।
  - **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদন্তে অক্ষমতা:** আইনের কারণে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনএইচআরসির স্বাধীনভাবে তদন্ত করার ক্ষমতা সীমিত। সংস্থাটিকে সরকারের দেওয়া প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর বেশির ভাগ সময় সেসব প্রতিবেদন তৈরি করে অভিযুক্ত সংস্থাগুলোই। এই আইনি সীমাবদ্ধতা কার্যকরভাবে অপরাধীদের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে এবং জবাবদিহিকে দুর্বল করে।
  - **আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা:** আদালতের বিচারাধীন কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই কমিশনের। ফলে নির্বিচারে আটক বা অন্যায্য বিচারের মতো সাধারণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোও সংস্থাটির আওতার বাইরে থেকে যায়।
- **অপর্যাপ্ত সম্পদ ও সক্ষমতা:** সীমিত বাজেট ও দক্ষ কর্মীর অভাব কমিশনের আরেকটি বড় সমস্যা। অর্থের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে এর স্বাধীনতা আরও খর্ব হয়। পর্যাপ্ত তদন্তকারী, আইন বিশেষজ্ঞ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের অভাবে অভিযোগ জমলেও সেগুলো ঠিকমতো তদন্ত করার সক্ষমতা রাখে না কমিশন।

- **জনগণের আস্থার সংকট:** রাজনৈতিক পক্ষপাত ও ক্ষমতা প্রয়োগে অক্ষমতার কারণে এনএইচআরসির ওপর জনগণের আস্থা কম। ভুক্তভোগী ও মানবাধিকার কর্মীরা তাই কমিশনে যেতে উৎসাহ পান না। তাঁরা মনে করেন, এখান থেকে ন্যায়বিচার বা কার্যকর কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না। জনগণের আস্থা ও সুশীল সমাজের জোরালো সম্পৃক্ততা ছাড়া মানবাধিকারের জন্য লড়ার এই মঞ্চ প্রভাবশালী ও প্রাসঙ্গিক হতে পারছে না।

**অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অবস্থান**

এসব পদ্ধতিগত সমস্যার কারণেই জাতিসংঘের স্বীকৃত সংস্থা 'গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস' (জিএএনএইচআরআই) বাংলাদেশকে ধারাবাহিকভাবে 'বি' রেটিং দিয়ে আসছে। এর অর্থ, স্বাধীনতা, বহুত্ববাদ ও কার্যকারিতার আন্তর্জাতিক মান পূরণে কমিশন কেবল আংশিকভাবে সফল হয়েছে। ফলে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে সরাসরি কথা বলার সুযোগও নেই সংস্থাটির।

এককথায়, বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাগজে-কলমে থাকলেও ত্রুটিপূর্ণ আইনি কাঠামো, রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বাধীনতার অভাবে সংস্থাটির কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমালোচকদের ভাষায়, সংস্থাটি এখন 'নখদন্তহীন ব্যাঘ্র' মাত্র।

## রাজনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, সংবিধান, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

রাজনৈতিক সাংবাদিকতার পরিধি, মূল উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে ভাবতে গেলেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এই কাজের জন্য বেশ কিছু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা অপরিহার্য। সংবিধান, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভূ-রাজনীতি– এমন অনেক বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা যেমন দরকার, তেমনি এগুলোর সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলো সম্পর্কেও জানতে হয়। যার বিষয়জ্ঞান যত পরিষ্কার, তিনি তত সহজে একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নিত্যনতুন প্রতিবেদনের ধারণা খুঁজে পাবেন।

এই বইয়ে নানা বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আরও বিস্তারিত জানার জন্য নিয়মিত পড়াশোনার বিকল্প নেই। চলুন, এবার সে রকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

মনে রাখতে হবে, নির্ভুল, ন্যায্য এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিবেদন একটি সুস্থ গণতন্ত্র ও শিক্ষিত নাগরিক সমাজ গড়ার জন্য অপরিহার্য।

## রাজনীতি কী

রাজনীতি হলো এমন কিছু কার্যকলাপের সমষ্টি, যেগুলোর মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিংবা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ক্ষমতা, সম্পদ বা মর্যাদার মতো বিষয়গুলো বণ্টন করা হয়। এটি মূলত শাসনব্যবস্থা, নেতৃত্ব এবং একটি রাষ্ট্র বা সংস্থার ভেতরে ক্ষমতা অর্জনের লড়াইকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

রাজনীতির কয়েকটি বিখ্যাত সংজ্ঞা বা দৃষ্টিভঙ্গি নিচে দেওয়া হলো।

- **ডেভিড ইস্টন:** 'রাজনীতি হলো সমাজের জন্য মূল্যবান বিষয়গুলোর কর্তৃত্বপূর্ণ বণ্টন।' অর্থাৎ কে কী পাবে, কখন পাবে এবং কীভাবে পাবে; সেই সিদ্ধান্তগুলোই রাজনীতির মূল বিষয় এবং এই সিদ্ধান্তগুলো সমাজের সবার জন্য বাধ্যতামূলক।
- **হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল:** 'কে কী পায়, কখন পায়, কীভাবে পায়।' এই হলো তার সংক্ষিপ্ত ও বহুল উদ্ধৃত সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা সম্পদ ও ক্ষমতার বণ্টনের ওপর জোর দেয়।
- **ম্যাক্স ওয়েবার:** 'ক্ষমতা ভাগাভাগি করা বা ক্ষমতার বণ্টনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টাই হলো রাজনীতি; তা সে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হোক বা একটি রাষ্ট্রের ভেতরে থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেই হোক।' ওয়েবারের চোখে, ক্ষমতাই হলো রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু।
- **অ্যারিস্টটল:** 'মানুষ স্বভাবগতভাবেই একটি রাজনৈতিক জীব।' এই প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের বিশ্বাস ছিল, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই একটি নগররাষ্ট্রে (পলিস) বাস করতে এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশ নিতে আগ্রহী। কারণ, এটি মানুষের বিকাশের জন্য অপরিহার্য।
- **বার্নার্ড ক্রিক:** 'রাজনীতি হলো বিভক্ত সমাজে অতিরিক্ত সহিংসতা এড়িয়ে শাসনকার্য পরিচালনার একটি উপায়।' ক্রিক জোর দিয়েছেন, রাজনীতি হলো আলাপ-আলোচনা ও আপসের মাধ্যমে সংঘাত মেটানো এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদ্ধতি, বলপ্রয়োগের নয়।

## রাজনৈতিক ক্ষমতা কী

রাজনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি মৌলিক ধারণা। সরকার ও সমাজের প্রেক্ষাপটে, এটি মূলত অন্যদের কাজ, বিশ্বাস বা আচরণকে প্রভাবিত কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। স্রেফ পাশবিক শক্তি খাটানো নয়, বরং প্রভাব বিস্তারের নানা কৌশল এর অন্তর্ভুক্ত।

রাজনৈতিক ক্ষমতার কয়েকটি মূল দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

### প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ

এর মূলকথা হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দিয়ে এমন কিছু করানো যায়, যা তারা হয়তো স্বেচ্ছায় করত না; অথবা তারা যা করতে চায়, সেটি থেকে তাদের বিরত রাখা যায়। সরাসরি আদেশ দিয়ে, আলোচনার মাধ্যমে রাজি করিয়ে, কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশকে নিজেদের অনুকূলে এনেও এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

### কর্তৃত্ব ও বৈধতা

- কর্তৃত্ব হলো এমন এক ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা, যা বৈধ হিসেবে স্বীকৃত। ক্ষমতার পেছনে যখন কর্তৃত্ব থাকে, তখন মানুষ সেটিকে সঠিক বলে মেনে নেয় এবং বিশ্বাস, নিয়ম বা আইনের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় তা মেনে চলে (যেমন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব)।
- ক্ষমতা অনেক সময় বৈধতা ছাড়াই প্রয়োগ করা হতে পারে (যেমন একদল হিংস্র জনতা বা একজন স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতা)। একদল হিংস্র জনতার ক্ষমতা থাকলেও তার কোনো কর্তৃত্ব থাকে না।

### রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস

**রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন উৎস থেকে আসতে পারে:**

- **আনুষ্ঠানিক পদ:** নির্দিষ্ট সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আইনি ক্ষমতা (যেমন প্রধানমন্ত্রী, বিচারক)।
- **অর্থনৈতিক সম্পদ:** সম্পদ ও অর্থ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা যায় (যেমন লবিং, নির্বাচনী অনুদান)।
- **সামরিক শক্তি:** বলপ্রয়োগের ক্ষমতা, বা তার হুমকি, ক্ষমতার একটি শক্তিশালী রূপ।
- **তথ্য ও জ্ঞান:** কোনো বিশেষ তথ্য বা দক্ষতার ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতাবান করে তুলতে পারে।
- **ব্যক্তিগত আকর্ষণ:** একজন নেতার ব্যক্তিগত আবেদন ও মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁকে ক্ষমতাশালী করে তোলে।
- **সামাজিক আন্দোলন ও সম্মিলিত উদ্যোগ:** সাধারণ নাগরিকেরা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ, সক্রিয় সমর্থন (advocacy) এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে।
- **মতাদর্শ ও সংস্কৃতি:** একটি সমাজে প্রচলিত ধারণা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু সূক্ষ্ম রূপ।

**ক্ষমতার বিভিন্ন মাত্রা (স্টিভেন লুকসের মতো তাত্ত্বিকদের ধারণা অনুসারে)**

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (প্রথম দিক):** এটি ক্ষমতার সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ। যেমন সরাসরি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা, ভোটে জেতা বা কোনো প্রস্তাব পাস করিয়ে নেওয়া।
- **অ-সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (দ্বিতীয় দিক):** কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে আলোচনার টেবিলে বা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় আসতেই না দেওয়ার ক্ষমতা। এর মাধ্যমে কী নিয়ে আলোচনা করা বৈধ, তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- **মতাদর্শিক ক্ষমতা (তৃতীয় দিক):** এটি ক্ষমতার সবচেয়ে সূক্ষ্ম রূপ। এই ক্ষমতা মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা এবং বাস্তবতার বোধকে এমনভাবে বদলে দেয় যে তারা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বা অনিবার্য বলে মেনে নিতে শুরু করে। শিক্ষা, সংবাদমাধ্যম বা সাংস্কৃতিক ভাষ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রায়শই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।

### সর্বব্যাপী উপস্থিতি

রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু আনুষ্ঠানিক সরকারি কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন সামাজিক সম্পর্ক, মতাদর্শ ও কর্মের মধ্যেও এটি বিস্তৃত।

এককথায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো সমাজে ঘটনার গতিপথকে আকার দেওয়ার ক্ষমতা, তা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মতো প্রকাশ্য উপায়ে হোক কিংবা জনমত ও সামাজিক রীতিনীতির ওপর আরও সূক্ষ্ম প্রভাবের মাধ্যমে হোক। গতিশীল ও জটিল এই ধারণা প্রতিনিয়ত প্রয়োগ, চ্যালেঞ্জ ও পুনর্নির্ধারিত হচ্ছে।

### ক্ষমতা ও প্রভাবের পার্থক্য

ক্ষমতা আর প্রভাব; এই দুটো শব্দকে আমরা প্রতিদিনের কথাবার্তায় প্রায়ই এক করে ফেলি। কিন্তু রাজনীতি, নেতৃত্ব বা সামাজিক সম্পর্কের গভীরে গেলে বোঝা যায়, এই 'ক্ষমতা' ও 'প্রভাবের' মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। একজন নেতা বা যেকোনো সাধারণ মানুষের জন্যও এই পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পার্থক্যটি একটু সহজ করে বুঝে নেওয়া যাক।

#### ক্ষমতা

সহজ কথায়, ক্ষমতা হলো অন্যকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য। এমনকি সেই ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকলেও তাকে দিয়ে কাজটি করানো যায়। ক্ষমতা যার হাতে থাকে, তার নির্দেশ দেওয়ার বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার একটা বৈধ অধিকারও তৈরি হয়।

**ক্ষমতার প্রধান বৈশিষ্ট্য**

- **জোরপূর্বক/বাধ্যতামূলক:** ক্ষমতার মূল ভিত্তি হলো পুরস্কারের লোভ বা শাস্তির ভয়। মানুষ কোনো নির্দেশ মানে, কারণ তা মানতে সে বাধ্য; স্বেচ্ছায় বা খুশি মনে নয়।
- **অবস্থানগত/আনুষ্ঠানিক:** ক্ষমতা সাধারণত পদের সঙ্গে জড়িত থাকে। যেমন একজন ম্যানেজার, সরকারি কর্মকর্তা বা সামরিক কমান্ডারের ক্ষমতা আসে তাঁদের পদ থেকে। পদ যত বড়, ক্ষমতাও তত বেশি।
- **পদক্রমিক:** ক্ষমতার প্রবাহ সব সময় ওপর থেকে নিচের দিকে। অর্থাৎ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর অধস্তনদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
- **তাৎক্ষণিক ফল:** ক্ষমতা দিয়ে খুব দ্রুত সম্মতি ও কাজ আদায় করা যায়। বিশেষ করে যেখানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া বা কঠোর আনুগত্যের প্রয়োজন, সেখানে ক্ষমতা খুব কার্যকর।
- **সম্মতি তৈরি করে:** ক্ষমতার প্রাথমিক ফলাফল হলো সম্মতি। লোকে নির্দেশ অনুসরণ করে, কিন্তু তাদের মনোভাব বা প্রতিশ্রুতি না-ও পরিবর্তিত হতে পারে। এর ফলে বিরক্তি, প্রতিরোধ বা 'নীরব পদত্যাগ' হতে পারে।
- **সীমাবদ্ধ/শূন্য-যোগফল:** ক্ষমতাকে একটা সীমাবদ্ধ সম্পদের মতো দেখা যেতে পারে। একজনের ক্ষমতা বাড়লে অন্যের ক্ষমতা কমে।

**ক্ষমতার উদাহরণ**

- একজন বস তাঁর কর্মীকে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বলেন এবং না করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন।
- সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং পুলিশ বাহিনী দিয়ে তা কার্যকর করে।
- একজন সামরিক জেনারেল তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

## প্রভাব (Influence)

সংজ্ঞা: প্রভাব হলো অন্যদেরকে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করার, তাদের বিশ্বাস বা মনোভাব বদলাতে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করার ক্ষমতা। এখানে জোর খাটানোর ব্যাপার নেই, বরং সূক্ষ্মভাবে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কোনো কাজের জন্য স্বেচ্ছায় রাজি করানো হয়।

**প্রভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য**

- **স্বেচ্ছামূলক/প্ররোচিত:** মানুষ যখন কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন তারা নিজের ইচ্ছাতেই কাজটা করে। কারণ, তারা কাজের উদ্দেশ্য বা মূল্যের সঙ্গে একমত হয়, অনুপ্রাণিত হয়। মানুষ মেনে চলে; কারণ, তারা মানতে চায়।
- **ব্যক্তিগত/অনানুষ্ঠানিক:** প্রভাব পদের ওপর নির্ভর করে না। এটি আসে ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, ক্যারিশমা, বিশ্বাসযোগ্যতা, শক্তিশালী সম্পর্ক বা ট্র্যাক রেকর্ড থেকে। একজন সাধারণ কর্মীরও তাঁর বসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকতে পারে।
- **অ-পদক্রমিক:** প্রভাব খাটানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদের দরকার হয় না। যে কেউ, যেকোনো স্তরে থেকে, অন্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একজন কনিষ্ঠ কর্মী, যার দুর্দান্ত ধারণা আছে, সে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করতে পারে।
- **দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা:** প্রভাবের মাধ্যমে যে কাজ হয়, তাতে মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ থাকে। তাই এর ফলাফল হয় টেকসই এবং অনেক বেশি ইতিবাচক।
- **প্রতিশ্রুতি তৈরি:** প্রভাব মানুষের মনে বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি তৈরি করে। মানুষ তখন শুধু কাজ করে না, কাজটাকে নিজের মনে করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত হয়।
- **সম্প্রসারণযোগ্য/অ-শূন্য-যোগফল:** প্রভাব ভাগ করে নিলে বাড়ে, কমে না। একজন মানুষ অন্যকে যত বেশি অনুপ্রাণিত করে, তার প্রভাব তত বাড়ে।

**প্রভাবের উদাহরণ**

- একজন প্রকল্প নেতা তাঁর দলকে একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং এর সুফলগুলো বুঝিয়ে অতিরিক্ত কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন।
- একজন সম্মানিত সম্প্রদায়ের নেতা তাঁর কাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে নতুন করে পরিবেশ সচেতন হতে উৎসাহিত করেন।

- একজন বিশেষজ্ঞ তাঁর তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সহকর্মীদের একটি নতুন কৌশল গ্রহণে রাজি করান।

**উপমা: হাতুড়ি বনাম চুম্বক**

- পার্থক্য বোঝাতে একটি সাধারণ উপমা ব্যবহৃত হয়।
- ক্ষমতা হাতুড়ির মতো: আপনি হাতুড়ি দিয়ে কিছুতে আঘাত করলে তা নড়তে বাধ্য। এটি সরাসরি, জোরদার এবং তাৎক্ষণিক ফল দেয়।
- প্রভাব হলো চুম্বকের মতো: চুম্বক কোনো কিছুকে জোর করে না, বরং নিজের দিকে আকর্ষণ করে। আপনিও তেমনি নিজের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করেন। এটি অনেক সূক্ষ্ম, সম্পর্ক তৈরি করে এবং স্বেচ্ছায় কাছে আসতে উৎসাহিত করে।

**ক্ষমতা ও বলের মধ্যে পার্থক্য**

'ক্ষমতা' ও 'বল'; এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোন প্রেক্ষাপটে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ওপর এর অর্থ অনেকটাই নির্ভর করে। যেমন পদার্থবিজ্ঞানে এর যা অর্থ, সমাজবিজ্ঞান বা রাজনীতিতে তা অনেকটাই ভিন্ন।

আসুন, দুটি ক্ষেত্রের পার্থক্যগুলো আলাদাভাবে দেখি।

**সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে**

সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতিতে এই দুটি ধারণার পার্থক্য আরও সূক্ষ্ম। এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো জোরপূর্বক প্রয়োগ (Coercion) এবং বৈধতা (Legitimacy)।

**ক্ষমতা** (Power)

- **সংজ্ঞা:** ক্ষমতা হলো অন্যদের কাজ, বিশ্বাস বা আচরণকে; প্রয়োজনে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও; প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য বা সম্ভাবনা। এটি একটি বিস্তৃত ধারণা, যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেতে পারে।
- **প্রকৃতি:** ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক হতে পারে (যেমন প্রধানমন্ত্রীর আইনি কর্তৃত্ব), অনানুষ্ঠানিকও হতে পারে (যেমন ক্যারিশমা)। এটি কাঠামোগত (যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) বা মতাদর্শিকও হতে পারে। মোদ্দাকথা হলো, ক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।
- **প্রয়োগের কৌশল:** ক্ষমতা নানা উপায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন:
  - বলপ্রয়োগ: সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করা।
  - প্রভাব: অনুপ্রেরণা, যুক্তি বা ব্যক্তিগত গুণাবলি দিয়ে প্রভাবিত করা।
  - কর্তৃত্ব: নির্দেশ দেওয়ার বৈধ অধিকার।
  - পুরস্কার বা নিষেধাজ্ঞা: আর্থিক সহায়তা দেওয়া বা কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।
  - বিশ্বাস গঠন: মানুষের মনে নতুন নিয়ম বা ধারণা তৈরি করা (সফট পাওয়ার)।
- **দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যাপক:** ক্ষমতা একটি দীর্ঘমেয়াদি, ব্যাপক ও কৌশলগত ধারণা, যা সময়ের সঙ্গে কোনো ঘটনার গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করার সামগ্রিক সামর্থ্যকে বোঝায়।

**বলপ্রয়োগ/শক্তি** (Force)

- **সংজ্ঞা:** রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, বলপ্রয়োগ হলো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সরাসরি শারীরিক শক্তি বা জবরদস্তির ব্যবহার। প্রতিরোধ দমনের জন্য যখন সামরিক বাহিনী, পুলিশ বা সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া হয়, তখন তাকে বলপ্রয়োগ বলে।
- **প্রকৃতি:** এটি প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক এবং প্রায়শই শারীরিক আঘাত বা সরাসরি হুমকির সঙ্গে জড়িত। এটি আসলে ক্ষমতারই একটি প্রয়োগ কৌশল বা হাতিয়ার।
- **প্রয়োগের প্রক্রিয়া:** শারীরিক শক্তি, ভয় বা সহিংসতার মাধ্যমে সরাসরি সম্মতি আদায়ে বাধ্য করা হয়।
- **বিস্তৃতি:** বলপ্রয়োগ সাধারণত তাৎক্ষণিক কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ক্ষমতার বিশাল ধারণার তুলনায় একটি সংকীর্ণ ও কৌশলগত ধারণা। অনেক রাজনৈতিক নেতার কাছেই এটি 'শেষ অবলম্বন'।

**সমাজবিজ্ঞান/রাজনীতিতে মূল পার্থক্য**

- ক্ষমতা হলো কোনো কাজ সম্পন্ন করিয়ে নেওয়ার সামগ্রিক সামর্থ্য বা সম্ভাবনা, যা নানা উপায়ে প্রয়োগ করা যায়। এটি একটি ব্যাপক ধারণা।
- বলপ্রয়োগ হলো সেই ক্ষমতারই একটি নির্দিষ্ট হাতিয়ার বা পদ্ধতি, যেখানে সরাসরি শারীরিক বা জবরদস্তিমূলক শক্তি ব্যবহার করা হয়।

**সমাজবিজ্ঞানের জন্য উপমা**

- ক্ষমতা হলো একটি পরিপূর্ণ অস্ত্রভান্ডারের মতো। সেখানে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র (বলপ্রয়োগ, প্রভাব, অর্থনৈতিক সরঞ্জাম, কূটনৈতিক দক্ষতা ইত্যাদি অর্থ) সাজানো থাকে।
- বলপ্রয়োগ হলো সেই অস্ত্রভান্ডারের একটি নির্দিষ্ট অস্ত্র; ধরা যাক, একটি বিশাল হাতুড়ি বা বন্দুক। এই অস্ত্র খুব শক্তিশালী এবং সরাসরি কাজ করে, কিন্তু এটিই একমাত্র হাতিয়ার নয়। দীর্ঘ মেয়াদে এটি সব সময় সবচেয়ে কার্যকর না-ও হতে পারে।

সংক্ষেপে বললে, পদার্থবিজ্ঞানে 'বল' হলো কোনো বস্তুকে ধাক্কা বা টান দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা, আর 'ক্ষমতা' হলো কাজের হার। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানে 'বলপ্রয়োগ' হলো সরাসরি জবরদস্তি, প্রায়শই শারীরিক; কিন্তু 'ক্ষমতা' হলো কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের ব্যাপক ও সামগ্রিক সামর্থ্য; যেখানে বলপ্রয়োগ ক্ষমতার অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে মাত্র একটি।

**ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা এবং অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা**

সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতির আলোচনায় প্রায়ই দুটো ধারণা সামনে আসে; ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা (Usable Power) ও অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা (Unusable Power)। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা খুব জরুরি। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, কেন বিপুল তাত্ত্বিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অনেক সময় কোনো দেশ বা সংস্থা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। আসল কথা হলো, শুধু ক্ষমতা থাকলেই চলে না, সেই ক্ষমতা ঠিকঠাকমতো ব্যবহার করা যাচ্ছে কি না, সেটাই মূল বিষয়।

**ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা**

ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সেই সামর্থ্য, যা দিয়ে বাস্তবসম্মত, আনুপাতিক এবং রাজনৈতিকভাবে কার্যকর উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা যায়। এটি এমন ক্ষমতা, যা প্রয়োগ করলে কোনো অগ্রহণযোগ্য ক্ষতি বা উল্টো বিপদের ঝুঁকি থাকে না।

**ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য**

- **লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ:** ক্ষমতার প্রয়োগের কৌশলগুলো লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। যেমন একটি বাদাম ভাঙার জন্য নিশ্চয় কেউ হাতুড়ি ব্যবহার করবে না। ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতাও ঠিক তেমনই, ছোট কাজের জন্য ছোট আর বড় কাজের জন্য বড় হাতিয়ার ব্যবহার করে।
- **বাস্তবসম্মত প্রয়োগ:** এই ক্ষমতা শুধু কাগজে-কলমে নয়, বরং বাস্তব জগতে প্রয়োগ করা সম্ভব। এর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কার্যকর পথ খোলা থাকে।
- **গ্রহণযোগ্য ব্যয়:** ক্ষমতা ব্যবহারের কিছু খরচ থাকে; আর্থিক, মানবিক, সুনামগত, রাজনৈতিক বা নৈতিক দিক দিয়ে। এই খরচ যদি সুবিধাগুলোর তুলনায় সহনীয় পর্যায়ে থাকে, তবেই সেই ক্ষমতা ব্যবহারযোগ্য।
- **সীমিত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া:** এর প্রয়োগের ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার বা আত্মঘাতী হয়ে ওঠার আশঙ্কা কম থাকে।
- **প্রচলিত ও নমনীয়:** সাধারণত প্রচলিত সামরিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক চাপ বা সফট পাওয়ারের মতো বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয়তা নেওয়া যায়।
- **বৈধতা (প্রায়শই):** যে ক্ষমতাকে মানুষ নৈতিক বা আইনগতভাবে সঠিক বলে মনে করে, তা ব্যবহার করা সহজ হয়। কারণ, এতে সাধারণ মানুষের সম্মতি থাকে এবং দেশে-বিদেশে প্রতিরোধ কম হয়।

**ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতার উদাহরণ**

- **অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা:** একটি দেশ অন্য দেশকে কোনো নির্দিষ্ট নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করার জন্য তার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর খরচ তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং ফলাফল অনেকটাই অনুমানযোগ্য।

- **কূটনৈতিক চাপ:** কোনো সংঘাত নিরসনে বিভিন্ন দেশ মিলে শক্তিশালী কূটনৈতিক বিবৃতি দেওয়া বা আলোচনার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা।
- **প্রচলিত সামরিক পদক্ষেপ:** একটি সুনির্দিষ্ট ও সীমিত লক্ষ্য পূরণের জন্য ছোট আকারের সামরিক হামলা চালানো, যেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি কম বলে মনে করা হয়।
- **সফট পাওয়ার:** একটি জাতির সাংস্কৃতিক আকর্ষণ, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যদেরকে বাধ্য না করে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করতে সাহায্য করে।

### অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা

অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা হলো এমন এক ধরনের শক্তি, যা পরিমাণে অসীম হলেও বাস্তবে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। কারণ, তা ব্যবহার করলে পরিণতি এতটাই ভয়াবহ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা আত্মঘাতী হতে পারে যে কোনো রাজনৈতিক লাভই তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। সোজা কথায়, এই ক্ষমতা ব্যবহার করাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল।

### অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

- **বিপর্যয়মূলক পরিণতি:** এর ব্যবহারের ফল হতে পারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, পরিবেশ বিপর্যয় বা বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা। সম্ভাব্য যেকোনো রাজনৈতিক লাভের চেয়ে এই ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।
- **লক্ষ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ:** ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এতটাই বিশাল যে একে সাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োগ করা অযৌক্তিক হয়ে ওঠে।
- **পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংস:** পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে এই ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। এখানে এক পক্ষ হামলা চালালে অপর পক্ষের পাল্টা আক্রমণে দুই পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে এই অস্ত্রগুলো প্রতিপক্ষকে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত রাখা (Deterrence) ছাড়া আর কোনো কাজে ব্যবহারযোগ্য থাকে না।
- **নিয়ন্ত্রণের অভাব/উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকি:** এটি ব্যবহার করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি এতটাই বেশি থাকে যে, তা সবার জন্য অস্তিত্বের সংকট তৈরি করতে পারে।
- **নৈতিক সীমাবদ্ধতা:** এই ধরনের ক্ষমতার ব্যবহার মৌলিক আন্তর্জাতিক নিয়ম বা নৈতিক নীতি লঙ্ঘন করতে পারে, ফলে ভাবমূর্তির গুরুতর সুনামগত ক্ষতি ও বৈশ্বিক নিন্দা হতে পারে।
- **মূলত নিবারক:** এই ক্ষমতার প্রধান উপযোগিতা প্রয়োগের মধ্যে নয়, বরং এর অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। শুধু ব্যবহারের হুমকি দিয়েই প্রতিপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করা হয়।

### অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতার উদাহরণ

- **পারমাণবিক অস্ত্র:** এটি অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যদিও একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের হাতে বিপুল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা থাকে, কিন্তু পুরোদমে যুদ্ধ বেধে গেলে তা ব্যবহার করলে আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত– উভয় পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই দেশগুলোকে নিবৃত্ত রাখা ছাড়া পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে এগুলো কার্যত 'অব্যবহারযোগ্য'।
- **ব্যাপক রাসায়নিক বা জৈবিক অস্ত্রের ভান্ডার:** পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই এগুলো দিয়ে ব্যাপক ও নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ চালানো সম্ভব। কিন্তু এর সম্ভাব্য পাল্টা জবাব ও বৈশ্বিক ক্ষোভের কারণে বড় পরিসরে এর প্রয়োগ রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব ও নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।
- **দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিপুল প্রচলিত শক্তি:** ধরা যাক, একটি বিশাল সামরিক শক্তিধর দেশ প্রযুক্তিগতভাবে একটি ছোট দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু এর ফলে যে পরিমাণ বেসামরিক প্রাণহানি হবে, বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সেই দেশ দখলের খরচ যা দাঁড়াবে, তাতে ওই বিপুল 'ক্ষমতা' একটি ছোট ও নির্দিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য ছাড়া আর সব কাজেই কার্যত অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে।

### ক্ষমতার এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা

অব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা আমাদের এক জটিল প্যারাডক্সের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, বিশেষ করে আজকের পারমাণবিক যুগে। সেটি হলো; সামরিক শক্তি বাড়লেই যে ব্যবহারযোগ্য রাজনৈতিক ক্ষমতাও বাড়বে, এমন কোনো কথা নেই। ধরা যাক, একটি দেশের হাজার হাজার পারমাণবিক বোমা আছে, আরেকটি দেশের আছে মাত্র অল্প কিছু। ধ্বংস করার ক্ষমতার দিক থেকে প্রথম দেশটি নিঃসন্দেহে অনেক এগিয়ে। কিন্তু রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করতে করতে গেলে পাল্টা আক্রমণে তার নিজেরই

ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। একমাত্র নিজের অস্তিত্বের সংকট তৈরি না হলে এই বিপুল ক্ষমতা ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। এর মানে দাঁড়ায়, কিছু ক্ষমতা আছে, যা হাতে থাকাই তার ব্যবহারের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝতে হলে এই পার্থক্যটা জানা খুব জরুরি। এ কারণেই আমরা দেখি, ধ্বংসের বিপুল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেশগুলো প্রায়ই সেই পথে না হেঁটে অপেক্ষাকৃত কম ধ্বংসাত্মক কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ও সূক্ষ্ম ক্ষমতার কৌশল বেছে নেয়।

### বৈধ বনাম অবৈধ ক্ষমতা

সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দুই ধরনের ক্ষমতা দেখতে পাই; বৈধ ও অবৈধ। শাসন, স্থিতিশীলতা ও জনসমর্থন বোঝার জন্য এ দুটোর পার্থক্য বোঝা অপরিহার্য। মানুষ কেন শাসকের কথা শোনে, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, তারা কেন মানছে।

### বৈধ ক্ষমতা (Legitimate Power)

বৈধ ক্ষমতাকে প্রায়ই 'কর্তৃত্ব' বলা হয়। এটা এমন এক ক্ষমতা, যাকে জনগণ সঠিক, ন্যায্য ও যথাযথ বলে মনে করে। মানুষ এই ক্ষমতার প্রতি অনুগত থাকে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, তাঁর এই কাজ করার অধিকার আছে। এই অধিকার আসতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, ঐতিহ্য বা সামাজিক মূল্যবোধ থেকে। এখানে জোর-জবরদস্তির চেয়ে সম্মতি ও গ্রহণযোগ্যতাই হলো মূল ভিত্তি।

#### বৈধ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

- সম্মতি ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর গঠিত: এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা মেনে নেয়; কারণ, তারা ক্ষমতাধারীর অধিকারকে স্বীকার করে।
- স্বীকৃত উৎস থেকে উদ্ভূত: এর উৎস মূলত তিন ধরনের হতে পারে:
  - ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব: দীর্ঘদিনের প্রথা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস ধরে চলে আসছে। যেমন: রাজতন্ত্র বা কোনো গোষ্ঠীর প্রধান।
  - আইনভিত্তিক কর্তৃত্ব: প্রতিষ্ঠিত আইন, নিয়মকানুন ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিক পদের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত। যেমন: গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকার, বিচারক, পুলিশ কর্মকর্তা। আধুনিক সমাজে এটাই ক্ষমতার প্রধান রূপ।
  - ব্যক্তিগত ক্যারিশমা: কোনো নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আকর্ষণ বা আদর্শ অন্যদের অনুপ্রাণিত করে এবং ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন: কোনো বিপ্লবী নেতা বা ধর্মগুরু।
- **স্থিতিশীল ও টেকসই:** যেহেতু এই ক্ষমতা সম্মতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাই এটি অনেক বেশি স্থিতিশীল ও টেকসই হয়। যে শাসনকে মানুষ বৈধ মনে করে, তার বিরুদ্ধে সহজে বিদ্রোহ হয় না।
- **সাশ্রয়ী:** এই ধরনের শাসনে সরাসরি বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তির প্রয়োজন কম হয়। ফলে শাসন পরিচালনা করা আরও কার্যকর, সহজ ও সাশ্রয়ী হয়।
- **শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা প্রচার:** ক্ষমতা যখন বৈধতা পায়, তখন সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি হয় এবং নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে।
- **'কর্তৃত্ব'-এর সমার্থক:** 'কর্তৃত্ব' শব্দটি বৈধ ক্ষমতার সবচেয়ে কাছাকাছি একটি ধারণা, যা মূলত নির্দেশ দেওয়ার স্বীকৃত অধিকারকেই বোঝায়।

#### বৈধ ক্ষমতার উদাহরণ

- **গণতান্ত্রিক সরকার:** যখন জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকার কোনো আইন তৈরি করে, তখন নাগরিকেরা সাধারণত তা মেনে চলে। কারণ, তারা নিজেরাই ভোট দিয়ে সেই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে অথবা পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটার ওপর তাদের আস্থা রয়েছে।
- **আদালতের রায়:** বিচারক যখন কোনো রায় দেন, মানুষ তা মেনে নেয়। কারণ, তারা বিচারব্যবস্থার আইনি কর্তৃত্বকে স্বীকার করে।
- **প্রতিষ্ঠানের প্রধান:** একটি কোম্পানির সিইও যখন কোনো কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেন, কর্মীরা তা অনুসরণ করেন। কারণ, তারা কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সিইওর আনুষ্ঠানিক পদ ও কর্তৃত্বকে সম্মান করে।
- **ট্রাফিক পুলিশ:** রাস্তায় একজন পুলিশ কর্মকর্তা যখন গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন, চালকেরা তা মেনে চলেন। কারণ, ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করার আইনি কর্তৃত্ব যে তাঁর আছে, সেটা সবাই স্বীকার করে।

### অবৈধ ক্ষমতা: যখন ভিত্তি হয় ভয়

অবৈধ ক্ষমতা জবরদস্তি নামেও পরিচিত। এই ক্ষমতা যাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাদের কোনো রকম সম্মতি, সমর্থন বা অনুমতি নেওয়া হয় না। মানুষ যখন এই ধরনের ক্ষমতাকে মেনে নেয়, তার কারণ, শাসকের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নয়; বরং এর পেছনে থাকে শাস্তি পাওয়ার ভয়, প্রয়োজন বা বিকল্প না থাকা।

### অবৈধ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

- **ভিত্তি হলো ভয়:** এই ক্ষমতার মূল ভিত্তিই হলো পাশবিক শক্তি, হুমকি আর সহিংসতার ভয়। মানুষ ভয়ে ও বাধ্য হয়ে শাসিত হয়, মেনে চলে; স্বেচ্ছায় নয়।
- **সম্মতির বা গ্রহণযোগ্যতার অভাব:** যাদের ওপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তারা বিশ্বাস করে না যে শাসকের শাসন করার কোনো নৈতিক বা আইনি অধিকার আছে।
- **ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল:** এই ক্ষমতা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও সহজাতভাবে অস্থিতিশীল। যেহেতু জনগণের সমর্থন থাকে না, তাই প্রতিনিয়ত প্রতিরোধ, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ভয় লেগেই থাকে।
- **ব্যয়বহুল:** ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন হয়। কারণ, ভিন্নমত দমন করতে এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশাল সামরিক বা পুলিশি বাহিনী এবং গোয়েন্দা নজরদারি প্রয়োজন হয়।
- **ক্ষোভ ও প্রতিরোধের জন্ম দেয়:** এই শাসন মানুষের মনে ক্ষোভ, বিরোধিতা আর ক্ষমতাধারীকে উৎখাত করার আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়।
- **'জবরদস্তি'র সমার্থক:** অবৈধ ক্ষমতা মানেই জোর করে সম্মতি আদায় করা, যা স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত।

### অবৈধ ক্ষমতার উদাহরণ

- সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী কোনো সামরিক জান্তা। তাদের শাসন টিকে থাকে বন্দুকের নলের জোরে, জনগণের সম্মতির মাধ্যমে নয়।
- কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যখন সহিংসতা ও হুমকির মাধ্যমে মুক্তিপণ বা তাদের আদর্শ মেনে চলার দাবি করে।
- একজন স্বৈরাচারী শাসক, যিনি জনগণের ম্যান্ডেটে নয়, বরং দমন-পীড়ন, নজরদারি ও ভিন্নমতকে দমনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকেন।
- কোনো এলাকার গ্যাং লিডার, যে ভয় দেখিয়ে বা সহিংসতার হুমকি দিয়ে স্থানীয় ব্যবসা থেকে চাঁদা আদায় করে।

**মূল পার্থক্যের সারসংক্ষেপ**

| বৈশিষ্ট্য | বৈধ ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) | অবৈধ ক্ষমতা (জবরদস্তি) |
|---|---|---|
| ভিত্তি | সম্মতি, গ্রহণযোগ্যতা, শাসন করার স্বীকৃত অধিকার | বলপ্রয়োগ, বলপ্রয়োগের হুমকি, সম্মতির অভাব |
| আনুগত্য | স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য, সঠিক শাসনের ওপর বিশ্বাস | জোরপূর্বক আনুগত্য, পরিণতির ভয় |
| স্থিতিশীলতা | অধিক স্থিতিশীল, টেকসই, দীর্ঘস্থায়ী | অস্থিতিশীল, ভঙ্গুর, প্রতিরোধের ঝুঁকিপূর্ণ |
| ব্যয় | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, কার্যকর শাসন | উচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, সম্পদ-নিবিড় |
| ফলাফল | শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, জনবিশ্বাস | বিরক্তি, বিদ্রোহ, অস্থিতিশীলতা |
| প্রাথমিক হাতিয়ার | নিয়ম, আইন, প্রতিষ্ঠান, ভাগ করা মূল্যবোধ | সহিংসতা, ভয় দেখানো, দমন-পীড়ন |

### রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা

সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক আলোচনায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হলো ক্ষমতার দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত রূপ। সমাজ কীভাবে কাজ করে, কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কীভাবে সম্পদ বিতরণ হয়, তা বিশ্লেষণের জন্য এদের পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**রাজনৈতিক ক্ষমতা** (Political Power)

রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে বোঝায় সরকার বা রাষ্ট্রের কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা। এটি মূলত একটি সমষ্টির (একটি জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি) জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ করার কর্তৃত্ব এবং জননীতিকে আকার দেওয়ার বিষয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা সাধারণত বৈধ শক্তির চর্চা এবং আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

- **উৎস:** প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিক পদ (যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, আইন প্রণেতা, বিচারক, পুলিশপ্রধান), সাংবিধানিক কাঠামো, আইন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া (গণতন্ত্রে) থেকে উদ্ভূত হয়।
- **প্রয়োগের মাধ্যম**
  - আইন প্রণয়ন: সব নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক আইন পাস করা।
  - জবরদস্তি/বাস্তবায়ন: আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর আনুগত্য নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের বৈধ শারীরিক শক্তি (পুলিশ, সামরিক বাহিনী) প্রয়োগের একচেটিয়া ক্ষমতা।
  - নীতি নির্ধারণ: নিয়মকানুন নির্ধারণ, সরকারি সম্পদ বরাদ্দ করা এবং সামাজিক কর্মসূচি তৈরি করা।
  - বিচারব্যবস্থা: আইন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করার এবং রায় দেওয়ার ক্ষমতা।
- **লক্ষ্য:** শাসন করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সম্পদ বরাদ্দ করা (কর ও ব্যয়ের মাধ্যমে), নাগরিকদের রক্ষা, সংঘাত সমাধান ও সম্মিলিত লক্ষ্য অর্জন করা।
- **প্রকৃতি:** প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে অন্য সকল প্রকার ক্ষমতার ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এটি আদেশ দিতে এবং নিষেধ করতে পারে।
- **বৈধতার সঙ্গে সম্পর্ক:** আদর্শগতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৈধতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়, যেখানে নাগরিকেরা ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হতে সম্মতি দেয়। বৈধতা ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রায়শই কেবল বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তিতে পরিণত হয়, যা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার উদাহরণ

- একটি সংসদ নতুন কর আইন প্রণয়ন করছে।
- একজন রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাহী আদেশ জারি করছেন।
- পুলিশ আইন ভঙ্গের জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করছে।
- একটি আদালত একটি সাংবিধানিক বিষয়ে রায় দিচ্ছে।

**অর্থনৈতিক ক্ষমতা**

অর্থনৈতিক ক্ষমতা হলো টাকা, সম্পদ ও বাজারের ওপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের সক্ষমতা। সোজা কথায়, যার হাতে টাকা, পুঁজি, জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি, শ্রম ও উৎপাদন ক্ষমতা আছে, সে-ই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী। এই শক্তি ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণ করে এবং অন্যদের আচরণেও প্রভাব ফেলে।

**অর্থনৈতিক ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য**

- **উৎস:** মূল উৎস হলো সম্পদ, অর্থ, পুঁজি, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি, শ্রম ও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ। বড় করপোরেশন, ধনী ব্যক্তি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পদশালী দেশগুলোই এই ক্ষমতার অধিকারী হয়।
- প্রয়োগের মাধ্যম
  - বিনিয়োগ/বিনির্মাণ: কোম্পানি পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে, তা সিদ্ধান্ত নেওয়া; এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও সুযোগ তৈরি বা ধ্বংস করা।
  - বাজার দখল: যখন কোনো একটি বা কয়েকটি বড় কোম্পানি পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তারাই পণ্যের দাম, সরবরাহ ও প্রতিযোগিতা ঠিক করে দেয়।
  - লবিং/প্রচারণা তহবিল: ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ ব্যবহার করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।
  - কর্মসংস্থান: কর্মসংস্থান দেওয়া বা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতাও একধরনের অর্থনৈতিক শক্তি, যা মানুষের জীবিকাকে প্রভাবিত করে।

- বাণিজ্য: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক বসানো বা বাণিজ্য চুক্তি করার মাধ্যমে একটি দেশ অন্য দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ছাড়া পণ্য, পরিষেবা ও বাজার প্রবেশাধিকারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- নিষেধাজ্ঞা: এটি একধরনের মিশ্র ক্ষমতা। যখন একটি দেশ তার অর্থনৈতিক শক্তিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অন্য দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তখন তাকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রয়োগ বলা হয়।

- **লক্ষ্য:** সম্পদ তৈরি, মুনাফা বাড়ানো, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তার আচরণকে প্রভাবিত করা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা।
- **প্রকৃতি:** অর্থনৈতিক ক্ষমতা সরাসরি জবরদস্তি করে না। এটি কাজ করে প্রণোদনা বা নিরুৎসাহের মাধ্যমে; সুবিধা দিয়ে বা কেড়ে নিয়ে। তবে এর পরোক্ষ প্রভাব হতে পারে মারাত্মক।
- **স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্ক:** মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে প্রায়শই স্বেচ্ছামূলক উপায়ে উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষমতা হিসেবে দেখা হয়, যা সাফল্যের পুরস্কার দেয়।

**অর্থনৈতিক ক্ষমতার উদাহরণ**

- একটি বহুজাতিক কোম্পানি কোনো দেশে নতুন কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নিল, যার ফলে সেখানে মানুষের কর্মসংস্থান হলো।
- একজন বিলিয়নিয়ার নীতি প্রভাবিত করতে কোনো রাজনৈতিক দলকে প্রচুর অর্থ দান করছেন।
- বিপুল তেলের রিজার্ভ থাকা দেশ উৎপাদন বাড়িয়ে-কমিয়ে বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য প্রভাবিত করছে।
- একটি বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদহার বা ঋণ নীতি নির্ধারণ করছে, যা ব্যবসা ও মানুষকে প্রভাবিত করে।

**পারস্পরিক ক্রিয়া এবং পার্থক্যসমূহ**

যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দুটি আলাদা জিনিস, বাস্তবে এরা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং একে অপরকে ক্রমাগত প্রভাবিত করে চলেছে।

- রাজনৈতিক ক্ষমতা যেভাবে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে: সরকার আইন করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কর বসাতে পারে, কোনো শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারে বা এমন নীতি তৈরি করতে পারে, যা অর্থনৈতিক শক্তিধরদের সরাসরি প্রভাবিত করে।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে: ধনী ব্যক্তি ও বড় করপোরেশনগুলো আর্থিক সংস্থানের টাকা ব্যবহার করে রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, প্রচারাভিযানে অর্থায়ন করে এবং জনমতকে প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বার্থে আইন ও নীতি পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে।

**তবে মূল পার্থক্যটা হলো তাদের কাজের প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বে**

- প্রায়শই রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হলো 'লাঠি'। এই ক্ষমতা কাজ করে রাষ্ট্রের আইন, নিয়ম আর বৈধ বলপ্রয়োগের অধিকারের মাধ্যমে। আদর্শগতভাবে এর লক্ষ্য হলো জনস্বার্থ রক্ষা করা।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাজ করে সম্পদ ও বাজারের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এটি পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বা সুবিধা কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখিয়ে অন্যদের প্রভাবিত করে।

অনেক সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী উভয়ের মধ্যে একটি নিরন্তর টানাপোড়েন ও আলোচনা চলতে থাকে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে অপর পক্ষকে প্রভাবিত করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে অথবা বৃহত্তর সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন করতে।

**রাষ্ট্রপতি-শাসিত বনাম সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা**

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থার একটি ভালো উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে যুক্তরাজ্য সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী– দুজনই নিজ নিজ সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকলেও তাঁদের ক্ষমতার ধরন ও উৎস আলাদা। এর মূল কারণ, দুটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক ব্যবস্থা। একটি হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত, অপরটি সংসদীয়। যুক্তরাষ্ট্র চলে ক্ষমতার পৃথক্করণ নীতিতে, আর যুক্তরাজ্য চলে ক্ষমতার একত্রীকরণ নীতিতে।

## অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কী

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা অভ্যন্তরীণ নীতি হলো একটি দেশের সীমান্তের ভেতরে ঘটা সেই সব মিথস্ক্রিয়া, যা নির্ধারণ করে দেশটি কীভাবে চলবে, কী আইনে চলবে এবং কীভাবে রাষ্ট্রের সম্পদ বিতরণ হবে।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে আকার দেওয়া প্রধান উপাদানগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

### ১. সরকারি প্রতিষ্ঠান ও তার কাঠামো

- **সরকারের শাখা:** দেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হলো; নির্বাহী (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী), আইন প্রণয়ন (সংসদ, কংগ্রেস) ও বিচার বিভাগীয় (আদালত) শাখা। দেশের নীতি কীভাবে প্রণয়ন ও প্রয়োগ হবে, তার মূলে রয়েছে এই তিন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্ষমতা ও ভারসাম্যের পদ্ধতি।
- **সংবিধান ও আইন:** সংবিধান হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন, যা একটি দেশ পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। এটিই ঠিক করে দেয়, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য কী এবং সরকারের ক্ষমতা কতটুকু।
- **আমলাতন্ত্র:** সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র নীতি বাস্তবায়ন ও জনসেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আবশ্যক।
- **নির্বাচনী ব্যবস্থা:** নেতা কীভাবে নির্বাচিত হবেন; আনুপাতিক হারে, নাকি ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিতে; এর ওপর নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক দলের ধরন, সংসদে প্রতিনিধিত্ব ও ভোটারদের আচরণ কেমন হবে।

### ২. রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও গোষ্ঠী

- **রাজনৈতিক দল:** বিভিন্ন মতাদর্শ ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটারদের সংগঠিত করা, জনমত গঠন ও সরকার গঠনে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- **স্বার্থ/লবি গোষ্ঠী:** ব্যবসায়ী সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন বা পরিবেশবাদী গোষ্ঠীর মতো সংগঠনগুলো নির্দিষ্ট কারণ বা নীতির পক্ষে ওকালতি করে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।
- **সুশীল সমাজ ও এনজিও:** এরা সরাসরি সরকার বা রাজনৈতিক দলের অংশ নয়, তবে সমাজের নানা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলে, সরকারের কাজের জবাবদিহি চায় এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ওকালতি করে।
- **সাধারণ নাগরিক ও ভোটার:** তাঁদের ভোট, পছন্দ-অপছন্দ এবং সম্মিলিত জনমতই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয় কারা ক্ষমতায় আসবে এবং দেশ কোন নীতিতে চলবে।

### ৩. সামাজিক উপাদান

- **জনমত:** রাজনৈতিক ইস্যুতে জনগণের সম্মিলিত মনোভাব ও বিশ্বাস। সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ জনমত তৈরি করে এবং সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে।
- **সামাজিক বিভাজন:** শ্রেণি, ধর্ম, জাতিসত্তা, ভাষা, ভূগোল বা মতাদর্শের ভিত্তিতে সমাজে নানা বিভাজন থাকে। এই বিভাজনগুলো প্রায়শই রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ নেয় এবং দলীয় বিন্যাসে বড় ভূমিকা রাখে।
- **সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ:** একটি সমাজের সাধারণ নিয়ম, বিশ্বাস, ঐতিহ্যই ঠিক করে দেয় সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি কেমন হবে। জনগণ সরকারের কাছ থেকে কী আশা করে, তা-ও ঠিক করে দেয় এই মূল্যবোধ।
- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি:** দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার হার বা স্বাস্থ্যসেবার মানের মতো বিষয়গুলো জন-অসন্তোষ তৈরি করতে পারে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নীতির অগ্রাধিকারকে সরাসরি প্রভাবিত করে।
- **গণমাধ্যম:** জনমত গঠন, নাগরিকদের তথ্য প্রদান ও রাজনীতিবিদদের পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশের সূচক।

### ৪. অর্থনৈতিক উপাদান

অর্থনীতি ও রাজনীতি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তার রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে।

- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: একটি দেশ পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক নাকি মিশ্র অর্থনীতির, এর ওপর নির্ভর করে সম্পদ কীভাবে তৈরি ও বণ্টন হবে এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটুকু থাকবে।

- সম্পদের বণ্টন: দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জমি বা পুঁজির ওপর কাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তা নিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল লড়াইটা হয়।
- অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের হার সরাসরি সরকারের প্রতি জনগণের সন্তুষ্টিকে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সমর্থন জন্ম দিতে পারে।
- রাজস্ব ও মুদ্রানীতি: সরকার কর, ব্যয় ও সুদহার নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা সরাসরি সাধারণ মানুষ ও ব্যবসার ওপর প্রভাব ফেলে। এ নিয়েই রাজনৈতিক বিতর্ক ও নীতির পছন্দ তৈরি হয়।

### ৫. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও 'পথ-নির্ভরতা' (Path Dependency)

কোনো দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের পেছনে রয়েছে তার ইতিহাস। উপনিবেশ, বড় সংঘাত ও মৌলিক মুহূর্তগুলো সে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ম ও মানসিকতাকে গভীরভাবে গড়ে তোলে।

'পথ-নির্ভরতা'র মানে হলো, অতীতের সিদ্ধান্ত ও ঘটনাগুলোই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পছন্দগুলো তৈরি করে দেয়। একবার একটি পথে হাঁটা শুরু করলে, নতুন কোনো পথে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি হলো এই উপাদানগুলোর মধ্যে চলতে থাকা এক নিরন্তর মিথস্ক্রিয়া। এটি এমন এক মঞ্চ, যেখানে সংঘাত, আপস ও অভিযোজনের মাধ্যমে একটি দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কোনো দেশ কেন একটি নির্দিষ্ট পথে চলে, তা বুঝতে হলে এই ভিত্তিগুলো বোঝা অপরিহার্য।

## আন্তর্জাতিক রাজনীতি কী

আন্তর্জাতিক রাজনীতি; যাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কও (আইআর) বলা হয়; বিশ্বমঞ্চে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া ও ক্ষমতার গতিশীলতা নিয়ে অধ্যয়ন। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেখানে একটি একক সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে কাজ করে, সেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি হয় অরাজক ব্যবস্থায়; অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আইন প্রয়োগ ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোনো একক, সর্বব্যাপী কর্তৃপক্ষ বা বিশ্ব সরকার নেই।

একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ না থাকাটা আন্তর্জাতিক রাজনীতি বোঝার ক্ষেত্রে একটি সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য ও মূল চ্যালেঞ্জ। এর অর্থ, রাষ্ট্রগুলো মূলত স্ব-সহায়তা ব্যবস্থায় কাজ করে, নিজেদের টিকে থাকা এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

### ১. আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি

আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল জাল বেশ কয়েকটি মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত। এখানে মূল ভিত্তিগুলো তুলে ধরা হলো।

- **সার্বভৌমত্ব:** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এটাই মূল ভিত্তি। এর মানে হলো, প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজের ভূখণ্ড ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।
- **অরাজকতা:** যেমনটি বলা হয়েছে, কোনো বিশ্ব সরকার নেই। এর অর্থ, রাষ্ট্রগুলোকে নিজের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করতে হয়। এর ফলে জন্ম নেয় ক্ষমতার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম এবং জাতীয় স্বার্থ নিয়ে সতর্কতা। যদিও দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বিদ্যমান, তার পেছনেও প্রায়শই নিজেদের স্বার্থ কাজ করে।

### ২. জাতীয় স্বার্থ ও ক্ষমতা

- **জাতীয় স্বার্থ:** প্রতিটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও প্রসারের জন্য কাজ করে। এই স্বার্থের মধ্যে থাকতে পারে দেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নিজস্ব মতাদর্শের প্রভাব বিস্তার কিংবা আঞ্চলিক অখণ্ডতা। প্রায়শই এক দেশের স্বার্থের সঙ্গে আরেক দেশের স্বার্থের সংঘাত বেধে যায়।
- **ক্ষমতা:** ক্ষমতা হলো অন্য রাষ্ট্রকে প্রভাবিত বা প্রয়োজনে বাধ্য করে নিজের লক্ষ্য অর্জন করার সামর্থ্য। এই ক্ষমতা দুই ধরনের হতে পারে:
    - দৃশ্যমান বা মূর্ত ক্ষমতা: সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক আকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা।
    - অমূর্ত ক্ষমতা: কূটনৈতিক দক্ষতা, জাতীয় ঐক্য, সাংস্কৃতিক প্রভাব, খ্যাতি।

  বিশ্বে এই ক্ষমতার বণ্টন কেমন (যেমন একপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা), তার ওপর আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

**৩. কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি**

- **পররাষ্ট্রনীতি:** একটি দেশ অন্য দেশ ও আন্তর্জাতিক কুশীলবদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য যে লক্ষ্য, কৌশল ও পদক্ষেপ নেয়, তার সমষ্টিই হলো পররাষ্ট্রনীতি। এটি জাতীয় স্বার্থেরই কার্যকর শাখা।
- **কূটনীতি:** এটি পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার। এর সাহায্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা আলোচনা, যোগাযোগ এবং দর-কষাকষির মাধ্যমে বিবাদ মেটানো, জোট গঠন ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন।

**৪. আন্তর্জাতিক আইন ও সংস্থা**

- **আন্তর্জাতিক আইন:** এমন কিছু নিয়ম ও নীতির সমষ্টি, যা রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে সম্মত হয়। যদিও এর প্রয়োগের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেই, তবু আন্তর্জাতিক আইন বিশ্বে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করে।
- **আন্তর্জাতিক সংস্থা:** জাতিসংঘ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) ও বিভিন্ন আঞ্চলিক জোটের (যেমন ইইউ, আসিয়ান, সার্ক) মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দেশগুলোকে সহযোগিতা, বিরোধ নিষ্পত্তি ও নিয়ম তৈরির জন্য প্ল্যাটফর্ম দেয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও (এনজিও) নানা বৈশ্বিক বিষয়ে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**৫. অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা ও বিশ্বায়ন**

- **অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা:** পণ্য, সেবা ও পুঁজির জন্য রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থ একদিকে যেমন সহযোগিতার রাস্তা খুলে দেয়, তেমনি বাণিজ্য যুদ্ধ বা সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতার মতো সংঘাত ও দুর্বলতারও জন্ম দিতে পারে।
- **বিশ্বায়ন:** অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি সংযুক্ত। বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় সীমান্তগুলো ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বহুজাতিক করপোরেশন বা আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের মতো নতুন অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটছে।

**৬. মতাদর্শ ও মূল্যবোধ**

- রাজনৈতিক মতাদর্শ: গণতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদ বা সমাজতন্ত্রের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে আকার দিতে পারে। মতাদর্শিক সংঘাত আন্তর্জাতিক উত্তেজনার একটি বড় কারণ হতে পারে।
- মানবাধিকার: মানবাধিকারের ধারণা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর ফলে অনেক সময় আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলো বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করছে, যা রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে।

**৭. অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলব ও আন্তঃদেশীয় সমস্যা**

- **অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলব:** রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বাইরেও অনেক অ-রাষ্ট্রীয় শক্তি এখন বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। এর মধ্যে রয়েছে বহুজাতিক করপোরেশন, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, বিভিন্ন বিষয়ে ওকালতি করা নেটওয়ার্ক ও বৈশ্বিক গণমাধ্যম।
- **আন্তঃদেশীয় সমস্যা:** এমন কিছু সমস্যা আছে, যা কোনো দেশের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, সন্ত্রাসবাদ, সাইবার যুদ্ধ ও অভিবাসন। ক্রমেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা এসব সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এককথায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এমন এক গতিশীল ও প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র, যেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো; এবং ক্রমবর্ধমানভাবে অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবরা; একই মঞ্চে কাজ করে। এখানে কোনো একক পরিচালক বা সর্বশক্তিমান কর্তৃপক্ষ নেই। প্রতিটি দেশকেই তার জাতীয় স্বার্থ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজনের মধ্যে প্রতিনিয়ত ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হয়।

## ভূ-রাজনীতি কী

ভূ-রাজনীতি এমন আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র; যা ভূগোল, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এক সুতোয় বাঁধে। এর মূল বিষয় হলো, ভৌগোলিক বাস্তবতা কীভাবে দেশগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক, তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। ভূ-রাজনীতি আমাদের দেখায় যে, পৃথিবীর ভৌত বৈশিষ্ট্য; যেমন স্থলভাগ, মহাসাগর, পর্বতমালা, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার বিন্যাস; কেবল পটভূমি নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মঞ্চে এরা একেকজন সক্রিয় কুশীলব।

ভূ-রাজনীতির ভিত্তি

ভূ-রাজনীতির ভিত্তি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানের ওপর নির্ভর করে, উভয়ই মূর্ত ও বিমূর্ত।

### ১. মৌলিক কারণ হিসেবে ভূগোল

ভূ-রাজনীতির সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও কেন্দ্রীয় ভিত্তি হলো ভূগোল।

- অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা: একটি দেশ বন্ধুরাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত নাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা, তার ওপর দেশটির নিরাপত্তা কৌশল নির্ভর করে। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটে (যেমন সুয়েজ খাল বা মালাক্কা প্রণালি) প্রবেশাধিকার বা কৌশলগত অঞ্চলের (যেমন আর্কটিক বা দক্ষিণ চীন সাগর) অবস্থান ওই দেশের নিরাপত্তা উদ্বেগ ও পররাষ্ট্রনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
- ভূ-প্রকৃতি ও ভূখণ্ড: পর্বত, মরুভূমি ও বিশাল সমভূমি প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে কাজ করে। প্রভাবিত করে সীমান্ত নিরাপত্তাকেও। এগুলো যেমন প্রতিরক্ষা দিতে পারে, তেমনি সামরিক কৌশল বা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্তও করতে পারে।
- জলবায়ু: কোনো অঞ্চলের জলবায়ু সেখানকার কৃষি, সম্পদের সহজলভ্যতা ও মানুষের জীবনযাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করে; যা শেষ পর্যন্ত একটি জাতির অর্থনৈতিক শক্তি ও কৌশলগত দুর্বলতাকে প্রভাবিত করে।

### ২. প্রাকৃতিক সম্পদ

গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ ভূ-রাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি।

- শক্তির উৎস: তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং আধুনিক যুগে লিথিয়াম বা কোবাল্টের মতো বিরল খনিজ অর্থনৈতিক শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব সম্পদের দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা প্রায়শই আন্তর্জাতিক সংঘাত ও নতুন জোটের জন্ম দেয়।
- পানি: সুপেয় পানি, বিশেষ করে শুষ্ক অঞ্চলে, ক্রমেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে। অভিন্ন নদী বা জলাধারের মালিকানা নিয়ে দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কাও বাড়ছে।
- চাষযোগ্য জমি: খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি দেশের স্থিতিশীলতার জন্য অত্যাবশ্যক। তাই উর্বর জমির সহজলভ্যতা ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### ৩. জনসংখ্যা ও জনমিতি

জনসংখ্যার আকার, বণ্টন, বৃদ্ধি ভূ-রাজনীতির অন্যতম শক্তিশালী নিয়ামক।

- জনসংখ্যার প্রবণতা: জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, বয়স্ক জনসংখ্যা ও অভিবাসনের ধরন একটি দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, সামরিক জনশক্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।
- জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস: বিভিন্ন জাতি বা সংস্কৃতির মানুষ কীভাবে একটি অঞ্চলে বা সীমানার দুই পারে ছড়িয়ে আছে, তা কখনো সহযোগিতার দ্বার খুলে দেয়, আবার কখনো সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

### ৪. প্রযুক্তি ও অবকাঠামো

- ভূগোল স্থির হলেও প্রযুক্তি ও অবকাঠামো ভূগোলের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত বদলে দিচ্ছে।
- পরিবহন নেটওয়ার্ক: সড়ক, রেলপথ, বন্দর ও সমুদ্রপথ নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য রুট ও সামরিক রসদ সরবরাহের কৌশল; যা একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রভাব ও কৌশলগত সক্ষমতাকে আকার দেয়।
- যোগাযোগ নেটওয়ার্ক: ইন্টারনেট ক্যাবল, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য যোগাযোগ অবকাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আজকের যুগে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার এক নতুন উৎস।
- সামরিক প্রযুক্তি: অস্ত্রশস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং সামরিক সক্ষমতা (যেমন নৌবহর, বিমান শক্তি, সাইবার সক্ষমতা) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কৌশলগত গুরুত্বকে বদলে দিতে পারে। যেমন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে দুর্গম পাহাড়ের প্রতিরক্ষামূলক গুরুত্ব আগের চেয়ে কমে যেতে পারে।

### ৫. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব

অতীতের ঘটনা এবং প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব দেশগুলোকে তাদের ভৌগোলিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে প্রভাবিত করে।

- ঐতিহাসিক অভিযোগ/জোট: অতীতের যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার এবং বিভিন্ন জোটের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বর্তমানের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক ও উপলব্ধিকে রূপ দেয়।
- চিরায়ত ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব: কিছু ক্ল্যাসিক তত্ত্ব এখনো প্রাসঙ্গিক। যেমন হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ড তত্ত্ব বলে; যে ইউরেশিয়ার অভ্যন্তর নিয়ন্ত্রণ করবে, সে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করবে। আবার আলফ্রেড থায়ার মাহানের সি পাওয়ার তত্ত্ব অনুযায়ী; সমুদ্রপথের নিয়ন্ত্রণ বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার চাবিকাঠি। এই তত্ত্বগুলো আজও কৌশলগত চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে।

- ক্রিটিক্যাল ভূ-রাজনীতি: এটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি বিশ্লেষণ করে, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ন্যায্য প্রমাণের জন্য ভূ-রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করে এবং সেগুলো ব্যবহার করে।

**৬. ভূ-কৌশল**

ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষণমূলক কাঠামো দেয়, আর ভূ-কৌশল হলো পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক কৌশল প্রণয়নের জন্য ভূ-রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ। এর মূল উদ্দেশ্য, দেশের ভৌগোলিক সুবিধাগুলোকে কীভাবে সবচেয়ে ভালোমতো ব্যবহার করা যায় এবং অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা যায়, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ভূ-রাজনীতি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, একটি দেশের অবস্থান, তার সম্পদ ও জনসংখ্যা শুধু মানচিত্রের কিছু তথ্য নয়, বরং এগুলোই তার ভাগ্য এবং বাকি বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের নিয়ামক। এটিই সেই লেন্স, যা দিয়ে বিশ্বজুড়ে চলমান প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ও সংঘাত বিশ্লেষণ করা যায়।

## বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানসহ অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থানের কারণে দক্ষিণ এশিয়া ও বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান গতিশীলতায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

**১. কৌশলগত অবস্থান: সংযোগের প্রবেশদ্বার**

বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক সম্পদ হলো এর কৌশলগত অবস্থান।

- দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেতুবন্ধন: 'বঙ্গোপসাগরের চূড়ায়' অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ জনবহুল দক্ষিণ এশিয়াকে উদীয়মান অর্থনীতির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার প্রাকৃতিক স্থল ও সমুদ্রসেতু। বাণিজ্য, জ্বালানি ও বিমসটেকের মতো আঞ্চলিক উদ্যোগগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।
- বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার: গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বাণিজ্যপথের কারণে বঙ্গোপসাগর ক্রমেই বৈশ্বিক ক্ষমতাধর দেশগুলোর প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের দীর্ঘ উপকূলরেখা ও মাতারবাড়ীর মতো নির্মাণাধীন গভীর সমুদ্রবন্দর এই জলপথে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে, যা ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী পরাশক্তিগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করছে।
- ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগ: ভারতের স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ী ট্রানজিট রুট বাংলাদেশের ভেতর দিয়েই গেছে। এটি ভারতের আঞ্চলিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ফলে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন সংযোগ প্রকল্প গড়ে উঠেছে।

**২. ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রভাব**

একসময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে পরিচিত বাংলাদেশ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে 'উন্নয়নের বিস্ময়ে' পরিণত হয়েছে।

- অর্থনৈতিক কেন্দ্র: মূলত তৈরি পোশাকশিল্পে ভর করে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি বাংলাদেশকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। এ অর্থনৈতিক শক্তি কূটনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করে।
- বাজার সম্ভাবনা: প্রায় ১৭ কোটি মানুষের এই দেশ পণ্য ও সেবার জন্য এক বিশাল বাজার, যা এর অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

**৩. জনমিতি শক্তি ও সফট পাওয়ার**

বিশাল জনসংখ্যাও বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিচয়ে অবদান রাখে।

- কর্মক্ষম জনশক্তি: দেশের তরুণ ও বিশাল কর্মী বাহিনী একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের চালিকাশক্তি, তেমনি বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় বড় ভূমিকা রাখে।
- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এ দেশ পশ্চিম ও ইসলামি বিশ্বের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন বা বৃহত্তর ঐক্যকে উৎসাহিত করতে পারে।

**৪. প্রধান ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য রক্ষা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের মতো পরাশক্তিগুলোর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মাঝে বাংলাদেশ নিজে একটি সূক্ষ্ম অথচ সুবিধাজনক অবস্থানে খুঁজে পেয়েছে।

- নিরপেক্ষতা/কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন: বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট শক্তির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার এই নীতি বাংলাদেশকে বিভিন্ন উৎস থেকে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সহায়তা পেতে সাহায্য করেছে।
- উন্নয়ন অংশীদারত্ব: চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) ও পশ্চিমা দেশগুলো ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে আগ্রহী। অবকাঠামো উন্নয়ন, বাণিজ্য সুযোগ ও নিরাপত্তা সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। এই সম্পর্কগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেওয়াই বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক দক্ষতার প্রমাণ।

**৫. আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও আন্তঃদেশীয় সমস্যায় ভূমিকা**

দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- সন্ত্রাস দমন: অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা আঞ্চলিক নিরাপত্তায় অবদান রাখে, যা একে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মূল্যবান অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্বলতা: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হওয়ায় বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা তাকে বৈশ্বিক জলবায়ু কূটনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে পরিণত করেছে। অন্যদিকে, রোহিঙ্গা সংকট মানবিক বোঝা হলেও, এই সমস্যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক শরণার্থী ও মানবিক আলোচনার মঞ্চে এক অপরিহার্য নাম করে তুলেছে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের পেছনে রয়েছে এর স্থায়ী ভৌগোলিক সুবিধা, গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনমিতিগত বৈশিষ্ট্য এবং এক জটিল বিশ্ব পরিস্থিতিতে নেওয়া বুদ্ধিদীপ্ত কূটনৈতিক কৌশল। এই সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবেই বাংলাদেশ আজ এমন এক দেশ, যাকে বড় আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক শক্তিগুলো উপেক্ষা করতে পারে না।

# রাজনীতি/মতাদর্শের প্রকারভেদ

বামপন্থী ও ডানপন্থী রাজনীতির শুরু ফরাসি বিপ্লবের সময়। বিপ্লবী সংসদের অধিবেশনে যাঁরা পরিবর্তন চাইতেন এবং রাজার ক্ষমতা খর্ব করার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা বসতেন বাম দিকে; আর যাঁরা রাজতন্ত্র ও পুরোনো প্রথা টিকিয়ে রাখার পক্ষে, তাঁরা বসতেন ডান দিকে। বামপন্থা সাধারণত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বলে এবং পরিবর্তনের পক্ষে থাকে। অন্যদিকে ডানপন্থা ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও সামাজিক স্তরবিন্যাসকে গুরুত্ব দেয় এবং প্রায়শই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়।

তবে মনে রাখা ভালো, রাজনৈতিক মতাদর্শের জগৎ এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এখন শুধু বাম-ডান দিয়ে বিচার না করে, আরও বিভিন্ন অক্ষ (যেমন অর্থনৈতিক বনাম সামাজিক মাত্রা, কিংবা কর্তৃত্ববাদী বনাম উদারবাদী) ব্যবহার করেন।

রাজনীতির এই বিভিন্ন মতাদর্শকে একটু সহজভাবে চিনে নেওয়া যাক।

**বামপন্থী**

- সমাজতন্ত্র (Socialism): এর লক্ষ্য, উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিয়োগের মাধ্যমগুলো সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে আনা। প্রধান লক্ষ্য, বৃহত্তর সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সমষ্টিগত কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- সাম্যবাদ (Communism): সমাজতন্ত্রের আরও একটি চরম রূপ। সাম্যবাদ এমন এক শ্রেণিহীন সমাজের কথা বলে, যেখানে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রায়ই বিপ্লবের কথা বলা হয়।
- সামাজিক গণতন্ত্র (Social Democracy): সমাজতন্ত্রের একটি মধ্যপন্থী রূপ। এই মতাদর্শ পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরে থেকেই গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতা আনার চেষ্টা করে। যেমন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন, শক্তিশালী শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানসম্মত সরকারি সেবা নিশ্চিত করা।

- উদারনীতিবাদ (Liberalism) (সামাজিক উদারনীতিবাদ): এটি ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়। তবে এ মতবাদ বিশ্বাস করে, সমাজে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে।
- প্রগতিবাদ (Progressivism): এই মতাদর্শ সামাজিক সংস্কার ও প্রগতিশীল পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করে। পরিবেশ সুরক্ষা, নাগরিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়।

**ডানপন্থী**

- রক্ষণশীলতা (Conservatism): ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও ধীরগতির পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। সাধারণত অর্থনীতিতে সরকারের সীমিত হস্তক্ষেপ, শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরক্ষা ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের পক্ষে থাকে।
- ধ্রুপদি উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism): ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মুক্তবাজার ও অত্যন্ত সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপকে অগ্রাধিকার দেয়। সামাজিক উদারনীতিবাদের মতো নয়, এই মতবাদ বড় আকারের কল্যাণমূলক কর্মসূচি বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিরোধী।
- স্বাধীনতাবাদ (Libertarianism): অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সর্বনিম্ন সরকারি হস্তক্ষেপ চায়।
- জাতীয়তাবাদ (Nationalism): এই মতাদর্শ জাতীয় পরিচয়, ঐক্য ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। অনেক সময় এই মতবাদ ব্যক্তিগত বা আন্তর্জাতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেয়।
- ফ্যাসিবাদ (Fascism): চরম ডানপন্থী, কর্তৃত্ববাদী ও উগ্র-জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ। এর বৈশিষ্ট্য হলো, স্বৈরাচারী ক্ষমতা, বিরোধীদের কঠোর হাতে দমন এবং সমাজ ও অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ।

**মধ্যপন্থী ও অন্যান্য**

- মধ্যপন্থা (Centrism): এরা কট্টর বাম বা ডান– কোনো দিকেই অবস্থান না নিয়ে মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে। কেন্দ্রপন্থীরা প্রায়শই উভয় পক্ষের নীতির মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করে।
- জনতুষ্টিবাদ (Populism): এটি ঠিক কোনো মতাদর্শ নয়, বরং একটি রাজনৈতিক কৌশল। এখানে 'সাধারণ মানুষ'-এর নামে এবং 'অভিজাত শ্রেণি'র বিরুদ্ধে আবেদন জানানো হয়। এটি বাম (যেমন করপোরেট শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকের অধিকার) এবং ডান (যেমন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিচয় রক্ষা); উভয় ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে।
- সবুজ রাজনীতি/পরিবেশবাদ (Green Politics): এই মতাদর্শীদের মূল লক্ষ্য পরিবেশগত সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন। এদের মধ্যে বাম ও ডানপন্থী উভয় চিন্তার মিশ্রণ থাকতে পারে। এই মতাদর্শীরা সাধারণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কাজ করে এবং সামাজিক ইস্যুতে বামপন্থার দিকে ঝুঁকে থাকে।

**প্রভাবপূর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ**

**বাংলাদেশ**

১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরে আসার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত দুটি দলের বলয়ে প্রভাবিত–

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** সাধারণভাবে গণতন্ত্রপন্থী মধ্য-বাম ধারার দল হিসেবে বিবেচিত। ঐতিহাসিকভাবে দলটি মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার ধারক। শুরুতে সমাজতন্ত্রকেও দলীয় আদর্শে গ্রহণ করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দলটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উদারীকরণের দিকে ঝুঁকে গেছে। কিছু সময় নীতি-কর্মে ধর্মীয় অনুভূতিকেও রাজনীতিতে ব্যবহার করে। (২০০৮ সালে বছর শেষের নির্বাচনে জিতে ২০০৯ সালের শুরু থেকে টানা ক্ষমতায় থাকার চতুর্থ মেয়াদের সূচনায় এসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাহী আদেশে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের নিবন্ধন স্থগিত করে। সে হিসেবে আওয়ামী লীগ আপাতত প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে রয়েছে।)
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি):** সাধারণভাবে গণতন্ত্রমুখী মধ্য-ডান ধারার দল হিসেবে বিবেচিত। দলটির রাজনীতির ভিত্তি হলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বিস্তৃতভাবে ইসলামি মূল্যবোধ ও রক্ষণশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। দলটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উদারীকরণের ধারক।

তবে, এই প্রধান দল দুটির মতাদর্শে প্রায়শই বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ দেখা যায় এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে উভয় দলই জনস্তরে সমর্থনের শক্তি বাড়াতে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে আসছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায়শই ক্ষমতার এক 'জিরো-সাম' লড়াইয়ে পরিণত হয়।

**দ্বি-দলীয় বলয়ের বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল:** আওয়ামী লীগ, বিএনপি– এই দ্বিদলীয় প্রধান রাজনৈতিক বলয়ের বাইরে আরও অনেক রাজনৈতিক দলের সক্রিয়তা থাকলেও ক্ষমতা বা জনসমর্থনের দিক থেকে তাদের প্রভাব খুবই সংকীর্ণ। যে কারণে দলের নীতি-আদর্শের স্বতন্ত্র রাজনীতি দাঁড় করানোর চেয়ে ক্ষমতা ও নির্বাচন প্রশ্নে সময়ে সময়ে বড় দলের জোটে স্থান করে নেওয়ার দর-কষাকষিটাই তাদের মুখ্য রাজনীতি হয়ে ওঠে। এই ধারায় সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাতীয় পার্টির কথা প্রথমে আসে। ক্ষমতায় থাকতে এরশাদের কারণে একসময় উত্তরবঙ্গে জাতীয় পার্টির যে একটা জনসমর্থন তৈরি হয়েছিল, এখনো সেটাই তাদের রাজনৈতিক পুঁজি। তাই জাতীয় পার্টি বা জাপা অনেকটাই আঞ্চলিক দলের মতো এবং বহুধাবিভক্ত। জামায়াতে ইসলামী বৃহত্তম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। তবে ক্যাডারভিত্তিক দল পরিচালনার কারণে তারা একটা রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে নিয়েছে। সর্বশেষ এনসিপি, এবি পার্টি, এলডিপিসহ ১১ দলকে নিয়ে জামায়াত তৈরি করেছে নির্বাচনী জোট। জামায়াতের বাইরে ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দল না হলেও হেফাজতে ইসলামের ছায়ায় থাকা দ্বিধাবিভক্ত খেলাফত মজলিস এবং খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোট, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামসহ আরও কয়েকটি দল ইসলামপন্থী রাজনীতির অগ্রভাগে রয়েছে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্র ও তরুণ নেতাদের গড়া রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি তাদের জনভিত্তি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে, তবে শামিল হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে। অন্যদিকে গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলভুক্ত জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জেপি, সাম্যবাদী দল, তরীকত ফেডারেশন, ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি আপাতত নিস্পৃহ অবস্থায়। বিএনপি যে প্রায় ৪০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে আসছিল, তাদের মধ্যে বিজেপি, গণঅধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিসহ কয়েকটি একই বলয়ে থাকলেও নির্বাচনী ঐক্যে রফাদফা না হওয়ায় ছিটকে গেছে আ স ম রবের জেএসডি ও মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য। এর বাইরে সিপিবি, বাসদ ও বাংলাদেশ জাসদ একসঙ্গে বামফ্রন্ট গড়েছে। নিজেদের ধারায় দল টিকিয়ে রেখেছে ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম, বি চৌধুরীর বিকল্প ধারা ও কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ। এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল, যেগুলোর কয়েকটি নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনও পেয়েছে।

**পশ্চিমা দেশগুলো**

পশ্চিমা দেশগুলোতে রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিসর অনেক বিস্তৃত। তবে কিছু মূলধারা লক্ষ করা যায়–

- উদার গণতন্ত্র (Liberal Democracy): অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষা এবং আইনের শাসন; এই ভিত্তিগুলোর ওপরই বেশির ভাগ পশ্চিমা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে।
- সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র/মধ্য-বাম: পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। সেখানে বড় আকারের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও উচ্চ করের মাধ্যমে পরিচালিত সরকারি সেবা দেখা যায়। যেমন জার্মানি (এসপিডি), সুইডেন (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস) বা কানাডার (লিবারেল পার্টি) মতো দেশ।
- রক্ষণশীলতা/মধ্য-ডান: এই মতাদর্শ মুক্তবাজার, নিম্ন কর, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি, যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টি ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- নব্য উদারনীতিবাদ (Neoliberalism): ঠিক কোনো স্বতন্ত্র দল না হলেও নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি (মুক্তবাজার, শিল্পে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমানো, বেসরকারীকরণ ও সরকারি ব্যয় হ্রাস) বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে অনেক পশ্চিমা বিশ্বের প্রায় সব ধারার রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়েছে।
- জনতুষ্টিবাদের উত্থান (Rising Populism): সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক বৈষম্য, অভিবাসন ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর অবিশ্বাসের কারণে পশ্চিমা বিশ্বে ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদের উত্থান ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী আন্দোলন বা ফ্রান্স (মেরি লা পেনের ন্যাশনাল র‍্যালি) ও নেদারল্যান্ডসের (গার্ট উইল্ডার্সের পার্টি ফর ফ্রিডম) মতো কিছু ইউরোপীয় দেশে কট্টর-ডানপন্থী দলের উত্থান এর উদাহরণ।

এককথায়, ঐতিহাসিক বাম-ডান বিভাজনটি রাজনৈতিক মতাদর্শকে বোঝার একটি মৌলিক কাঠামো হিসেবে আজও টিকে আছে। তবে বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে রাজনীতি প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে, যেখানে পুরোনো বিভাজনের পাশাপাশি নতুন নতুন ধারারও জন্ম হচ্ছে।

**মৌলবাদী রাজনীতি** (Fundamentalist Politics)

মৌলবাদী রাজনীতি হলো এমন এক রাজনৈতিক মতাদর্শ; যা কোনো নির্দিষ্ট 'মৌলিক' নীতির ওপর কঠোর ও আক্ষরিক আনুগত্য স্থাপনের কথা বলে। এই নীতিগুলো সাধারণত কোনো পবিত্র গ্রন্থ, ঐতিহ্যবাহী মতবাদ বা কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বা ধর্মের একটি অনুভূত 'সোনালি যুগ' থেকে নেওয়া হয়।

'মৌলবাদ' শব্দটি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকান প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের মধ্যে উদ্ভূত হয়, যাঁরা বাইবেলের আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন। তবে বর্তমানে এর ব্যবহার অন্যান্য ধর্ম (ইসলাম, ইহুদি, সনাতন ধর্ম) এবং বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে।

এখানে মৌলবাদী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

**১. পাঠ্য/মতাদর্শের কঠোর ব্যাখ্যা**

- আক্ষরিকতা (Literalism): মৌলবাদীরা তাদের পবিত্র গ্রন্থ, মত বা মৌলিক মতাদর্শকে সঠিক, অভ্রান্ত ও নির্ভুল সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা প্রায়শই রূপক বা ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ প্রত্যাখ্যান করে।
- পরম সত্য (Absolute Truth): তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের নীতিগুলোই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য এবং এই নীতিগুলোর প্রতি আনুগত্য একটি 'সঠিক' জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক।

**২. আধুনিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যাখ্যান**

- 'ধর্ম' ও রাষ্ট্রের পৃথক্করণে আপত্তি (Resistance to Separation of Church and State): তারা প্রায়শই তাদের ধর্মীয় বা মতাদর্শিক নীতিগুলোকে সরাসরি আইন ও জননীতিতে প্রয়োগ করতে চায়। তারা ধর্মীয় ও সরকারি ক্ষেত্রগুলোর পৃথক্করণকে চ্যালেঞ্জ করে।

**৩. ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা এবং মূল্যবোধের ওপর জোর**

- সামাজিক রক্ষণশীলতা (Social Conservatism): তারা সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধের পক্ষে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী লৈঙ্গিক ভূমিকা, LGBTQ+ অধিকারের বিরোধিতা, গর্ভপাত ও গর্ভনিরোধের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং শালীনতার ওপর জোর দেওয়া।
- সাম্প্রদায়িক পরিচয় (Communal Identity): তারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী-পরিচয় গড়ে তোলে এবং প্রায়শই 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' বা 'আমরা' বনাম 'তারা'-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করে।

**৪. কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা**

- কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব (Centralized Authority): এই আন্দোলনগুলো প্রায়শই ধর্মগুরু, প্রবীণ বা ক্যারিশম্যাটিক নেতার মতো কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যাঁরা মৌলিক পাঠ্যগুলো ব্যাখ্যা করেন।
- ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা (Intolerance of Dissent): তারা অস্পষ্টতা, পরস্পরবিরোধী তথ্য ও অভ্যন্তরীণ ভিন্নমতের প্রতি প্রতিরোধী হতে পারে, প্রায়শই গোঁড়ামি ও উচ্চ মাত্রার নিশ্চয়তার প্রয়োজন প্রদর্শন করে।
- পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি (Totalistic Vision): তারা প্রায়শই তাদের মৌলিক নীতি অনুসারে সমাজ, শিক্ষা, পারিবারিক জীবন থেকে আইন ও শাসন পর্যন্ত সমস্ত দিককে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্য রাখে।

**৫. প্রতিক্রিয়াশীল এবং কখনো কখনো যুদ্ধংদেহী**

- প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অবস্থান (Defensive and Offensive Posture): প্রাথমিকভাবে অনুভূত হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক হলেও, অনেক মৌলবাদী আন্দোলন পরে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, সমাজে তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।
- আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার (Use of Modern Tools): আধুনিকতার অনেক দিকের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তারা প্রায়শই তাদের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং সংগঠিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি (ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, গণযোগাযোগ) দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে।
- উগ্র বা চরমপন্থার সম্ভাবনা (Potential for Extremism): কিছু ক্ষেত্রে, মৌলবাদী আন্দোলন উগ্রবাদ বা চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ, এমনকি সহিংসতার দিকে যেতে পারে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের মূল বিশ্বাস বা অস্তিত্বকে গুরুতর হুমকির মুখে পড়েছে বলে মনে করে।

**গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা–**

- মৌলবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য (Diversity within Fundamentalism): 'মৌলবাদ' যে একটি বিস্তৃত শব্দ, তা স্বীকার করা জরুরি। বিভিন্ন ধর্ম, এমনকি একই ধর্মের মধ্যেও মৌলবাদী আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে। সমস্ত মৌলবাদী গোষ্ঠী সহিংস বা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক নয়।
- বিতর্কিত শব্দ (Contested Term): 'মৌলবাদ' শব্দটি নিজেই বিতর্কিত হতে পারে এবং কখনো কখনো বিরোধীরা নির্দিষ্ট বিশ্বাসকে খারিজ বা অবৈধ করার জন্য নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করে। কিছু পণ্ডিত অতিরিক্ত সাধারণীকরণ এড়াতে 'উগ্রবাদ', 'ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ' বা 'ইসলামবাদ'-এর মতো আরও নির্দিষ্ট শব্দ পছন্দ করেন।
- ধর্মনিরপেক্ষ মৌলবাদ (Secular Fundamentalism): এই শব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা বা অন্যান্য অ-ধর্মীয় মতাদর্শের অত্যন্ত গোঁড়া এবং অসহিষ্ণু রূপের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে, যা একটি একক 'সঠিক' বিশ্বদৃষ্টিতে জোর দেয় এবং সমস্ত বিকল্প প্রত্যাখ্যান করে।

মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত গোষ্ঠী বা আন্দোলনের উদাহরণ (বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা স্বীকার করে)–

- খ্রিস্টান মৌলবাদ (Christian Fundamentalism): যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ইভানজেলিক্যাল ও পেন্টেকোস্টাল আন্দোলন। তারা কঠোর বাইবেলের আক্ষরিকতার পক্ষে কথা বলে এবং গর্ভপাত, স্কুল প্রার্থনা ও LGBTQ+ অধিকারের মতো বিষয়গুলোতে জননীতিকে প্রভাবিত করতে চায়।
    - ইসলামিক মৌলবাদ (Islamism): মুসলিম বিশ্বে কিছু দল বা গোষ্ঠীর বিভিন্ন আন্দোলন, যা শাসন ও সমাজের ভিত্তি হিসেবে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ–
    - জামায়াতে ইসলামী (পাকিস্তান-ভারত উপমহাদেশের দেশগুলোয়)
    - মুসলিম ব্রাদারহুড (মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশ)
    - তালেবান (আফগানিস্তান)
    - ওয়াহাবিবাদ (সুন্নি ইসলামের একটি রক্ষণশীল রূপ, যা সৌদি আরবে প্রভাবশালী)
- ইহুদি মৌলবাদ (Jewish Fundamentalism): ইসরায়েলের কিছু কট্টর-অর্থোডক্স (হারেদি) গোষ্ঠী। এরা হালাখার (ইহুদি ধর্মীয় আইন) কঠোর আনুগত্যের পক্ষে কথা বলে এবং রাষ্ট্রে বৃহত্তর ধর্মীয় প্রভাব চায়।
- হিন্দুত্ববাদ বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ (Hindutva): ভারতের কিছু দল ও সংগঠনের আন্দোলন, যারা ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং হিন্দু মূল্যবোধভিত্তিক নীতি বা হিন্দুত্ববাদকে প্রচার করে।

মোদ্দাকথা, মৌলবাদী রাজনীতি হলো এমন এক মতাদর্শ, যা কিছু মৌলিক নীতির ওপর প্রশ্নহীন বিশ্বাস স্থাপন করে, আধুনিক পরিবর্তনকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্য সামনে রাখে।

### ডানপন্থী বা দক্ষিণপন্থী

'ডানপন্থী রাজনীতি' ও 'দক্ষিণপন্থী রাজনীতি' শব্দ দুটি আসলে একই অর্থ বহন করে এবং একে অপরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় 'ডান' (Right) ও 'বাম' (Left) শব্দগুলোর উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় 'ডানপন্থী' ও 'দক্ষিণপন্থী' উভয় শব্দই 'Right-wing' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষেপে–

- **ডানপন্থী/দক্ষিণপন্থী:** যারা সাধারণত ঐতিহ্য, বিদ্যমান সামাজিক স্তরবিন্যাস, সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপ, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ধর্মীয় ও রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেয়।
- **বামপন্থী:** যারা সাধারণত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমতাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সমাজে পরিবর্তন বা সংস্কারের পক্ষে থাকে, যার মধ্যে বৃহত্তর সরকারি ভূমিকা, সামাজিক নিরাপত্তা জাল এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

সুতরাং, 'ডানপন্থী রাজনীতি' বা 'দক্ষিণপন্থী রাজনীতি' শুনলেই বুঝবেন, একই ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শকে বোঝানো হচ্ছে।

সহজ কথায়, ডানপন্থী রাজনীতি এমন এক রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা সমাজের প্রচলিত শৃঙ্খলা, ঐতিহ্য ও স্তরবিন্যাসকে স্বাভাবিক, অনিবার্য বা কাম্য বলে মনে করে। ফরাসি বিপ্লবের সময় রাজতন্ত্রের সমর্থকেরা সংসদের ডান দিকে বসতেন, সেখান থেকে এই ধারার

উৎপত্তি। ডানপন্থীরা সাধারণত সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বাজার অর্থনীতি সমাজের উন্নতির জন্য সবচেয়ে কার্যকর পথ।

ডানপন্থী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য–

- রক্ষণশীলতা: এটি ডানপন্থী রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্য দেয় এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পক্ষে থাকে। হঠাৎ বড় ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করে।
- অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ (Economic Liberalism): ডানপন্থীরা সাধারণত মুক্তবাজার অর্থনীতি, কম সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিমালিকানাকে সমর্থন করে। তারা মনে করে, এতে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং সমাজের সামগ্রিক সমৃদ্ধি হয়।
- সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপ (Limited Government Intervention): তারা বিশ্বাস করে যে সরকার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনীতিতে, কম হস্তক্ষেপ করবে। ব্যক্তি তার নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করবে।
- শক্তিশালী প্রতিরক্ষা এবং জাতীয়তাবাদ (Strong Defense and Nationalism): ডানপন্থীরা জাতীয় পরিচয়, ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। তারা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জোর দেয়।
- ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ (Traditional Values): সামাজিক ক্ষেত্রে তারা ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক কাঠামো, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও প্রচলিত নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দেয়। তারা লৈঙ্গিক ভূমিকা, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে।
- শ্রেণিবিন্যাসের স্বীকৃতি (Acceptance of Hierarchy): ডানপন্থীরা প্রায়শই সমাজে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান স্তরবিন্যাস এবং ক্ষমতা কাঠামোর অস্তিত্বকে মেনে নেয়, যেখানে কিছু গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অন্যদের চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব বা সুবিধা ভোগ করতে পারে।

### ডানপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা

ডানপন্থী রাজনীতির মধ্যেও বিভিন্ন ধারা বা উপ-মতাদর্শ রয়েছে, যেগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- রক্ষণশীলতাবাদ (Conservatism): এটি ডানপন্থার মূল ভিত্তি, যা ঐতিহ্য ও স্থিতাবস্থাকে সমর্থন করে।
- ধ্রুপদি উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism): এটি ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুক্তবাজার ও সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপের ওপর জোর দেয়। সামাজিক উদারনীতিবাদের (যা বামপন্থী) থেকে এটি আলাদা।
- স্বাধীনতাবাদ (Libertarianism): এই মতাদর্শ চরম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সরকার ও রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তক্ষেপের পক্ষে কথা বলে।
- জাতীয়তাবাদ (Nationalism): এটি নিজ জাতির স্বার্থ, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের ওপর চরম গুরুত্ব আরোপ করে।
- চরম ডানপন্থা (Far-Right): এর মধ্যে ফ্যাসিবাদ (Fascism), উগ্র-জাতীয়তাবাদ এবং অনেক সময় বর্ণবাদও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই ধারাগুলো প্রায়শই কর্তৃত্ববাদী এবং গণতন্ত্রবিরোধী হয়।

## স্বাধীনতা

স্বাধীনতা একটি বহুমুখী ধারণা। স্বাধীনতা বলতে মূলত কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কাজ করা, কথা বলা বা চিন্তা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। নিজের ইচ্ছেমতো পছন্দ করার ও জীবনযাপন করার ক্ষমতাই স্বাধীনতা, যা বাহ্যিক শক্তি বা জবরদস্তিমূলক চাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

আরও গভীরভাবে বললে, স্বাধীনতা কেবল বাহ্যিক সীমাবদ্ধতার অনুপস্থিতি নয়; এটি এমন পরিবেশের উপস্থিতিকেও বোঝায়, যা ব্যক্তিদের উন্নতি করতে এবং তাদের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তোলে। এর মধ্যে রয়েছে–

- স্বায়ত্তশাসন (Autonomy): নিজের মতো করে চলার ক্ষমতা। অর্থাৎ অন্যদের অযাচিত প্রভাব ছাড়াই নিজের মূল্যবোধ ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।
- আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-determination): কোনো একটি জনগোষ্ঠীর বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের ভাগ্য, সরকার এবং ভবিষ্যৎ পথ বেছে নেওয়ার অধিকার।
- লিবার্টি (Liberty): স্বাধীনতার প্রায় সমার্থক হলেও এই শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। লিবার্টি বলতে মূলত রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারগুলোকে বোঝানো হয়, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা বা সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা।
- এজেন্সি (Agency): স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং নিজের স্বাধীন পছন্দ করার ক্ষমতা।

স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবেও বিবেচিত হয়, যা ব্যক্তিগত মর্যাদা, সৃজনশীলতা এবং একটি ন্যায়সংগত সমাজের বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

### স্বাধীনতার ভিত্তি কী

স্বাধীনতার মজবুত কিছু ভিত্তি রয়েছে। এই ভিত্তিগুলোকে কয়েকটি দিক থেকে বোঝা যেতে পারে: আইনি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক।

### ১. আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তি

এই ভিত্তি আইনের শাসন ও প্রতিষ্ঠিত আইনি কাঠামোর মাধ্যমে স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

- **সাংবিধানিক অধিকার:** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সংবিধানে কিছু মৌলিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। যেমন বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে, যেন সরকার চাইলেই জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে।
- **আইনের শাসন:** এই নীতির মূলকথা হলো, শাসকসহ প্রত্যেকেই আইনের চোখে সমান এবং প্রত্যেককে আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এর ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বেচ্ছাচারী শাসন রোধ করা যায়।
- **স্বাধীন বিচার বিভাগ:** একটি নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা আইনকে সমুন্নত রাখতে, ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করতে ও সরকারি কার্যক্রম সাংবিধানিক বিধানগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **হেবিয়াস কর্পাস** (Habeas Corpus): এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি সুরক্ষা। এর অর্থ হলো, যথাযথ কারণ ছাড়া এবং আদালতে হাজির না করে কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা যাবে না। এই নীতিই স্বৈরাচারী গ্রেপ্তার বা গুমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

### ২. রাজনৈতিক ভিত্তি

রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো নাগরিকদের তাদের শাসনে অংশগ্রহণ করতে এবং ক্ষমতাকে জবাবদিহি করতে সক্ষম হওয়ার বিষয়।

- **গণতন্ত্র ও স্ব-শাসন:** জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার, নীতিকে প্রভাবিত করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি ভিত্তি। এর মধ্যে রয়েছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার।
- **ক্ষমতার জবাবদিহি:** নিয়মিত নির্বাচন, সরকারের স্বচ্ছতা ও প্রতিবাদের অধিকারের মতো প্রক্রিয়াগুলো নিশ্চিত করে যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করতে পারে না।
- **ক্ষমতার পৃথক্‌করণ:** সরকারি কর্তৃত্বকে বিভিন্ন শাখার (নির্বাহী, আইনসভা, বিচার বিভাগ) মধ্যে ভাগ করে দেওয়া একটি সত্তায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করে, এইভাবে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করে।

### ৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি

সরকার কী করতে পারবে না, শুধু তা-ই স্বাধীনতা নয়। মানুষ তার ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে কি না, সেটাও স্বাধীনতার অংশ।

- **অর্থনৈতিক সুযোগ ও নিরাপত্তা:** যদিও এটি সব সময় 'স্বাধীনতা' হিসেবে সর্বজনসম্মত হয় না, তবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সুযোগ মানুষকে তার জীবন নিয়ে প্রকৃত পছন্দগুলো করতে দেয়। দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব বা অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা একজন মানুষের অন্যান্য স্বাধীনতা চর্চার সুযোগ মারাত্মকভাবে সীমিত করতে পারে।

- **শিক্ষা ও তথ্য প্রাপ্তি:** শিক্ষিত নাগরিক নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং অর্থপূর্ণ পছন্দ বেছে নিতে পারে। তাই শিক্ষা ও বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত। এটি মানুষকে যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল করে তোলে। পাশাপাশি চারপাশের জগৎকে বুঝতে ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে।
- **সামাজিক সমতা:** সমাজে যদি জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকে, তবে সেখানে স্বাধীনতা মারাত্মক সীমিত হয়ে পড়ে। যে সমাজ সমতার জন্য লড়াই করে, সেখানেই সবার জন্য স্বাধীনতার ভিত্তি মজবুত হয়।
- **সুশীল সমাজ ও সমিতি:** সরকারের বাইরেও স্বাধীনভাবে বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি বা গোষ্ঠী তৈরির অধিকারও স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের স্বার্থ নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে এবং নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ ও সম্মিলিত মূল্যবোধ রক্ষা করতে পারে।

### ৪. দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি

স্বাধীনতার অনেক ধারণার মূলে গভীর দার্শনিক বিবেচনা রয়েছে।

- **ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা:** অনেক দর্শনই মনে করে, মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার কারণে সহজাতভাবেই প্রত্যেকের কিছু জন্মগত অধিকার রয়েছে। স্বাধীনতা মানুষের এই ব্যক্তিগত মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষার জন্য অপরিহার্য।
- **নৈতিক স্বায়ত্তশাসন:** এই ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব নৈতিক পছন্দ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে। কোনো নৈতিকতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হলে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হয়।
- **মানবিক সম্ভাবনা:** অনেক সময় স্বাধীনতাকে মানুষের ভেতরের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার, তাদের আবেগ ও আগ্রহ অনুসরণের এবং পূর্ণ মানবিক সম্ভাবনা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

শেষ কথা হলো, বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা না থাকা এবং ক্ষমতায়নকারী শর্তগুলোর উপস্থিতির এক জটিল মিথস্ক্রিয়াই স্বাধীনতা। এর ভিত্তি গড়ে ওঠে শক্তিশালী আইন, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সহায়ক আর্থসামাজিক পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত অধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি দার্শনিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে।

### বাংলাদেশের সংবিধানপ্রদত্ত প্রধান স্বাধীনতাসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান তার নাগরিকদের জন্য বিস্তৃত মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। এসব অধিকারের মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার প্রতি অঙ্গীকার। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতা বা জনস্বার্থের মতো বৃহত্তর জনস্বার্থে সরকার আইন মেনে এগুলো কিছু 'আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ'-এর আওতায় আনতে পারে।
এখানে বাংলাদেশের নাগরিকদের দেওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার উল্লেখ করা হলো।

- আইনের দৃষ্টিতে সমতা (অনুচ্ছেদ ২৭): সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান সুরক্ষা লাভের অধিকারী। এর অর্থ হলো কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং আইনি ব্যবস্থার দ্বারা সবার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করতে হবে।
- বৈষম্যহীনতা (অনুচ্ছেদ ২৮): রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করতে পারবে না। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে এটি।
- জনজীবনে সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ২৯): সব নাগরিকের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৩২): আইনি বিধান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটি স্বেচ্ছাচারী আটক বা ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।
- গ্রেপ্তার ও আটক হলে রক্ষাকবচ (অনুচ্ছেদ ৩৩): গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে এবং তার পছন্দের একজন আইনজীবীর দ্বারা পরামর্শ গ্রহণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে। তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।
- জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনুচ্ছেদ ৩৪): সব ধরনের জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর কোনো লঙ্ঘন আইনত দণ্ডনীয় হবে।
- বিচার ও দণ্ড-সংক্রান্ত রক্ষাকবচ (অনুচ্ছেদ ৩৫): এই অনুচ্ছেদ ফৌজদারি কার্যপ্রণালি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- Ex post facto আইন থেকে সুরক্ষা (যখন কোনো কাজ করা হয়েছিল, তখন যদি তা অপরাধ না হয়, তবে তার জন্য শাস্তি প্রদান না করা)।
- দ্বৈত দণ্ড থেকে সুরক্ষা (একই অপরাধের জন্য একাধিকবার বিচার ও শাস্তি প্রদান না করা)।
- একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত কর্তৃক দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকার।
- আত্ম-অপরাধের বিরুদ্ধে অধিকার (কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না)।
- নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তি বা আচরণ নিষিদ্ধকরণ।

- চলাফেরার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৬): সব নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন করার এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনরায় প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। তবে জনস্বার্থে এর ওপর যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।
- সমাবেশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৭): নাগরিকদের জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় জনসভা ও শোভাযাত্রায় সমবেত হওয়ার ও অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।
- সংগঠন করার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৮): সব নাগরিকের নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার রয়েছে।
- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯):
  - চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয়েছে।
  - বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে তা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা, অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোনো অপরাধে উসকানি-সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে।
- পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪০): সব নাগরিকের নির্ধারিত যোগ্যতা বা আইনি বিধিনিষেধ সাপেক্ষে যেকোনো আইনসম্মত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করার এবং যেকোনো আইনসম্মত ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে।
- ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪১):
  - সব নাগরিকের যেকোনো ধর্মাবলম্বী হওয়ার, অনুশীলন করার বা প্রচার করার অধিকার রয়েছে।
  - প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে।
  - কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। এটি আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে।
- সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪২): সব নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যথায় নিষ্পত্তি করার অধিকার রয়েছে। আইনানুগ কর্তৃপক্ষ ব্যতীত এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ, জাতীয়করণ বা দখল করা যাবে না।
- বাসস্থান ও চিঠিপত্রের সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৪৩): সব নাগরিকের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জননৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে তাদের বাড়িতে প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক থেকে সুরক্ষিত থাকার এবং তাদের চিঠিপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগমাধ্যমের গোপনীয়তার অধিকার রয়েছে।
- মৌলিক অধিকার প্রয়োগ (অনুচ্ছেদ ৪৪): সংবিধান নিজেই যেকোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার প্রয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করার অধিকার সব নাগরিককে নিশ্চিত করে। আইনি প্রতিকার পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ প্রদান করে।

সংবিধানে এই স্বাধীনতাগুলোর নিশ্চয়তা দেওয়া আছে বটে, তবে বাস্তবে এসবের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। বিশেষ করে, 'যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ' ধারাটির বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এই মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে কতটা সীমিত করতে পারে, তা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# সংবিধান

কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলবে, সেই নিয়মকানুনের মূল ভিত্তি বা রূপরেখাই হলো সংবিধান। সহজ কথায় বললে, সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। দেশের আর যত আইন আছে, সবকিছুই এই সংবিধানের অধীনে তৈরি হয় এবং এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হয়।

**সংবিধানের প্রকারভেদ**

সংবিধানকে বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

**১. লিখিত বনাম অলিখিত** (Written vs. Unwritten)

- লিখিত সংবিধান (Written Constitution): এই সংবিধান এক বা একাধিক নথিতে সুসংবদ্ধভাবে লিখিত থাকে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেরই লিখিত সংবিধান রয়েছে; যেমন ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ।
- অলিখিত সংবিধান (Unwritten Constitution): এই ধরনের সংবিধান কোনো একটি নির্দিষ্ট বই বা দলিলে পাওয়া যায় না। এটি মূলত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে নানা আইন, প্রথা, আদালতের রায় আর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক রীতিনীতির মধ্যে। তবে এর কিছু অংশ লিখিতও হতে পারে। যেমন যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল ও নিউজিল্যান্ডের সংবিধানকে অলিখিত বলা হয়।

**২. সুপরিবর্তনীয় বনাম দুষ্পরিবর্তনীয়** (Flexible vs. Rigid)

- সুপরিবর্তনীয় সংবিধান: যে সংবিধান খুব সহজে পরিবর্তন করা যায়, তাকে সুপরিবর্তনীয় বলে। অনেকটা সাধারণ আইন পাস করার মতোই এর সংশোধনের প্রক্রিয়াটি সহজ। যেমন যুক্তরাজ্যের সংবিধান।
- দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: এই সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। একে সংশোধন করতে হলে বিশেষ ও জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হতে পারে বা গণভোটের আয়োজন করতে হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধান এই প্রকৃতির।

**৩. এককেন্দ্রিক বনাম যুক্তরাষ্ট্রীয়** (Unitary vs. Federal)

- এককেন্দ্রিক সংবিধান (Unitary Constitution): যে সংবিধানে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে। উদাহরণ: বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান (Federal Constitution): যে সংবিধানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিভক্ত থাকে। উভয় স্তরের সরকারেরই নিজস্ব নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকে। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, কানাডা।

**সাংবিধানিক রীতিনীতি** (Constitutional Convention)

'সাংবিধানিক রীতিনীতি' বলতে রাজনৈতিক আচরণ বা পদ্ধতির অলিখিত, অনানুষ্ঠানিক চুক্তিকে বোঝায়, যা একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো অনুসরণ করে। আইনত বাধ্যতামূলক না হলেও এসব মেনে চলা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুচারু পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

যেমন যুক্তরাজ্যে, প্রধানমন্ত্রীর হাউস অব কমন্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন থাকতে হবে, এই রীতি সাংবিধানিক রীতিনীতি। আইনত এর বাধ্যবাধকতা না থাকলেও এটি লঙ্ঘন করলে গুরুতর রাজনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে। অন্য কথায়, সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলো হলো এমন নিয়ম; যা আইনি নিয়ম না হলেও রাজনীতিতে তাদের গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এর মাধ্যমে সরকার ও বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

**বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান**

- সান মারিনোর সংবিধান: এটি বিশ্বের প্রাচীনতম সক্রিয় লিখিত সংবিধান বলে বিবেচিত হয়। এর কিছু মূল নথি ১৬০০ সাল থেকে কার্যকর রয়েছে, যা 'দ্য স্ট্যাটিউটস অব ১৬০০' নামে পরিচিত ছয়টি লাতিন পাঠ্য।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান: এটি ১৭৮৮ সালের ২১ জুন কার্যকর হয় এবং বিশ্বের প্রাচীনতম সক্রিয় বিধিবদ্ধ (Codified) সংবিধান।

### বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সংবিধান

- মোনাকোর সংবিধান: এটি বিশ্বের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত সংবিধান, যার ইংরেজি সংস্করণে মাত্র ৩,৮১৪টি শব্দ রয়েছে।
- অন্যান্য ছোট সংবিধানের মধ্যে আইসল্যান্ড (৪,০৮৯ শব্দ), লাওস (৪,৮২০ শব্দ), লাটভিয়া (৪,৯১৭ শব্দ) ও জাপান (৪,৯৯৮ শব্দ) উল্লেখযোগ্য।

### বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান

- ভারতের সংবিধান: বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। এর ইংরেজি সংস্করণে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৮৫ শব্দ রয়েছে। এতে একটি প্রস্তাবনা, ২৫টি অংশে বিভক্ত ৪৪৮টি অনুচ্ছেদ এবং ১২টি তফসিল রয়েছে।

### সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (Basic Structure of a Constitution)

মৌলিক কাঠামো ধারণাটি মূলত ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা বিকশিত একটি আইনি মতবাদ। এতে বলা হয়েছে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানের কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এর আইনসভা দ্বারা সংশোধন বা বিলুপ্ত করা যায় না।

ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ভিত্তি: ১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলার রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। এই মতবাদ অনুযায়ী, সংবিধান সংশোধনের সংসদীয় ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ৩৬৮) সংবিধানের 'মৌলিক কাঠামো' পরিবর্তন বা ধ্বংস করার ক্ষমতা দেয় না।

মৌলিক কাঠামোর কিছু উদাহরণ (ভারতের প্রেক্ষাপটে): যদিও সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে সব মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞায়িত করেনি, তবে বিভিন্ন রায়ে কিছু বৈশিষ্ট্যকে মৌলিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে–

- সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব (Supremacy of the Constitution)
- গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা (Republican and Democratic system)
- ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র (Secular character of the Constitution)
- ক্ষমতার পৃথক্করণ (Separation of powers)
- যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো (Federal character of the Constitution)
- ব্যক্তির মৌলিক অধিকার (Essential features of individual freedoms)
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the judiciary)
- আইনের শাসন (Rule of Law)
- ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা (Unity and integrity of India)

এই মতবাদের উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের মূল চেতনা ও মূল্যবোধ রক্ষা করা, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার সংবিধানের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করতে না পারে।

### বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামো

১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের মৌলিক নীতি ও কাঠামোকে রূপরেখা দেয়। এটি বিস্তারিত লিখিত সংবিধান হলেও মৌলিক কাঠামো ধারণাটি বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও পরবর্তী সংশোধনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সংবিধানের এই মৌলিক কাঠামো ধারণা প্রথম শক্তিশালী হয়ে ওঠে ১৯৮৯ সালের একটি বিখ্যাত মামলার রায়ে। মামলাটি 'অষ্টম সংশোধনী মামলা' নামে বেশি পরিচিত, এর আনুষ্ঠানিক নাম আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ সরকার। এই মামলার রায়ের মূলকথা হলো, সংবিধানের এমন কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা সংসদেরও নেই। যদিও সংবিধানে এই মৌলিক কাঠামোগুলোর কোনো স্পষ্ট তালিকা দেওয়া নেই, তবে বিভিন্ন সময়ে আদালতের ব্যাখ্যা ও বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় কিছু বিষয়কে এর অংশ হিসেবে ধরা হয়। যেমন–

- সংবিধানের প্রাধান্য: সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন। এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক যেকোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে (অনুচ্ছেদ ৭)।
- প্রজাতন্ত্র: বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ১)।
- গণতন্ত্র: প্রজাতন্ত্র একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে (অনুচ্ছেদ ১১)।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: বিচার বিভাগ হবে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক ও মুক্ত (অনুচ্ছেদ ২২)।

- ক্ষমতার বিভাজন: সরকারের ক্ষমতা নির্বাহী, আইন প্রণয়ন ও বিচারিক শাখার মধ্যে বিভক্ত থাকবে।
- মৌলিক অধিকার: সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- একক রাষ্ট্র: বাংলাদেশ একটি একক রাষ্ট্র।

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু বিষয়কে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন–

- জাতীয়তাবাদ: বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি।
- সমাজতন্ত্র ও শোষণ মুক্তি: একটি ন্যায় ও সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।
- ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা: সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ এবং সকল ধর্মের জন্য সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা।
- জাতীয় সংগীত, পতাকা এবং প্রতীক: প্রজাতন্ত্রের এই প্রতীকগুলো।
- রাজধানী (ঢাকা): জাতীয় রাজধানী হিসেবে।

### এগুলো কি সংশোধনযোগ্য

এখানেই 'মৌলিক কাঠামো' মতবাদের আসল গুরুত্ব। বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সাধারণত সংশোধনযোগ্য নয়।

- **বিচারিক ঘোষণা:** আনোয়ার হোসেন চৌধুরী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা থাকলেও তা নিরঙ্কুশ নয়। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করা যাবে না। অর্থাৎ সংশোধনের অনুমোদন থাকলেও সংসদ সংবিধানের মূল পরিচয় ও প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলোকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে পারবে না।
- **সাংবিধানিক বিধান (অনুচ্ছেদ ৭খ):** মজার ব্যাপার হলো, বিচারিক নজিরের মাধ্যমে মৌলিক কাঠামো মতবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১, অনুচ্ছেদ ৭খ প্রবর্তন করেছে। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ ও অনুচ্ছেদ ১৫০ এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিধান সন্নিবেশ, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, বাতিল বা অন্য কোনো উপায়ে সংশোধনযোগ্য নয়। এই বিধান বিতর্কিত। আদালতে মামলা চলছে।

এর অর্থ হলো, মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বলে বিবেচিত হয়, এমন কিছু অংশ এখন সংসদ দ্বারা স্পষ্টভাবে অ-সংশোধনযোগ্য। এই বিধান মৌলিক কাঠামো মতবাদকে সংবিধানের পাঠ্যে নিজেই বিধিবদ্ধ করেছে, যা এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সম্ভবত অনন্য করে তুলেছে।

তবে এই বিধান কিন্তু বিতর্কমুক্ত নয়। কোনো সংসদই ভবিষ্যৎ সংসদের ক্ষমতা সীমিত করতে পারে না। ১৯৭৫ সালের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিলসংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারকে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনি ব্যবস্থা থেকে অনাক্রম্যতা বা শাস্তি এড়ানোর ব্যবস্থা প্রদানের জন্য 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ১৯৯৬ সালে এই অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশ বাতিলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়। কিন্তু আদালত সেই মামলা খারিজ করে সংসদের পাস করা বিল বহাল রাখেন।

এককথায়, সংসদের যদিও সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে, তবে এই ক্ষমতা 'মৌলিক কাঠামো মতবাদ' দ্বারা সীমাবদ্ধ, যা বিচারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

### বাংলাদেশের সংবিধানের মান উন্নয়নে ব্যর্থতার কারণ

১৯৭২ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে শাসন ও রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিকতা গড়ে তুলতে, মানবাধিকার রক্ষা করতে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার জন্য বারবার সমালোচিত হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান। এর কারণগুলো জটিল এবং বহু-স্তরীয়:

#### ১. রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার

- ঘন ঘন সংশোধন: বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। এর বেশির ভাগই হয়েছে রাজনৈতিক চাপে বা ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এসব সংশোধন প্রায়ই ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট ও সরকারের কার্যকারিতা হ্রাস করেছে।
- নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য: সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে যে ক্ষমতার একটি দেয়াল থাকা উচিত, তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটি অনেক সময় স্বৈরাচারী প্রবণতাকে উসকে দিয়েছে।

- 'প্রয়োজনের নীতি'র অপব্যবহার: বাংলাদেশের ইতিহাসে 'Doctrine of Necessity' বা 'প্রয়োজনের নীতি'র ব্যবহার হয়েছে অনেকবার। এই নীতি ব্যবহার করে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ও সামরিক-সমর্থিত সরকার তাদের ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দিয়েছে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই পরিপক্ব হতে পারেনি।

**২. দুর্বল মৌলিক অধিকার সুরক্ষা**

- সীমাবদ্ধতা ও অস্পষ্টতা: সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কথা বলা থাকলেও, সেগুলোর বেশির ভাগের ওপর নানা রকম অস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে সরকার অনেক সময় দমনমূলক আইন (যেমন ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন) তৈরি এবং ভিন্নমত দমন করেছে।
- বিচারিক প্রতিকারের অভাব: সংবিধানে প্রতিরোধমূলক আটক-সংক্রান্ত (Preventive Detention) ধারা (যেমন অনুচ্ছেদ ৩৩) রাখা হয়েছে। এর সুযোগ নিয়ে সরকার বিরোধী নেতা, কর্মী ও সাংবাদিকদের বিনা বিচারে আটকে রাখার সুযোগ পায়। আটককৃতদের বিচারিক প্রতিকার চাওয়ার সুস্পষ্ট সুযোগ না থাকায় এই ক্ষমতাগুলো প্রায়ই ভিন্নমত দমন করতে ব্যবহৃত হয়।
- সংঘবদ্ধতার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা: অনুচ্ছেদ ৩৮-এর অধীনে সংঘবদ্ধতার স্বাধীনতার ওপর 'যুক্তিসংগত নিষেধাজ্ঞা' আরোপের বিধান রয়েছে। এই বিধানের সুযোগ নিয়ে সরকার জনশৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে শ্রমিক অধিকার আন্দোলন বা রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে দমন করতে পারে।

**৩. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা**

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব: সংবিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বললেও বাস্তবে এর ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বা নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।
- দায়বদ্ধতার অভাব: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর জবাবদিহির অভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতি দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

**৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও বিভাজন**

- দলীয়করণ জিরো-সাম গেমের রাজনীতি: বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং 'জিরো-সাম গেম' মানসিকতা বিরাজমান। এখানে এক দল ক্ষমতায় এলে অন্যকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চায়। এটি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ও ঐকমত্য তৈরিতে বাধা দেয়।
- জাতীয় ঐকমত্যের অভাব: সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলো নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে দীর্ঘস্থায়ী ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম রাষ্ট্রধর্ম, সমাজতন্ত্র বনাম মুক্তবাজার; এই ধরনের বিতর্কগুলো সংবিধানের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করেছে।

সংক্ষেপে বললে, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ, মৌলিক অধিকারের দুর্বল সুরক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা; এই সবকিছুই বাংলাদেশের সংবিধানের তার কার্যকারিতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আর এর প্রভাব পড়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে।

## গণতন্ত্র

গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে জনগণের হাতে। নাগরিকেরাই ঠিক করে, দেশ কে চালাবে এবং কীভাবে চালাবে। এই ক্ষমতা তারা সরাসরি প্রয়োগ করতে পারে, অথবা নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারে। সহজ কথায়, গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন।

'গণতন্ত্র' শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে। দুটি শব্দ মিলে এটি তৈরি হয়েছে; 'demos', যার অর্থ 'জনগণ' এবং 'kratos', যার অর্থ 'শাসন' বা 'ক্ষমতা'। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে, জনগণের শাসন।

**গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলো হলো–**

- সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে: জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।
- নির্বাচন: নিয়মিত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

- নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা: বাক্‌স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের শাসনসহ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।
- জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা: নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের কাছে তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য।
- সংখ্যালঘুদের অধিকার: সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা হয়।

**গণতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**

হাজার হাজার বছর ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের ধারণার আজকের রূপটি গড়ে উঠেছে।

**প্রাচীন উৎপত্তি**

- প্রাচীন এথেন্স (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক): গণতন্ত্রের কথা উঠলেই অবধারিতভাবে চলে আসে প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্র এথেন্সের নাম। এথেন্সকেই বলা হয় গণতন্ত্রের আঁতুড়ঘর। সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিকেরা আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিত। তবে এথেন্সের এই গণতন্ত্র নিখুঁত ছিল না। কারণ, নারী, দাস ও বিদেশিরা এই প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল।
- রোমান প্রজাতন্ত্র (খ্রিস্টপূর্ব ৫০৯-২৭ অব্দ): বিশুদ্ধ গণতন্ত্র না হলেও রোমান প্রজাতন্ত্র প্রজাতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো প্রবর্তন করেছিল; যেমন নির্বাচিত কর্মকর্তা, চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স (যেমন সিনেট ও বিভিন্ন পরিষদ) এবং একধরনের প্রতিনিধিত্ব। তবে ক্ষমতা সীমিত ছিল এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল অভিজাত (পেট্রিশিয়ান) শ্রেণির মধ্যে।
- প্রাথমিক প্রোটো-গণতান্ত্রিক সমাবেশ: ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায়, এথেন্সেরও বহু আগে মেসোপটেমিয়ার মতো প্রাচীন সভ্যতা বা বিশ্বের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ছোট পরিসরে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথা চালু ছিল। সেখানে গোষ্ঠীর সদস্যরা একত্র হয়ে নিজেদের মতামত জানাত।
- মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রাথমিক বিকাশ
- মধ্যযুগীয় সমাবেশ ও সংসদ: মধ্যযুগে ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ, পরিষদ ও সংসদ গড়ে উঠতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কাঠামো এর অন্যতম উদাহরণ। এই পরিষদগুলোর ক্ষমতা সীমিত ছিল এবং সেখানে মূলত অভিজাত, ধর্মগুরু বা বণিকদের প্রতিনিধিত্ব থাকত। তবু এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ধীরে ধীরে পরামর্শমূলক বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে, যা রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে থাকে।
- ম্যাগনা কার্টা (১২১৫): ইংল্যান্ডের এই ঐতিহাসিক সনদ মূলত রাজার বিরুদ্ধে ব্যারন বা ভূস্বামীদের অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, রাজার ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ নয়। এই 'আইনের শাসন' নীতিটিই আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি।
- আলোকিত যুগ (১৭১৮ শতক): জন লক, জঁ-জ্যাক রুশো এবং মন্টেস্কুর মতো দার্শনিকেরা ব্যক্তিগত অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং ক্ষমতার পৃথক্‌করণ সম্পর্কে যুগান্তকারী ধারণাগুলো বিকশিত করেন। এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনগুলো আধুনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে।
- বিপ্লবের যুগ এবং আধুনিক গণতন্ত্র
- মার্কিন বিপ্লব (১৭৭৬) ও মার্কিন সংবিধান (১৭৮৭): মার্কিন বিপ্লবের ফলে যুক্তরাষ্ট্র জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতার পৃথক্‌করণ এবং ব্যক্তিগত অধিকারের নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় (যদিও প্রাথমিকভাবে সীমিত ছিল, বিশেষত দাস ও নারীদের জন্য)। ১৭৮৭ সালে গৃহীত মার্কিন সংবিধান বিশ্বজুড়ে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের একটি ব্লুপ্রিন্ট হয়ে ওঠে।
- ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯): ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব'। এই বিপ্লব ফ্রান্সের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় এবং একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এর পথচলা মোটেও মসৃণ ছিল না, বরং বেশ অস্থির ছিল, কিন্তু এর আদর্শগুলো ইউরোপজুড়ে গণতান্ত্রিক আদর্শের বিস্তারে গভীর প্রভাব ফেলে।
- ১৯ শতক; ভোটাধিকারের বিস্তার: উনিশ শতকজুড়ে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশেই ভোটাধিকারের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। একটা সময় ছিল যখন শুধু সম্পদশালী পুরুষেরাই ভোট দিতে পারতেন। সেই বাধা ডিঙিয়ে লিঙ্গ বা সম্পদের ঊর্ধ্বে উঠে

ভোটাধিকারের ধারণা প্রসারিত হতে থাকে। এই সময়েই রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থান ঘটে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা আরও সংগঠিত রূপ পায়।

**২০ ও ২১ শতক: গণতন্ত্রায়ণের ঢেউ**

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর: সাম্রাজ্যের পতন এবং অনেক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে গণতন্ত্রের একটি জোয়ার আসে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণে অনেক দেশেই গণতন্ত্র বেশি দিন টেকেনি। তবে এই সময়েই নারীদের ভোটাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর: নাৎসি ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পরাজয় এবং এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশিকতা অবসানের প্রক্রিয়া 'গণতন্ত্রায়ণের দ্বিতীয় ঢেউ' নিয়ে আসে। তবে অনেক নতুন গণতন্ত্রই অস্থিতিশীলতায় ভুগে আবার স্বৈরাচারী শাসনে ফিরে যায়।
- গণতন্ত্রের 'তৃতীয় ঢেউ' (১৯৭০-এর দশক থেকে): এই ঢেউ শুরু হয় দক্ষিণ ইউরোপ (পর্তুগাল, স্পেন ও গ্রিস) ও লাতিন আমেরিকার স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের মাধ্যমে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা যেন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। এই সময়েই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের চল শুরু হয়।
- সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ: একুশ শতকে এসে গণতন্ত্র আবার নতুন কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর মধ্যে আছে জনতুষ্টিবাদের উত্থান, কিছু দেশে গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ভুল তথ্য ছড়ানোর প্রভাব এবং তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য। এত সব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও 'জনগণের শাসন'; এই মূল ধারণা আজও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে এক শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষার নাম।

গণতন্ত্রের ইতিহাস সরল অগ্রযাত্রা নয়; বরং ধারণা, সংগ্রাম ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের একটি জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া। এটি নতুন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং স্ব-শাসনের চলমান অনুসন্ধানে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে।

## দি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) গণতন্ত্র সূচক অনুযায়ী গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

দি ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) তাদের 'গণতন্ত্র সূচক' (Democracy Index) দিয়ে বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি বিচার করে। তারা মূলত পাঁচটি বিষয়ের ওপর স্কোর দেয়: নির্বাচনী ব্যবস্থা, নাগরিক স্বাধীনতা, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

এই সূচকের স্কোরের ওপর ভিত্তি করে ইআইইউ দেশগুলোকে চারটি প্রধান শাসনব্যবস্থায় ভাগ করে। এই প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

১. পূর্ণ গণতন্ত্র: এসব দেশে নাগরিক স্বাধীনতা এবং মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেও সুরক্ষিত থাকে। সরকারের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মান খুব উঁচু। বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা (চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স) থাকে। এসব দেশের সংবাদমাধ্যম স্বাধীন ও বহুত্ববাদী; গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিও উচ্চ মাত্রার হয়। ছোটখাটো সমস্যা থাকলেও গণতান্ত্রিক কার্যকারিতায় ধরনের ত্রুটি নেই।

২. ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র: এই দেশগুলোতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলোও বহাল থাকে। কিন্তু সেগুলোর প্রয়োগে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন সরকার পরিচালনায় দুর্বলতা, দুর্নীতির প্রবণতা বা সুশাসনের অভাব। মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোপুরি বিকশিত না হতে পারে। সংবাদমাধ্যম ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতায়ও কিছু ঘাটতি থাকতে পারে।

৩. হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা: এসব দেশে গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনের উপাদানগুলোর একটি মিশ্রণ দেখা যায়। নিয়মিত নির্বাচন হলেও তাতে বড় ধরনের অনিয়ম ও কারচুপি ঘটে, যা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু হতে দেয় না। বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকে না বা খুবই দুর্বল থাকে। দুর্নীতি ব্যাপক বিরাজমান, আইনের শাসনেও দুর্বলতা থাকে। বিরোধী দল ও সংবাদমাধ্যমকে প্রায়ই সরকারি হয়রানি ও চাপের মুখে পড়তে হয়।

৪. স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা: এই ধরনের শাসনে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না, থাকলেও তা মারাত্মকভাবে সীমিত। ক্ষমতা সাধারণত একজন ব্যক্তি (যেমন স্বৈরশাসক) বা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত থাকে। নির্বাচন যদি হয়ও, তা কেবলই প্রহসনমাত্র; এতে জনগণের ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন ঘটে না। মৌলিক নাগরিক স্বাধীনতা কঠোরভাবে দমন করা হয়। সংবাদমাধ্যম সাধারণত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনের শাসন প্রায় অনুপস্থিত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি সাধারণ ঘটনা।

ইআইইউর এই শ্রেণীকরণ বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা বুঝতে ও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে একটি চমৎকার কাঠামো দেয়।

## বাংলাদেশ: হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) গণতন্ত্র সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০০৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে 'হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের একটি সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো–

- ২০২৪ সালের গণতন্ত্র সূচক: বাংলাদেশ ১৬৭টি দেশের মধ্যে ২৫ ধাপ পিছিয়ে ১০০তম অবস্থানে নেমে এসেছে, সামগ্রিক স্কোর ১০-এর মধ্যে ৪.৪৪। এটি ২০২৪ সালে যেকোনো দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্কোর পতন ছিল, যা 'কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর অপসারণ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার' কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২০২৩ সালের গণতন্ত্র সূচক: বাংলাদেশ ১৬৭টি দেশের মধ্যে ৭৫তম অবস্থানে ছিল, যা ২০২২ সালের অবস্থান থেকে দুই ধাপ নিচে। স্কোর ছিল ১০-এর মধ্যে ৫.৮৭। ২০২৩ সালের প্রধান পতন ছিল নাগরিক স্বাধীনতার স্কোরে।
- ২০২২ সালের গণতন্ত্র সূচক: বাংলাদেশ ৭৩তম অবস্থানে ছিল, স্কোর ছিল ৫.৯৯।
- ইআইইউর 'হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা'র সংজ্ঞানুসারে, এসব দেশে বড় ধরনের অনিয়মের কারণে নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু হয় না। বিরোধী দল ও প্রার্থীদের ওপর সরকারি চাপ থাকে, ব্যাপক দুর্নীতি জেঁকে বসে, আইনের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিচার বিভাগ ও সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচন তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। নির্বাচনের পর অনেক সমালোচক ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক বলেছেন, বাংলাদেশ কার্যকরভাবে 'হাইব্রিড' থেকে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

কেন সমালোচকেরা বলছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে

- 'কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন' ও প্রতিযোগিতার অভাব: ইআইইউর ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্কোরের বড় পতন স্পষ্টতই একটি 'কারচুপিপূর্ণ নির্বাচনের' কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২০১৪ সালের মতো এবারও নির্বাচন বর্জন করে। ফলে নির্বাচনটি হয়ে ওঠে মূলত একতরফা। ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম এবং বেশির ভাগ আসনেই হয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, অথবা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত 'স্বতন্ত্র' প্রার্থীরাই জয়লাভ করেন।
- ভিন্নমত ও বিরোধীদের দমন: ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়। সমালোচকেরা বলেন, সরকার কার্যকরভাবে ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করেছে এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের কার্যক্রমের সুযোগ মারাত্মকভাবে সীমিত করেছে।
- নাগরিক ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সংকোচন: নাগরিক স্বাধীনতার ওপর ক্রমাগত বিধিনিষেধ এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের পরিসর সংকুচিত হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ ছিল। প্রতিবেদনগুলোতে সাংবাদিকদের ওপর সরকারি চাপ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ: নির্বাচনের ফলাফলে সমস্ত ক্ষমতা ক্ষমতাসীন দলের হাতে আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হয়। সমালোচকেরা একে একটি কার্যকর একদলীয় রাষ্ট্রের দিকে যাত্রা বলে মনে করেন। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভূতকরণ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- জবাবদিহির অভাব: কারচুপিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া, দুর্নীতির অভিযোগ ও আইনের শাসনের দুর্বলতার কারণে বলা হয়, জনগণের কাছে সরকারের প্রকৃত জবাবদিহির অভাব রয়েছে।

## ইআইইউর অবস্থান ও সূক্ষ্মতা

এত কিছুর পরেও ইআইইউ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বৈরাচারী' বলেনি, বরং 'হাইব্রিড' শ্রেণিতেই রেখেছে। অথচ ২০২৪ সালের সূচকে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স বাংলাদেশকে 'স্বৈরাচারী' শ্রেণির দিকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের প্রতিবেদনের ভাষা এবং স্কোরের বিশাল পতন (যা ছিল বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ) কার্যত সমালোচকদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি একটি সাধারণ 'হাইব্রিড' শাসনব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি খারাপ হয়েছে, যদিও গণতন্ত্রের কিছু আনুষ্ঠানিক কাঠামো এখনো বিদ্যমান।

মূলকথা হলো, আনুষ্ঠানিক শ্রেণিবিনাস 'হাইব্রিড' থাকলেও ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর গণতন্ত্রের যে তীব্র পতন ঘটেছে, তা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকসহ অনেককে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেছে যে বাংলাদেশ বাস্তবে একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থার দিকেই যাত্রা করেছে। এর পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষত ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাচ্যুতি ও দেশত্যাগ এই রাজনৈতিক সংকটের গভীরতা এবং শাসনব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে জনগণের ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

যে বই পড়তে পারেন–

How Democracies Die: What History Reveals About Our Future (কীভাবে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে: আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিহাস কী বলে)

লেখক: স্টিভেন লেভিটস্কি ও ড্যানিয়েল জিবল্যাট

**'কীভাবে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে' বইয়ের সারাংশ**

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টিফেন লেভিটস্কি ও ড্যানিয়েল জিবল্যাট-এর লেখা ২০১৮ সালের প্রশংসিত বই 'গণতন্ত্র কীভাবে মরে: আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিহাস কী বলে'। এর মূল যুক্তি হলো, একুশ শতকে গণতন্ত্র সহিংস অভ্যুত্থান বা সামরিক দখলের মাধ্যমে (স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের সাধারণ ধারণা) মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং গণতন্ত্র নির্বাচিত নেতাদের হাতেই ধীরে ধীরে, ভেতর থেকে ক্ষয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই নির্বাচিত নেতারাই ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেন।

লেখকেরা দেখান, গণতান্ত্রিক শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য অলিখিত নিয়মকানুন, যেমন পারস্পরিক সহনশীলতা (রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বৈধ প্রতিযোগী হিসেবে মেনে নেওয়া) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংযম (ক্ষমতার অপব্যবহার না করা) আনুষ্ঠানিক আইনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

বইটি স্বৈরাচারী প্রবণতাযুক্ত নেতাদের চারটি চিহ্ন শনাক্ত করে: গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রত্যাখ্যান করা, বিরোধীদের বৈধতা অস্বীকার করা, সহিংসতাকে উৎসাহিত বা সহ্য করা এবং নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করতে প্রস্তুত থাকা।

এ বইয়ে বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক উদাহরণ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে নির্বাচিত নেতারা বিচার বিভাগকে দুর্বল করেন, বিরোধীদের কোণঠাসা করেন, নির্বাচনী নিয়ম পরিবর্তন করেন এবং সংকট কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। লেখকদের মতে, এই ধীর ক্ষয় সাধারণত সহজে ধরা পড়ে না। আর যতক্ষণে ধরা পড়ে, ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে যায়। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে গেটকিপার হিসেবে কাজ করে চরমপন্থী নেতাদের ঠেকানো এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংযমের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

**লেখকেরা দুটি মূল গণতান্ত্রিক নিয়ম চিহ্নিত করেছেন**

১. পারস্পরিক সহনশীলতা: এর সহজ অর্থ হলো, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রু না ভেবে বৈধ প্রতিযোগী হিসেবে সম্মান করা। ঘোর বিরোধী হলেও তার নির্বাচনে লড়ার, জেতার এবং নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হলে তার দেশ শাসন করার অধিকারকে মেনে নেওয়াই হলো এই সহনশীলতা। এর অর্থ হলো বিরোধীদের শত্রু হিসেবে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক সংযম: আইনগতভাবে একজন নেতার অনেক ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার না করার প্রজ্ঞাই হলো প্রাতিষ্ঠানিক সংযম। ধরা যাক, একজন রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন, যা আইনত সিদ্ধ, কিন্তু নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। সংযম মানে হলো, ব্যবস্থার বৃহত্তর স্বার্থে তার এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। এই সংযমটুকু না থাকলে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং রাজনীতি এক সর্বাত্মক লড়াইয়ে পরিণত হয়।

লেভিটস্কি ও জিবল্যাট একজন সম্ভাব্য স্বৈরাচারী নেতাকে চেনার জন্য চারটি সতর্কসংকেতের কথা বলেছেন। কোনো নেতার মধ্যে যদি এই লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে, তবে গণতন্ত্রের জন্য বিপদঘণ্টা বেজে ওঠে।

- গণতান্ত্রিক নিয়মকানুনকে অস্বীকার: তিনি কথায় বা কাজে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার চেষ্টা করেন।
- বিরোধীদের বৈধতাকে অস্বীকার: রাজনৈতিক বিরোধীদের দেশদ্রোহী, দুর্নীতিবাজ বা দেশের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন।
- সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা উসকে দেওয়া: নিজের সমর্থকদের সহিংস আচরণকে দেখেও না দেখার ভান করেন, এমনকি কখনো কখনো উসকেও দেন।
- গণমাধ্যমসহ নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করার ইচ্ছা: সংবাদমাধ্যমসহ সব ভিন্নমত বা বাক্‌স্বাধীনতাকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকেন।

বইটিতে ইতিহাস থেকে বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রের ভাঙনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৩০-এর দশকের ভাইমার জার্মানি এবং লাতিন আমেরিকা (১৯৭৩ সালে চিলি, হুগো শ্যাভেজের অধীনে ভেনেজুয়েলা) থেকে সমসাময়িক গণতন্ত্রের হুমকিগুলোর ওপর আলোকপাত করেছে।

লেখকেরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কীভাবে নির্বাচিত শাসকেরা ধাপে ধাপে গণতন্ত্রকে ভেতর থেকে ভেঙে দেন:

- 'রেফারিদের দখল করা': বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন বা গোয়েন্দা সংস্থার মতো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের অনুগত লোক বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।
- বিরোধীদের কোণঠাসা করা: রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল বা অক্ষম করার জন্য আইনি বা রাজনৈতিক উপায় ব্যবহার করা। যেমন নির্বাচনী মামলা, সংবাদমাধ্যমে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা বা নির্বাচনী এলাকা পুনর্বিন্যাস।
- খেলার নিয়ম বদলে ফেলা: নির্বাচনী আইন, সাংবিধানিক সংশোধনী বা অন্যান্য নিয়ম পরিবর্তন করা, যাতে বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং জয়ী হওয়া কঠিন হয়।
- সংকটের সদ্ব্যবহার: প্রকৃত বা অনুভূত সংকটে নির্বাহী ক্ষমতা বাড়ানো এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পাশ কাটানোর ন্যায্যতা হিসেবে ব্যবহার করা।

বইটির উদ্বেগজনক বার্তা হলো, এই ধীর ক্ষয় শনাক্ত করা প্রায়ই কঠিন হয়। আবার শনাক্ত করা গেলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। কারণ, এই প্রক্রিয়ায় রাস্তায় ট্যাংক দেখা যায় না, বরং ব্যবস্থার একটি ধীর, আপাতদৃষ্টে বৈধ দুর্বলতা চোখে পড়ে।

লেভিটস্কি ও জিবল্যাটের মতে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার মূল দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। দলগুলোকে 'গেটকিপার' বা প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে কোনো স্বৈরাচারী প্রবণতার নেতা ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে না পারেন। তারা পারস্পরিক সহনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযমের নিয়মগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার, রাজনৈতিক অঙ্গনে বৃহত্তর সহযোগিতার এবং চরম মেরুকরণ ও অর্থনৈতিক অসমতার মতো অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার কথাও বলেন। এর পাশাপাশি নাগরিকদেরও সজাগ থাকতে হবে। পারস্পরিক সহনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংযমের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে আবারও সমাজে ফিরিয়ে আনতে হবে।

## গণতন্ত্র রক্ষার মূল পরামর্শসমূহ

**লেভিটস্কি ও জিবল্যাটের দেওয়া প্রধান পরামর্শগুলো নিচে দেওয়া হলো–**

### ১. গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির প্রতি পুনঃপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া

- পারস্পরিক সহনশীলতা: রাজনৈতিক নেতাদের বুঝতে হবে যে প্রতিপক্ষ মানেই শত্রু নয়। তারা দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি; এমনটা ভাবা চলবে না। সহজ কথায়, মেনে নিতে হবে যে বিরোধীদেরও রাজনীতি করার, নির্বাচনে লড়ার এবং জিতলে দেশ শাসন করার অধিকার আছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক সংযম: সব রাজনৈতিক কুশীলবকে, বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রয়োগে সংযমী হতে হবে। আইনের মূল স্পিরিট মেনে চলতে হবে, যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার, আদালত দখল বা আগ্রাসীভাবে নির্বাচনী এলাকা পুনর্বিন্যাস করে দলীয় সুবিধা নেওয়া এড়ানো যায়।

### ২. রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রহরী হিসেবে কাজ করা

- চরমপন্থীদের বর্জন করা: মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো স্বৈরাচারী বা অগণতান্ত্রিক ব্যক্তিদের ক্ষমতায় আসতে বাধা দেওয়া। এর অর্থ হলো প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক নিয়ম না মানা, বিরোধীদের বৈধতা অস্বীকার বা সহিংসতা সমর্থন করা প্রার্থীদের সমর্থন না করা।
- বিস্তৃত জোট গঠন: স্বৈরাচারী হুমকির সম্মুখীন হলে গণতান্ত্রিক দলগুলোর উচিত মূল গণতান্ত্রিক নীতিগুলো রক্ষার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে বিস্তৃত, এমনকি অস্বস্তিকর, জোট গঠনে ইচ্ছুক হওয়া। প্রয়োজনে সাময়িকভাবে নীতিগত মতভেদগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে।

### ৩. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং তাদের স্বাধীনতা

- স্বাধীন বিচার বিভাগ: বিচার বিভাগকে হতে হবে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন। এখানে এমন নিরপেক্ষ বিচারপতিরা থাকবেন, যাঁরা সরকার বা আইনসভার ক্ষমতার অপব্যবহার রুখে দিতে পারবেন। তাঁদের দেওয়া রায়কে সবাই সম্মান করবে।

- নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রশাসন: নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, যাতে তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারে এবং কোনো বিরোধ হলে নিরপেক্ষভাবে তার নিষ্পত্তি করতে পারে।
- পেশাদার আমলাতন্ত্র ও নিরাপত্তা বাহিনী: সিভিল সার্ভিস, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন শাসক দলের হাতিয়ার না হয়ে নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের সেবা করে।

**৪. বাক্‌স্বাধীনতা ও বহুত্ববাদী সংবাদমাধ্যমের সুরক্ষা**

- সেন্সরশিপ প্রতিরোধ: সমালোচনামূলক সংবাদমাধ্যম বা ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করার জন্য আইনি বা বেআইনি উপায় ব্যবহার করা থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।
- বৈচিত্র্যময় সংবাদমাধ্যমকে উৎসাহিত করা: একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বৈচিত্র্যময় ও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম প্রয়োজন; যা সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে, জনবিতর্ককে সহজ করতে পারে এবং ক্ষমতাকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে।

**৫. চরম মেরুকরণ ও অসমতার সমাধান করা**

- বিভাজন কমানো: লেখকেরা স্মরণ করিয়ে দেন, সমাজে যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বিভেদ ও ভুল তথ্যের প্রসার বাড়ে, তখন মানুষ উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি হয়।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি: রাজনীতিতে দেশের সব প্রান্তের, সব গোষ্ঠীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে হবে, সমাধান করতে হবে। এতে সমাজে বিভেদ তৈরি করে ক্ষমতায় আসা একনায়কসুলভ নেতাদের আবেদন কমে যায়।

**৬. জনগণের সতর্কতা ও অংশগ্রহণ**

- সচেতন থাকা: একটি সুশিক্ষিত ও নাগরিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক ক্ষয় শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- নেতাদের জবাবদিহি করা: নাগরিকদের অবশ্যই গণতান্ত্রিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমুন্নত রাখার জন্য তাদের নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে ইচ্ছুক হতে হবে। এমনকি যখন তা কঠিন হয় বা তাদের দলীয় পছন্দের বিরুদ্ধে যায়, তখনো।

'কীভাবে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে' বইটির মূল বার্তা হলো, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে শুধু নতুন আইন তৈরি করলেই চলবে না। এর জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি গণতান্ত্রিক শাসনের মূল চেতনার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। এই চেতনা হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংযম এবং 'খেলার নিয়ম' মেনে চলার মানসিকতা; খেলার ফল আপনার পক্ষে না গেলেও। বইটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি একটি সতর্কবার্তা; দলীয় স্বার্থের চেয়ে গণতন্ত্রকে বড় করে দেখুন; তেমনি এটি সাধারণ নাগরিকদের জন্যও একটি জরুরি আহ্বান: আপনার নেতাদের কাছেও একই দাবি করুন।

**একনজরে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট**

বাংলাদেশের গণতন্ত্র একাধিক গভীর সমস্যার মুখোমুখি, যা এর বৈধতা, কার্যকারিতা এবং জনসাধারণের আস্থাকে প্রভাবিত করে। এখানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলো দেওয়া হলো।

**দুর্বল নির্বাচনী ব্যবস্থা**

- নির্বাচনে প্রায়ই ভোট কারচুপি, ভোটারদের হুমকি-ধমকি দেওয়া ও ব্যালট প্যাকিংয়ের অভিযোগ ওঠে।
- বিরোধী দলগুলো ভোট গণনা ও নির্বাচনী ক্ষেত্র সমতল না থাকার কারণে বড় নির্বাচন বর্জন করেছে।
- কম ভোটার উপস্থিতি এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থাহীনতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে।

**রাজনৈতিক বহুত্ববাদের অভাব**

- বাংলাদেশ কার্যত দুই দলের আধিপত্যবাদী ব্যবস্থা (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে বিরোধী দলের জন্য স্থান সংকুচিত হয়েছে।
- বিরোধী দলগুলো হয়রানি, গ্রেপ্তার ও বিধিনিষেধের মুখে পড়ে, যা তাদের কার্যক্রম দুর্বল করে।

- রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতিত্বকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
- বিচার বিভাগ, পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশনসহ মূল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই শাসক দলের দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়।
- এর ফলে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের দুর্বলতা সৃষ্টি হয় এবং জনগণের আস্থা কমে যায়।

**গণমাধ্যম স্বাধীনতার অবক্ষয়**

- বাংলাদেশ বৈশ্বিক গণমাধ্যম স্বাধীনতার সূচকে তলানিতে রয়েছে।
- সাংবাদিকেরা হয়রানি, গ্রেপ্তার ও সেন্সরশিপের শিকার হন, বিশেষ করে তাঁরা যখন দুর্নীতি বা সরকারের সমালোচনা করেন।
- ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মাধ্যমে সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে।

**রাজনীতিতে অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাব**

- নির্বাচনে অর্থ ও অপরাধী গোষ্ঠীর প্রভাব ব্যাপক।
- প্রার্থীকে ক্ষমতায় আসার জন্য কালোটাকা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করতে হয়, যা তাঁদের ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতির একটি চক্র তৈরি করে।

**বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব**

- আদালতগুলো রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ বা সরকারের সমালোচকদের ক্ষেত্রে।
- এর ফলে আইনের শাসন দুর্বল হয় এবং বিচারব্যবস্থায় জনগণের আস্থা কমে যায়।

**রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অবক্ষয়**

- রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই পারিবারিক আধিপত্য এবং কর্তৃত্ববাদী কাঠামো দ্বারা শাসিত হয়, ফলে অভ্যন্তরীণ বিতর্ক বা সংস্কারের সুযোগ কম।
- প্রার্থী মনোনয়ন সাধারণত বিশ্বস্ততা ও অর্থের ওপর নির্ভরশীল, যোগ্যতার ওপর নয়।

**সিভিল সোসাইটি ও বিরোধীদের দমন**

- সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলো কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ে, যা তাদের সরকারের ওপর নজরদারি বা নাগরিক অংশগ্রহণে সহায়তা করার ক্ষমতা সীমিত করে।
- শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রায়ই পুলিশি দমন বা গ্রেপ্তারের মাধ্যমে থামানো হয়।

**ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ**

- ক্ষমতা প্রধানত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং নির্বাহী বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত। ফলে সংসদ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে।
- আইনগুলো প্রায়ই অল্প বিতর্ক বা বিরোধী দলের তদারকি ছাড়াই পাস হয়।

**নাগরিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব**

- অনেক নাগরিক, বিশেষত যুবকেরা, দুর্নীতির বিস্তার এবং পরিবর্তনের অভাবে রাজনীতিবিমুখ বা অসন্তুষ্ট।
- ভোটারদের অহংকার এবং হতাশা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে দুর্বল করে।

# নির্বাচন

বাংলাদেশে প্রায়ই একটি কথা শোনা যায়; গণতন্ত্রের যত দুর্বলতা, তার মূলে রয়েছে নির্বাচনী সংকট। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, নির্বাচন জিনিসটাই খারাপ; বরং সমস্যাটি লুকিয়ে আছে নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি এবং তাকে ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে। বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা এমন এক স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছে, যা রাজনৈতিক অস্থিরতা আর দুর্বল শাসনের এক দুষ্টচক্রে নাগরিকদের আটকে ফেলেছে।

**নির্বাচন কী**

নির্বাচন হলো একটি সুসংগঠিত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী ভোট দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে সরকারি পদে বসান অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র মূলত এই প্রক্রিয়ার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে আরও বিস্তারিত একটি বিবরণ দেওয়া হলো।

মূল সংজ্ঞা: নির্বাচন হলো একটি গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, যেখানে একদল লোক (ভোটার) এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সরকার বা সংস্থায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অথবা একটি নির্দিষ্ট নীতি বা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাধারণত ভোটের মাধ্যমে বেছে নেয়।

**প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যসমূহ**

- প্রতিনিধি নির্বাচন: নির্বাচনের সবচেয়ে সাধারণ উদ্দেশ্য হলো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা (যেমন সংসদ বা কংগ্রেস), নির্বাহী পদ (রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী) এবং কখনো কখনো বিচার বিভাগীয় বা স্থানীয় সরকারি পদে কাজ করার জন্য ব্যক্তি নির্বাচন করা।
- গণতান্ত্রিক শাসন: গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো নির্বাচন। আজকের দিনে একটি বড় দেশে সরাসরি গণতন্ত্র; যেখানে প্রত্যেক নাগরিক প্রতিটি সিদ্ধান্তে অংশ নেবে; চালানো প্রায় অসম্ভব। তাই নাগরিকেরা তাঁদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।
- ভোটারের পছন্দ: নির্বাচন ভোটারদের সামনে বিভিন্ন প্রার্থী, দল বা নীতির মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এর মাধ্যমে নাগরিকেরা নিজেদের পছন্দের কথা জানাতে পারে এবং দেশের শাসন কোন পথে চলবে, তা নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে।
- জবাবদিহি: নির্বাচন নেতাদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্বাচন আসে, তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দিতে বাধ্য হন। কারণ, তাঁরা জানেন, কাজে সন্তুষ্ট না হলে পরের নির্বাচনে জনগণ তাঁদের সরিয়ে দিতে পারে। এই প্রক্রিয়া সরকারকে জনগণের প্রতি সংবেদনশীল রাখে।
- বৈধতা: একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন সরকারকে শাসন করার বৈধতা বা অধিকার দেয়। জনগণ যখন মনে করে নির্বাচন ঠিকমতো হয়েছে, তখন বিজয়ী দল বা প্রার্থীকে তারা দেশ চালানোর ম্যান্ডেট দিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এমনকি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও কখনো কখনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (যদিও প্রায়শই ত্রুটিপূর্ণ) বৈধতার একটি আবরণ তৈরি করার জন্য।
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: নির্বাচন নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের একটি বড় সুযোগ তৈরি করে দেয়; ভোটার ও সম্ভাব্য প্রার্থী– দুইভাবেই। এই অংশগ্রহণ নাগরিক দায়িত্ব এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি তৈরি করে।
- ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর: স্থিতিশীল গণতন্ত্রে নির্বাচন এক সরকার থেকে অন্য সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি স্বীকৃত এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার ফলে নেতৃত্বের ওপর সহিংস সংঘাত রোধ করা সম্ভব হয়।
- জনসচেতনতা ও বিতর্ক তৈরি: নির্বাচনী প্রচারণার সময় দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়। প্রার্থীরা নিজেদের কাজের হিসাব দেন, নতুন নীতির প্রস্তাব করেন এবং ভোটারদের বিভিন্ন বিষয়ে জানান। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।

**নির্বাচনের প্রকারভেদ (সাধারণ উদাহরণ)**

- সাধারণ নির্বাচন: প্রধান রাজনৈতিক পদগুলোর জন্য দেশব্যাপী নির্বাচন (যেমন জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি)।
- প্রাইমারি নির্বাচন: এটি মূলত দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনে কোন প্রার্থী দলের হয়ে লড়বেন, তা ঠিক করার জন্য দলের ভোটাররা এখানে ভোট দেন।
- উপনির্বাচন/বিশেষ নির্বাচন: কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোনো কারণে আসন শূন্য হলে, সেই নির্দিষ্ট আসনে নতুন প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার জন্য এই নির্বাচন হয়।
- স্থানীয়/পৌর নির্বাচন: স্থানীয় সরকারি সংস্থার (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন বা সিটি কাউন্সিল, মেয়র, উপজেলা পরিষদ, চেয়ারম্যান) পদগুলোর জন্য নির্বাচন।
- গণভোট: এখানে কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয় না; বরং কোনো নির্দিষ্ট আইন, প্রস্তাব বা সাংবিধানিক পরিবর্তনের ওপর জনগণের মতামত জানতে সরাসরি ভোটের আয়োজন করা হয়।

এককথায়, নির্বাচন হলো আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা নাগরিকদের নিজেদের নেতা বেছে নেওয়ার, তাদের কাজের হিসাব নেওয়ার এবং দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়।

**মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে (ইউডিএইচআর) নির্বাচনের সংজ্ঞা**

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে (ইউডিএইচআর) 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন' শব্দগুচ্ছটি সরাসরি ব্যবহার করা হয়নি। তবে এর ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে এমন কিছু মূলনীতি ও শর্তের কথা বলা আছে, যা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আসল ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

**ইউডিএইচআরের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–**

১. প্রত্যেকেরই নিজের দেশের সরকারে সরাসরি অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে।
২. প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
৩. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা পর্যায়ক্রমিক ও প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং গোপন ভোট বা তার সমতুল্য অবাধ কোনো ভোটাধিকার পদ্ধতির মাধ্যমে।

**ইউডিএইচআরের অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী 'অবাধ ও সুষ্ঠু' নির্বাচনের মূল উপাদানগুলো–**

**১. প্রকৃত নির্বাচন** (Authenticity)

এর মৌলিক নীতি হলো: 'জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি।' অর্থাৎ সরকারের ক্ষমতা উৎসারিত হবে জনগণের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা থেকে। আর নির্বাচন হলো সেই ইচ্ছা যাচাই করার একমাত্র প্রক্রিয়া।

'প্রকৃত নির্বাচন' বলতে বোঝায় পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া; ভোটার নিবন্ধন থেকে শুরু করে প্রচারণা, ভোট গ্রহণ এবং গণনা পর্যন্ত; সবকিছুই হতে হবে স্বচ্ছ। এখানে ভোটারদের পছন্দের সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর অর্থ হলো, কারসাজি করে ফলাফল আগে থেকে ঠিক করে রাখা বা ভোটের গণনায় কারচুপি করা চলবে না।

**২. পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন** (Regularity)

নির্বাচন অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ও নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। এর ফলে সরকারগুলো সব সময় জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। জনগণও একটি নির্দিষ্ট সময় পর তাদের প্রতিনিধি পরিবর্তন করার বা পুরোনোদেরই আবার সমর্থন জানানোর সুযোগ পায়। ফলে সরকারগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না।

**৩. সর্বজনীন ভোটাধিকার** (Inclusivity)

এর মানে হলো, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে (ইউডিএইচআরে ২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য বিশ্বাস, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা– কোনো কিছুর ভিত্তিতেই কাউকে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

**৪. সমান ভোটাধিকার** (Equality of Vote)

এর মূলকথা হলো 'এক ব্যক্তি, এক ভোট'। অর্থাৎ প্রতিটি ভোটের মূল্য বা ওজন সমান হতে হবে। এমন কোনো ব্যবস্থা থাকা চলবে না, যেখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভোটকে বেশি বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**৫. গোপন ভোট**

এটি ভোটারের পছন্দের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোপন ব্যালট ভোটারকে যেকোনো ধরনের ভয়ভীতি, চাপ বা অযাচিত প্রভাব থেকে রক্ষা করে। ফলে ভোটার তাঁর বিবেকের ভিত্তিতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন। ঘোষণাপত্রে 'সমতুল্য অবাধ ভোটাধিকার পদ্ধতি'র কথাও বলা হয়েছে। এর মানে হলো, গোপন ব্যালট ছাড়াও অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি তা একই রকম স্বাধীনতা ও পছন্দের গোপনীয়তা নিশ্চিত করে।

**২১ নং অনুচ্ছেদের বাইরে নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্য শর্তগুলো**

শুধু ২১ নম্বর অনুচ্ছেদই নয়, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অন্যান্য কিছু অনুচ্ছেদও একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির জন্য সহায়ক।

- অনুচ্ছেদ ১৯ (মতপ্রকাশের স্বাধীনতা): একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নাগরিকদের স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়ার এবং নিজের মতামত প্রকাশ করার অধিকার থাকতে হবে। জ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্মুক্ত জনবিতর্ক এবং প্রার্থী/দলগুলোকে তাদের নীতিমালা জানাতে এটি অপরিহার্য। গণমাধ্যম যদি নিয়ন্ত্রিত বা দমনমূলক পরিবেশে কাজ করে, তবে নির্বাচনের 'প্রকৃত' ও 'স্বাধীন' বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে পড়বে।
- অনুচ্ছেদ ২০ (শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা): জনগণের শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হওয়ার, রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সমিতি গঠনের স্বাধীনতা থাকতে হবে; জবরদস্তি বা নির্বিচার বিধিনিষেধ থাকা চলবে না। এই অধিকার রাজনৈতিক সংগঠন, প্রচারণা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ দেয়।
- আইনের শাসন: নির্বাচনের ওপর কোনো সুস্পষ্ট অনুচ্ছেদ না থাকলেও ইউডিএইচআরের পুরো চেতনায় আইনের শাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মানে হলো, নির্বাচন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত ও বৈষম্যহীন আইন অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে এবং সেই আইন সবার জন্য নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

মোদ্দাকথা হলো, জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, একটি 'অবাধ ও সুষ্ঠু' নির্বাচন মানে শুধু ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়া নয়, এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটে, যা নিয়মিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আর এই পুরো ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে থাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের মতো মৌলিক অধিকারের ওপর। এই সবকিছু একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে ঘটে, যা নিশ্চিত করে যে সরকারের ক্ষমতার একমাত্র উৎস হলো জনগণ।

**নির্বাচনী ব্যবস্থার বয়স কত**

নির্বাচনী ব্যবস্থার শিকড় খুঁজতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে হাজার হাজার বছর পেছনে, সেই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর দিকে।

- প্রাচীন গ্রিস (আনুমানিক ৫০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ): এথেনীয়র গণতন্ত্রকে প্রাথমিক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আজকের দিনের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে ছিল না (শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভূমি মালিকেরাই ভোট দিতে পারতেন), তবু তাঁদের মধ্যে একধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু ছিল। তাঁরা এক ধরনের নেতিবাচক নির্বাচন বা অস্ট্রাকবাদ পদ্ধতির চর্চা করতেন, যেখানে নাগরিকেরা ভোট দিয়ে কোনো অজনপ্রিয় নেতাকে শহর থেকে নির্বাসিত করতে পারতেন। আবার তাঁরা লটারির মাধ্যমেও সরকারি কর্মকর্তা বেছে নিতেন; কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল, নির্বাচন ধনীদের পক্ষে যায়।
- প্রাচীন রোম: রোমান প্রজাতন্ত্রেও বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্বাচন হতো। তবে সেই পদ্ধতি ছিল বেশ জটিল এবং প্রায়ই তা ধনী ও অভিজাত শ্রেণির পক্ষেই যেত।
- স্পার্টা (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৪ অব্দ): স্পার্টায় এফোর্স নির্বাচন করা হতো সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। সেখানে সব নাগরিকেরই ভোট দেওয়ার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ছিল, যা এথেন্সের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের চেয়ে প্রাচীন।
- মধ্যযুগ: এই সময়ে পোপের মতো ধর্মীয় নেতা এবং পবিত্র রোমান সম্রাটের মতো ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের বেছে নেওয়ার জন্য নির্বাচনের ব্যবহার ছিল।
- আদি মধ্যযুগের বাংলা (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ): জানা যায়, পাল রাজা গোপালকে সেখানকার সামন্ত প্রধানেরা মিলে নির্বাচিত করেছিলেন, যা এই অঞ্চলে গণতন্ত্রের এক প্রাচীন নিদর্শন।

- চোল সাম্রাজ্য (আনুমানিক ৯২০ খ্রিস্টাব্দ, ভারত): দক্ষিণ ভারতে চোল সাম্রাজ্যে 'কুদাভোলাই' নামক পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এতে তালপাতায় নাম লিখে ভোট দিয়ে গ্রাম কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হতো।
- মধ্যযুগীয় ভেনিস (১৩ শতক): ভেনিস রাষ্ট্র একটি গ্র্যান্ড কাউন্সিল নির্বাচন করত এবং ভোটের জন্য বেশ কিছু জটিল পদ্ধতি তৈরি করেছিল। এর মধ্যে ছিল 'অনুমোদন ভোট' এবং 'ডোগে' নির্বাচন করার জন্য এক জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া কারচুপি রোধ এবং সবার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনের ধারণা আড়াই হাজার বছরের বেশি পুরোনো হলেও বর্তমানে যে নির্বাচনী ব্যবস্থা রয়েছে; সবার ভোটাধিকার আছে, গোপন ব্যালটের ব্যবস্থা; সেটি অনেক নতুন একটি ধারণা।

## ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবর্তন

**নির্বাচনী ব্যবস্থার বিবর্তনকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়**

১. প্রাথমিক ও সীমিত রূপ: প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে নেতা নির্বাচন বা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নানা পদ্ধতি ছিল। তবে সেই অধিকারগুলো প্রায়ই নির্দিষ্ট কিছু মানুষের (যেমন: পুরুষ ভূমি মালিক, অভিজাত) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সবার সমান ভোটাধিকারের কোনো ধারণা তখন ছিল না।

২. প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের উত্থান (১৭ শতক থেকে): আধুনিক নির্বাচনের ধারণাটি মূলত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন এই ধারণা জনপ্রিয় হতে শুরু করে যে সরকারের ক্ষমতার উৎস হলো 'শাসিতদের সম্মতি', তখনই সেই সম্মতি আদায়ের জন্য নিয়মিত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তখনো ভোটাধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

- সম্পত্তি ও লৈঙ্গিক সীমাবদ্ধতা: বহুদিন পর্যন্ত ভোটাধিকার নির্ভর করত জমির মালিকানা, সম্পদ ও লিঙ্গের ওপর। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার পরও যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক প্রাথমিক গণতন্ত্রে কেবল সম্পদশালী শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরাই ভোট দিতে পারতেন।
- অভিজাতদের প্রভাব: অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনীতি ছিল মূলত অভিজাত শ্রেণির দখলে, আর নির্বাচন পরিচালিত হতো স্থানীয় রীতিনীতি মেনে।

৩. ভোটাধিকারের বিস্তার (১৯ ও ২০ শতক): এই দুই শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে ভোটাধিকারের জন্য বড় বড় আন্দোলন হয়।

- সর্বজনীন পুরুষ ভোটাধিকার: ১৯ শতকের শেষ থেকে ২০ শতকের শুরুর দিকে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় সব দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- নারী ভোটাধিকার: বিশ্বজুড়ে নারীরা ভোটাধিকারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেন, যা 'সাফ্রাগেট' আন্দোলন নামে পরিচিত। এর ফলে বিভিন্ন দেশে নারীরা ভোটের অধিকার লাভ করেন (যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০, ব্রিটেনে ১৯২৮, ফ্রান্সে ১৯৪৪ ও সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে)।
- সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার: যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে নানা আইনি বাধা আর ভয়ভীতি দেখিয়ে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে আফ্রিকান-আমেরিকানদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের 'ভোটাধিকার আইন'-এর মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপের পর সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়।
- ভোটের বয়স কমানো: ২০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে অনেক দেশে ভোটের বয়স কমিয়ে ১৮ বছর করা হয় (যেমন ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে)।

৪. আধুনিক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও তার চ্যালেঞ্জ: বর্তমানে বিশ্বে নানা ধরনের নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু আছে, যেমন ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, দুই রাউন্ড পদ্ধতি ইত্যাদি। যদিও 'এক ব্যক্তি, এক ভোট'; এই নীতি বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, তবে সত্যিকারের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাগুলো প্রায়ই নিজেদের বৈধতা দেওয়ার জন্য নির্বাচনের আয়োজন করে, কিন্তু সেখানে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিফলন থাকে না।

মূলকথা হলো, নেতা নির্বাচন বা ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধারণাটির শিকড় বহু প্রাচীন হলেও আজকের দিনের সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা সংগ্রাম আর রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনের ফসল। এর শক্ত ভিত তৈরি হতে শুরু করে ১৭ শতক থেকে এবং ১৯ ও ২০ শতকে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। নারী ভোটাধিকারের দীর্ঘ ও বন্ধুর লড়াই ছিল এই যাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

## বাংলাদেশের আইনি কাঠামো অনুসারে নির্বাচনের সংজ্ঞা

বাংলাদেশের আইনে 'নির্বাচন'-এর কোনো একক, ব্যাপক ও সুস্পষ্ট পৃথক সংজ্ঞা নেই; বরং সংবিধান ও 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২' (যা আরপিও নামে পরিচিত); এই দুটি প্রধান আইনি দলিলের বিভিন্ন বিধি ও প্রবিধানের মাধ্যমে নির্বাচনকে ধাপে ধাপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

### ১. সাংবিধানিক ম্যান্ডেট ও উদ্দেশ্য

১১ নং অনুচ্ছেদ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার): এই অনুচ্ছেদ বলছে: 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে...এবং যেখানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' এই ধারাই বলে দেয়, নির্বাচন এমন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয় এবং তাদের প্রতিনিধি বেছে নেয়।

১১৯ নং অনুচ্ছেদ (নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি): এই অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত নির্বাচন পরিচালনার তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকিবে।' অর্থাৎ নির্বাচন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা একটি নির্দিষ্ট সাংবিধানিক সংস্থা (নির্বাচন কমিশন) পরিচালনা ও তদারক করবে। এখানে জাতীয় নির্বাচনের প্রধান প্রকারও বলা হয়েছে– রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয়।

১২২ নং অনুচ্ছেদ (ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের যোগ্যতা): এ অনুচ্ছেদ অনুসারে, বয়স্ক ভোটারদের ভোটের ভিত্তিতে হবে সংসদ নির্বাচন। অর্থাৎ মৌলিক মানদণ্ড পূরণ করা প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের ভোটের অধিকার রয়েছে।

১২৩ নং অনুচ্ছেদ (নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়): সংসদের বিলুপ্তির আগের ৯০ দিনের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। এর মাধ্যমে নির্বাচনকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৬৫ নং অনুচ্ছেদ (সংসদ প্রতিষ্ঠা): এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে; তাঁদের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশের আইনসভা গঠিত হবে।

### ২. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (আরপিও)

নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে মূল আইন হলো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও। এর আওতায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করে। আরপিওতে 'নির্বাচনের' একক 'সংজ্ঞা' বিভাগ না-ও থাকতে পারে, তবে এতে নির্বাচনের প্রতিটি ধাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা হয়। যেমন–

নির্বাচনের প্রক্রিয়া:

- নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ: কোথায়, কতটুকু এলাকা নিয়ে একটি নির্বাচনী এলাকা হবে।
- ভোটার তালিকা তৈরি: কারা ভোট দেওয়ার যোগ্য এবং কীভাবে তাদের নাম নিবন্ধন করা হবে।
- প্রার্থী মনোনয়ন: ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে প্রার্থী দেবে, তার পদ্ধতি।
- প্রচারণা: নির্বাচনী প্রচারণার নিয়মাবলি।
- ভোট গ্রহণ: ভোট দেওয়ার প্রকৃত প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে ভোটকেন্দ্র স্থাপন, ভোট গ্রহণ কর্মীদের নিয়োগ ও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি (যেমন ব্যালট পেপার বা ইভিএম ব্যবহার)।
- ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা: ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া।
- নির্বাচনী অপরাধ ও দণ্ড: নির্বাচনের সময় কোন কাজগুলোকে অবৈধ (যেমন ঘুষ, ভয় দেখানো, ছদ্মবেশ ধারণ) বলে গণ্য করা হয় এবং সেগুলোর শাস্তি কী, তা সংজ্ঞায়িত করে। এর মাধ্যমে একটি সঠিক, আইনসম্মত নির্বাচন কী, তা পরোক্ষভাবে সংজ্ঞায়িত হয়।
- নির্বাচনী বিরোধ ও আবেদন: নির্বাচনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়া।
- নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা: নির্বাচন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের সমস্ত দিক সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করে, যা সংস্থাটির সাংবিধানিক ম্যান্ডেটকে শক্তিশালী করে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণ: সংশোধিত আকারে আরপিও রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করে, যা নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের যোগ্যতা সংজ্ঞায়িত করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে 'নির্বাচন' কোনো একবাক্যে লেখা সংজ্ঞা নয়। এটি আসলে একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ, যার মূল ভিত্তি দিয়েছে সংবিধান এবং খুঁটিনাটি নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছে আরপিওর মতো সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলো। ভোটার তালিকা তৈরি থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা এবং সবশেষে নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াই এ রকম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

## গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-আরপিওর সর্বশেষ সংশোধনী

অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর আরপিও'তে সংশোধনী এনেছে। এ লক্ষ্যে জারি করা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মূল উপজীব্য হচ্ছে নতুন কিছু নির্বাচনী বিধান। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য দলের সঙ্গে জোটগতভাবে নির্বাচন করলেও তার প্রার্থীদের নিজ দলের মার্কা বা প্রতীকেই নির্বাচন করতে হবে। এ ছাড়া সংশোধিত অধ্যাদেশে 'না ভোট' পুনরায় চালু হওয়া থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অপব্যবহারকে নির্বাচনী অপরাধ হিসেবে গণ্য করার মতো নানা বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সংশোধিত আরপিও অনুযায়ী মূল পরিবর্তনগুলো হলো– আদালত ঘোষিত ফেরারি আসামি প্রার্থী হতে পারবেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনী (সেনা, নৌ, বিমান ও কোস্ট গার্ড) যুক্ত হয়েছে। সমান ভোট পেলে লটারির বদলে হবে পুনর্ভোট। নির্বাচনী জামানত ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের কারাদণ্ডের বিধান থাকবে। আইটি সাপোর্টে পোস্টাল ভোটিং পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে। অনিয়ম প্রমাণিত হলে পুরো আসনের ভোট বাতিলের ক্ষমতা ইসিকে দেওয়া হয়েছে। এআইয়ের অপব্যবহার নির্বাচনী অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। হলফনামায় অসত্য তথ্য দিলে নির্বাচিত হওয়ার পরও ইসি ব্যবস্থা নিতে পারবে– এমন বিধান রাখা হয়েছে।

অনুচ্ছেদভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ও পরিবর্তন–

**অনুচ্ছেদ ২:**

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেনা, নৌ, বিমান ও কোস্ট গার্ডকে।

**অনুচ্ছেদ ১২:**

আদালত ঘোষিত ফেরারি বা পলাতক আসামি সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি বা কার্যনির্বাহী পদে থাকা ব্যক্তিও প্রার্থী হতে পারবেন না।

'লাভজনক পদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পদকেও সংজ্ঞায় আনা হয়েছে।

হলফনামায় দেশ-বিদেশের আয়ের উৎস ও সর্বশেষ ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ১৯:**

একক প্রার্থী থাকলে ব্যালট পেপারে থাকবে 'না ভোট'। তবে পুনর্নির্বাচনে 'না ভোট' প্রযোজ্য হবে না।

**অনুচ্ছেদ ২০:**

জোটগত নির্বাচনে প্রতিটি দলকে নিজস্ব প্রতীকে ভোট করতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ২১:**

নির্বাচনী এজেন্ট অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটার হতে হবে।

**অনুচ্ছেদ ২৬:**

ইভিএমে ভোট গ্রহণের বিধান বাতিল করা হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ২৭:**

পোস্টাল ভোটিংয়ের আওতায় প্রবাসী, সরকারি চাকরিজীবী এবং দেশের অভ্যন্তরে আটক ভোটাররা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

**অনুচ্ছেদ ২৯:**

ভোটকেন্দ্রে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশের সুযোগ রাখা হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ৩৬:**

ভোট গণনার সময় গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিত থাকার বিধান যুক্ত।

**অনুচ্ছেদ ৩৮:**

সমান ভোট পেলে লটারির পরিবর্তে পুনর্ভোট হবে।

**অনুচ্ছেদ ৪৪:**

প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ভোটারপ্রতি ১০ টাকা নির্ধারণ।

দলীয় অনুদান ও ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ বাধ্যতামূলক।

নির্বাচন কর্মকর্তাদের বদলিতে উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ ৭৩:**

মিথ্যা তথ্য, গুজব বা এআই অপব্যবহার রোধে প্রার্থী ও দলের বিরুদ্ধে অপরাধের বিধান যুক্ত।

**অনুচ্ছেদ ৯০:**

দল নিবন্ধন স্থগিত হলে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতীকও স্থগিত থাকবে।

**অনুচ্ছেদ ৯১:**

অনিয়ম প্রমাণিত হলে শুধু কেন্দ্র নয়, প্রয়োজনবোধে পুরো আসনের ফল বাতিলের ক্ষমতা ইসিকে দেওয়া হয়েছে।

আচরণবিধি লঙ্ঘনে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের দণ্ডের বিধান।

হলফনামায় অসত্য তথ্য দিলে ভোটের পরও ইসি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

## বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্য ও বিতর্কিত নির্বাচন

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে কিছু অত্যন্ত বিতর্কিত এবং কিছু ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। একটি নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায়শই নির্ভর করে তা একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি না, তার ওপর।

বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন

এই নির্বাচনগুলোকে সাধারণত অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে দেখা হয়; কারণ, একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করেছিল, যা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থা তৈরিতে সাহায্য করেছিল।

- **১৯৯১** সালের সাধারণ নির্বাচন: এই নির্বাচনকে বলা হয় বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। গণ-অভ্যুত্থানে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই নির্বাচনের আয়োজন করে। এই নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল এবং বিএনপি জয়লাভ করে, বেগম খালেদা জিয়া হন প্রধানমন্ত্রী। একে স্বৈরাচারী শাসন থেকে সংসদীয় শাসনে সফল উত্তরণের একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়।
- জুন **১৯৯৬** সালের সাধারণ নির্বাচন: **১৯৯৬** সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বিতর্কিত নির্বাচন হয়। বিরোধী দলগুলো ওই নির্বাচন বর্জন এবং সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে। এরপর জুনে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে এটি বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন।

- ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন: এই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল একটি উত্তপ্ত কিন্তু মোটের ওপর প্রশংসিত নির্বাচন। এ নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনের পর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়েছিল।
- ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচন: রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার জন্য এটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভূমিধস বিজয় লাভ করে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি শাসনের সূচনা করে।

### বিতর্কিত এবং বর্জন করা নির্বাচন

এই নির্বাচনগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কারচুপি, কম ভোটার উপস্থিতি এবং প্রধান বিরোধী দলগুলোর বর্জন, যা জনমনে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গভীর আস্থার সংকট তৈরি করে।

- ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন: ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যালট বাক্স ভর্তি করা এবং ভোটারদের ভয় দেখানোর মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে। দলটি প্রায় সব আসনে জয়ী হয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে, যা কার্যকর বিরোধী দলের অস্তিত্বকে প্রায় মুছে দেয় এবং একদলীয় শাসনের পথ খুলে দেয়।
- ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচন: এই দুটি নির্বাচনই হয়েছিল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনামলে। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রধান বিরোধী দলগুলো ১৯৮৮ সালের নির্বাচন বর্জন করেছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করলেও ব্যাপক কারচুপি ও ভোটারবিহীন কেন্দ্রগুলোর কারণে নির্বাচন দুটিকে অবৈধ এবং প্রহসনের নির্বাচন হিসেবেই দেখা হয়।
- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচন: সব প্রধান বিরোধী দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। খুব কম ভোটার উপস্থিতির নির্বাচনে বিএনপি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তীব্র রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে। এর ফলস্বরূপ মাত্র ১২ দিনের মাথায় সরকার পদত্যাগ করতে এবং নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিরোধীদের দাবির মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করা হয়।
- ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন: ২০১১ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার মিত্ররা ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করে। ফলে দেশের বহু আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে বিতর্কিত হয়।
- ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচন: বিরোধী দলগুলো অংশ নিলেও এই নির্বাচন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। ভোটের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরে ফেলা, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো এবং অন্যান্য অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগে অনেকে এটাকে 'মধ্যরাতের নির্বাচন' বলে আখ্যা দেন। আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা ভূমিধস বিজয় পেলেও নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা প্রশ্ন ওঠে।
- ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন: নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি পূরণ না হওয়ায় প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২০১৪ সালের মতো এবারও নির্বাচন বর্জন করে। ফলে নির্বাচনটি মূলত একতরফা হয়ে পড়ে। ভোটার উপস্থিতি ছিল অনেক কম এবং বেশির ভাগ আসনেই হয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, অথবা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত নেতারাই 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন।

### অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন কেন জরুরি

একটি সফল গণতান্ত্রিক দেশের মূল ভিত্তি হলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। এর মাধ্যমেই নাগরিকেরা তাঁদের রায় জানান এবং সরকারকে নিজেদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। এই ব্যবস্থা যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ক্ষুণ্ন হয় এবং গণতন্ত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

চলুন, জেনে নেওয়া যাক, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ঠিক কী কী কারণে জরুরি।

#### ১. সরকারের বৈধতা

নির্বাচন একটি সরকারের বৈধতার ভিত্তি দেয়। যখন নির্বাচন সঠিকভাবে ও ন্যায়সংগতভাবে হয়, তখন তা নিশ্চিত করে যে নেতারা জনগণের সম্মতি থেকে তাঁদের কর্তৃত্ব লাভ করেছেন, যা সমাজে আস্থা ও স্থিতিশীলতা তৈরি করে।

### ২. ক্ষমতা বদলের শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া

একটি বিশ্বস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে, যা রাজনৈতিক সহিংসতা বা অস্থিরতার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এটি ভোটের মাধ্যমে নাগরিকদের মতামত প্রকাশের এবং পরিবর্তন সাধন করার সুযোগ দেয়।

### ৩. জবাবদিহি এবং প্রতিনিধিত্ব

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ ভোটাররা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ ও নীতির জন্য জবাবদিহি করানোর সুযোগ পান। জনপ্রতিনিধিরা জানেন, ঠিকমতো কাজ না করলে পরের নির্বাচনে জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবে। এর ফলে তাঁরা জনগণের কথা শুনতে বাধ্য হন। সমাজের পিছিয়ে পড়া বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠও এর মাধ্যমে সংসদে পৌঁছায়।

### ৪. অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক ঐক্য

অন্তর্ভুক্তিমুলক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে ধর্ম-বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান-নির্বিশেষে দেশের সব নাগরিকের রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তি সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে।

### ৫. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি

যে দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকে, বিশেষ করে যেখানে নিয়মিত স্বচ্ছ নির্বাচন হয়, সেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও দ্রুত হয়। কারণ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এমন একটি স্থিতিশীল ও পূর্বানুমানযোগ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে ভরসা পান।

### অনিয়মিত এবং অস্বচ্ছ নির্বাচনগুলোর ঝুঁকি

কোনো নির্বাচন যখন কারচুপি, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম বা জালিয়াতির মাধ্যমে কলুষিত হয়, তখন তার পরিণতি হয় মারাত্মক:

- আস্থার ক্ষয়: নাগরিকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে তাঁরা রাজনীতি ও রাষ্ট্র নিয়ে আগ্রহ হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে পারেন।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা: অস্বচ্ছ নির্বাচন বিতর্কিত ফলাফল তৈরি করতে পারে, যা প্রতিবাদ, নাগরিক অস্থিরতা, এমনকি সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
- দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার: জবাবদিহি না থাকলে নেতারা তাঁদের অবস্থান ব্যক্তিগত স্বার্থে অপব্যবহার করতে পারেন, যা আইনের শাসনকে ক্ষুণ্ন করে।
- অধিকার হরণ: প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে, যা ব্যবস্থাগত বৈষম্য ও অন্যায় সৃষ্টি করে।

### অন্যায্য নির্বাচনের পরিণতি

### ১. প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থার ক্ষয়

নির্বাচনের কারচুপির কারণে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যায়। ফলে সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়, রাজনৈতিক বিভাজন বাড়ে। পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতে নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর আস্থার অভাবকে সামাজিক বিভেদ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়।

### ২. রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা

অন্যায্য নির্বাচনের ফলাফল প্রায়ই তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়। এই বিতর্ক থেকে প্রতিবাদ, রাজপথে সহিংসতা এবং অনেক সময় সশস্ত্র সংঘাতের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে হত্যার পর ইকুয়েডরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনা দেশটির গণতান্ত্রিক অবস্থাকে খাদের কিনারায় নিয়ে যায়।

### ৩. অর্থনৈতিক পরিণতি

নির্বাচনের ভুল ফলের কারণে উদ্ভূত রাজনৈতিক অস্থিরতা বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, বাজারে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তা ছাড়া সরকারকে অবৈধ শাসনব্যবস্থা হিসেবে দেখা হলে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ করবে।

### ৪. আধিপত্যবাদী শাসনের উত্থান

নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্তৃত্ববাদী শাসকদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। নাইজারের মতো দেশগুলোতে নির্বাচনী বিতর্কের কারণে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে, যার ফলে সংবিধান স্থগিত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে গেছে।

**৫. সামাজিক বিভাজন**

অন্যায্য নির্বাচন সমাজে বিভাজনকে আরও গভীর করে তোলে। কারণ, প্রায়শই প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই বঞ্চনার অনুভূতি থেকে তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অস্থিরতা, যা দেশের ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

**বৈশ্বিক প্রভাব**

বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক চর্চা সংকুচিত হয়ে আসছে। ফ্রিডম হাউসের ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে ২৬টির বেশি দেশে নির্বাচনী কারচুপি এবং রাজনৈতিক সহিংসতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**মানসিক এবং নৈতিক প্রভাব**

নির্বাচনী কারচুপির প্রভাব শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, নাগরিকদেরও ওপর গভীর মানসিক প্রভাব পড়ে। কারচুপির কারণে সমাজে অসহায়ত্ব, নিরাশা ও নাগরিক গুণাবলির অভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা দেশের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

**গণতান্ত্রিক সততা পুনঃপ্রতিষ্ঠা**

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য, দেশগুলোকে নিচের উদ্যোগগুলো গ্রহণ করতে হবে:

- নির্বাচনী সংস্কার: স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- প্রতিষ্ঠানগত শক্তিশালীকরণ: নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- নাগরিক অংশগ্রহণ: নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা উৎসাহিত করা।
- আন্তর্জাতিক নজরদারি: নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানানো এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া।

## ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও জনগণের জীবনে যেভাবে প্রভাব ফেলেছে

ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনগুলো বাংলাদেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও জনগণের দৈনন্দিন জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এটি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক সমস্যায় পরিণত হয়েছে, যা নিয়ে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনেও উদ্বেগ দেখা গেছে।

এর প্রভাবের একটি বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

**১. গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব**

- জনগণের আস্থার অবক্ষয়: নির্বাচনে ব্যাপক অন্যায়, কারসাজি বা অসততা হয়েছে মনে করা হলে পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা অনেক কমে যায়। নাগরিকেরা ভাবতে শুরু করেন যে তাঁদের ভোটের কোনো মূল্য নেই। এই ভাবনা থেকে জন্মায় একধরনের অনীহা ও অবিশ্বাস।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা
  - নির্বাচন কমিশন: সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন যখন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় বা ক্ষমতাসীনদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয়, তখন সংস্থাটি বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনসাধারণের আস্থা হারায়।
  - সংসদ: বর্জন বা অংশগ্রহণ দমনের কারণে বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী দল না থাকলে সংসদ মূলত একতরফা হয়ে পড়ে। সেখানে সরকারের জবাবদিহি বা কার্যকর বিতর্কের কোনো সুযোগ থাকে না।
  - বিচার বিভাগ ও আমলাতন্ত্র: এই প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনেক সময় রাজনীতির প্রভাব দেখা যায়, অনুগতদের বেশি দেখা যায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারায়।
- স্বৈরাচারী শাসন/প্রভাবশালী দলের শাসনের উত্থান: ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল জনগণের প্রকৃত ম্যান্ডেট ছাড়াই ক্ষমতাকে সুসংহত করার সুযোগ পায়। এর ফলে ভিন্নমতকে দমন করা হয় এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে দেশ একটি 'নির্বাচনী স্বৈরাচার' ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে।
- রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সহিংসতা বৃদ্ধি: যখন রাজনৈতিক পরিবর্তনের বৈধ পথ (নির্বাচন) অবরুদ্ধ মনে হয়, তখন রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে পারে। এটি এক বিষাক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যেখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং হানাহানি বাড়ায়। এই সহিংসতা আঘাত, মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুতির কারণ হতে পারে, যা দরিদ্রদের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

- বিরোধিতা এবং ভিন্নমতের দমন: ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনে প্রায়ই বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেপ্তার, প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা এবং ভোটারদের ভয় দেখানোর মতো ঘটনা ঘটে। গণমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ দেওয়ার মতো কৌশলও নেওয়া হয়। এর ফলে সমাজে একধরনের ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়, যার কারণে সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত; অনেকে সেলফ-সেন্সরশিপের পথ বেছে নেন।

- জবাবদিহির অভাব: দুর্বল বিরোধী দল এবং আপসকামী প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে সরকারকে তার কাজের জন্য তেমন কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। এর ফলে দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনার জবাবদিহি এড়ানো সহজ হয়ে যায়।

- গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের ওপর প্রভাব (সেলফ-সেন্সরশিপ): ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের সঙ্গে প্রায়শ জড়িত ভয় ও দমনের পরিবেশ সাংবাদিক ও গণমাধ্যম সংস্থাগুলোর মধ্যে স্ব-সেন্সরশিপের জন্ম দেয়, যা তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনবিতর্ককে সীমিত করে।

**২. অর্থনীতির ওপর প্রভাব**

- বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা: যেখানে স্থিতিশীলতা ও নীতির নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো চলে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্পষ্ট ম্যান্ডেট না থাকা ও আইনের শাসন নিয়ে উদ্বেগ থাকলে দেশি-বিদেশি উভয় বিনিয়োগকারীই নিরুৎসাহিত হয়। দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউই বিনিয়োগ করতে চায় না।

- দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি: ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন হলে জবাবদিহির অভাব দেখা দেয়। আর সরকারকে জবাবদিহি করতে না হলে প্রায়ই দুর্নীতি বেড়ে যায়। এর ফলে দেশের সম্পদ সঠিক জায়গায় ব্যবহৃত হয় না, স্বজনপ্রীতি এবং অবৈধ আর্থিক প্রবাহ বাড়ে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী একদলীয় শাসনের অধীনে বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য অবৈধ আর্থিক প্রবাহ হয়েছে।

- অর্থনৈতিক ধাক্কা ও দুর্বলতা: ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন ঘিরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি তৈরি হয়, তা দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যেমন বাংলাদেশ সম্প্রতি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়া, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং জ্বালানি সংকটের মতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়; এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন বা বিনিয়োগ আকর্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহায়তার ওপর প্রভাব: আন্তর্জাতিক অংশীদারেরা, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো, একটি দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। নির্বাচনে বড় ধরনের অনিয়ম হলে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর ফলে দেশের ওপর কূটনৈতিক চাপ তৈরি হতে পারে, ভিসা নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে। যদিও চীন ও ভারতের মতো কিছু প্রভাবশালী দেশ গণতান্ত্রিক উদ্বেগের চেয়ে নিজেদের কৌশলগত স্বার্থকেই বড় করে দেখে।

- প্রয়োজনীয় সংস্কার থমকে যায়: একটি দেশের অর্থনীতির জন্য অনেক সময় কিছু অজনপ্রিয় কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার (যেমন: আইএমএফের শর্ত মেনে কঠোর ব্যবস্থা, শুল্ক সংস্কার) বাস্তবায়ন করতে হয়। কিন্তু যে সরকারের জনগণের কাছে বৈধতার সংকট থাকে, তারা এ ধরনের অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে পারে। এটি জনগণকে আরও হতাশ করাসহ সামাজিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে।

**৩. জনগণের জীবনের ওপর প্রভাব**

- কণ্ঠস্বর হারানো ও ভোটাধিকার-বঞ্চিত হওয়া: সবচেয়ে বড় এবং সরাসরি আঘাতটি আসে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার মৌলিক অধিকারের ওপর। যখন ভোট কারচুপি হয় বা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় না, তখন মানুষ অনুভব করে যে তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই, তাদের কণ্ঠস্বর দমন করা হয়েছে। এই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় তীব্র হতাশা আর অসহায়ত্ব।

- রাজনৈতিক সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি: নির্বাচনের আগে-পরে যে সহিংসতা হয়; যেমন মারামারি, মৃত্যু, বাস্তুচ্যুতি; তার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হয় সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাদের জীবিকা ব্যাহত হয়। এই সহিংসতা সমাজে ভয় ও মানসিক কষ্টের জন্ম দেয়। অনেক সময় নির্বাচনী সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

- মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার ওপর আঘাত: ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের পর সরকারগুলো প্রায়ই ক্ষমতা ধরে রাখতে ভিন্নমতের ওপর দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। এর ফলে নির্বিচার গ্রেপ্তার, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সাংবাদিক, অধিকারকর্মী ও

সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইনের (যেমন সাইবার নিরাপত্তা আইন) ব্যবহার বেড়ে যায়। এটি সমাজে একধরনের ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে, যার ফলে মানুষ সেলফ-সেন্সরশিপের পথ বেছে নেয়।

- অর্থনৈতিক কষ্ট: ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট; যেমন উচ্চ মূল্যস্ফীতি, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও অব্যবস্থাপনা; সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আঘাত করে। স্বল্প আয়ের মানুষ জীবনধারণের জন্য হিমশিম খায়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কমে আসায় পরিবারগুলোর জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

- শাসন ও জনসেবার মানের অবনতি: যখন জবাবদিহি কম থাকে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিকীকরণ হয়, তখন জনসেবার মান (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো) খারাপ হতে শুরু করে। কারণ, তখন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে।

- ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা: একটি দেশে যখন অবিরাম ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন হতে থাকে, তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে, গভীর হতাশা জন্মায়। দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা সম্পর্কে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে। এটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দুর্নীতি বাড়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতিতে, যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, অধিকার ও কল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই চক্র ভাঙতে হলে সব রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী স্বচ্ছতা, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর প্রতি মৌলিক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

### বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো কেন বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর বারবার বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক কারণ, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং গভীরভাবে প্রোথিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এটি এমন এক সমস্যা, যা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রধান দুটি দল; আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়কেই ভোগান্তিতে ফেলেছে। এর পেছনের মূল কারণগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

#### ১. 'উইনার-টেকস-অল' মানসিকতা এবং আস্থার অভাব

- জিরো-সাম গেম: বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'উইনার-টেকস-অল' বা 'জিরো-সাম গেম'; এই মানসিকতাই প্রধান। ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা ধরে রাখাকে নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসেবে দেখে। তাদের মধ্যে একটি ভয় কাজ করে যে, নির্বাচনে হেরে গেলে তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসাসহ গুরুতর প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে হবে। এই ভয় থেকে তারা নির্বাচনী সততাকে নষ্ট করে হলেও যেকোনো মূল্যে জয়ী হতে চায়।
- গভীর অবিশ্বাস: প্রধান দুটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আস্থাহীনতা গভীর। যখন কোনো দল বিরোধী দলে থাকে, তখন তারা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ তোলে। আবার যখন তারাই ক্ষমতায় আসে, তখন বিরোধী দলের কাছ থেকে একই আচরণের শিকার হয়। এই পারস্পরিক সন্দেহের কারণে নিরপেক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরির বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে।
- 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' না থাকা: বিরোধী দলগুলো সব সময় অভিযোগ করে যে, ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে নির্বাচনের মাঠকে অসম করে তোলে। প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং এমনকি বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তারা এমন পরিস্থিতি তৈরি করে, যেখানে সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

#### ২. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিকীকরণ এবং দুর্বলতা

- নির্বাচন কমিশন (ইসি): সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। কিন্তু প্রায়শই ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবে সংস্থাটি বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। অভিযোগ ওঠে, সরকার ইসির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিজেদের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়। এর ফলে সংস্থাটির নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিণামে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ তেমন একটা দেখা যায় না।
- আমলাতন্ত্র ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা: বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশেও অনেক সময় রাজনৈতিকীকরণ হয়। এর ফলে তারা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে, নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন দলের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন সহজ করতে চাপ দিতে পারে। এর অংশ হিসেবে ভোটারদের ভয় দেখানো, বিরোধী দলের কার্যক্রম দমন করা বা বিভিন্ন অনিয়মের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখার মতো ঘটনা ঘটে।

- বিচার বিভাগ: বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা রাজনৈতিকীকরণ নিয়েও বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, যা নির্বাচনী বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান এবং নির্বাচনী শাসনকে সমুন্নত রাখার পথে একটি বড় বাধা।

**৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি**

- ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বারবার দলীয় সরকারের অধীনে বিতর্কিত নির্বাচন হওয়ার কারণে ১৯৯৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি নিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সব দল সমান সুযোগ পাবে। এই ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচন (যেমন ১৯৯৬, ২০০১) তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্তি: ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। এই সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। বিরোধী দলগুলো বলেছিল, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথটি বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং ক্ষমতাসীনদের জন্য নির্বাচনে কারসাজি করার পথ প্রশস্ত হলো। এই বিলুপ্তিই বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় আস্থার সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক বাতিলে ২০১১ সালের রায় বাতিল করেছে।

**৪. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার**

- প্রচারণার সুবিধা: ক্ষমতাসীন দলগুলো প্রায়ই নির্বাচনী প্রচারণার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ; যেমন সরকারি গাড়ি, ভবন বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান; ব্যবহার করে, যা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নীতির লঙ্ঘন।
- বিরোধিতা দমন: ক্ষমতাসীন দলগুলো প্রায়ই যেসব কৌশল ব্যবহার করে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:
  - গণগ্রেপ্তার: নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগে প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হয়, যা তাদের প্রচারণার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।
  - প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা: বিরোধী প্রার্থীদের ইচ্ছেমতো অযোগ্য ঘোষণা করা হতে পারে।
  - ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতা: ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা প্রায়ই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কথিত সহায়তায় ভোটকেন্দ্রে ভোটার ও বিরোধী দলের সমর্থকদের ভয় দেখায়।
  - সংবাদমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ: স্বাধীন সংবাদমাধ্যম সরকারের সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করলে তাদের সেন্সরশিপ, হয়রানি ও আইনি হুমকির (যেমন সাইবার নিরাপত্তা আইন) মুখোমুখি হতে হয়। এর ফলে একটি সরকারপন্থী প্রচারণার পরিবেশ তৈরি হয়।
  - ব্যালট ভর্তি/ভোট কারচুপি: ব্যালট বাক্স ভর্তি করা, ভোটকেন্দ্র দখল বা ভোটের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার মতো কারসাজির অভিযোগও অহরহ আসে।

**৫. দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব**

- কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব: বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলেই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা নেই বললেই চলে। সব সিদ্ধান্ত আসে একেবারে কেন্দ্র থেকে; সাধারণত দলের শীর্ষ নেতা বা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্য থেকে। এর ফলে দলের ভেতরে ভিন্নমত বা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরুৎসাহিত করা হয়। ফলে দলের বা নেতার প্রতি আনুগত্যের সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক নীতিকে ছাপিয়ে যায়।
- দুর্বল জবাবদিহির সংস্কৃতি: যে দল তার নিজের ভেতরেই জবাবদিহির চর্চা করে না, সেই দল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক জবাবদিহি বজায় রাখবে; এমন সম্ভাবনা কম।

**৬. সংস্কারের জন্য সদিচ্ছার অভাব**

- স্থিতাবস্থা বজায় রাখা: ক্ষমতাসীন দলগুলো এমন একটি ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয়, যা তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই তারা এমন কোনো সংস্কার আনতে অনিচ্ছুক থাকে, যা প্রকৃতই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করবে। সংস্কার প্রচেষ্টা যদি থাকেও, তবে তা বাস্তবতার চেয়ে বাহ্যিক রূপ প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ থাকে।
- নীতির চেয়ে ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার: যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মতো গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিকে ছাপিয়ে যায়।

সমস্যাটি মূলত গভীরভাবে পদ্ধতিগত। দলগুলোর একে অপরের প্রতি চরম বিদ্বেষ, অনাস্থার ইতিহাস এবং ক্ষমতাসীন দলের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ক্ষমতা; এই সবকিছু মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে বাংলাদেশের ক্ষমতায়

থাকা যেকোনো দলের জন্যই বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এই চক্র ভাঙতে হলে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। শক্তিশালী ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং সব প্রধান রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের প্রতি সত্যিকারের অঙ্গীকার দেখাতে হবে; এমনকি যদি এর জন্য তাদের ক্ষমতা হারানোর ঝুঁকিও নিতে হয়।

### নির্বাচনে যখন টাকা কথা বলে

অনেক গণতন্ত্রেই নির্বাচনে অর্থ একটি বড় এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রার্থী মনোনয়ন থেকে শুরু করে ভোটের দিনের হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই টাকার প্রভাব দেখা যায়। এই টাকার খেলা নির্বাচনের স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং শেষ পর্যন্ত এর বৈধতাকেই গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাংলাদেশের নির্বাচনে অর্থ যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে, এখানে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

### ১. প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচন

- মনোনয়ন 'ক্রয়': বাংলাদেশে প্রায়ই আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হওয়ার আগেই বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়, বিশেষ করে দলের মনোনয়ন নিশ্চিত করার জন্য। প্রার্থী হিসেবে ধনী ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীরাই বড় রাজনৈতিক দলগুলোর পছন্দের তালিকায় থাকেন। কারণ, তাঁরা নিজেদের টাকায় নির্বাচনী খরচ চালাতে পারেন, দলের কোষাগারেও বড় অঙ্কের অনুদান দিতে পারেন। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দলের প্রভাবশালী নেতাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থীরা লাখ লাখ টাকা খরচ করেন। এর ফলে অনেক যোগ্য কিন্তু কম ধনী ব্যক্তি উপেক্ষিত থাকেন, যা রাজনীতিকে 'ধনীদের খেলায়' পরিণত করে।
- দলের তহবিলে অনুদান: যেসব প্রার্থীর পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান আছে, তাঁদের কাছ থেকে দলগুলো বড় অঙ্কের অনুদান আশা করে। এই অনুদানের পরিমাণ অনেক সময় তাঁদের অবস্থান ও মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

### ২. প্রচারণা ও জনসম্পর্ক

- উচ্চ প্রচারণা ব্যয়: কার্যকর নির্বাচনী প্রচারণা চালানো ব্যয়বহুল। যেসব জিনিসের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়:
- প্রচার সামগ্রী: পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট, ডিজিটাল কনটেন্ট।
- গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন: টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেওয়া।
- প্রচারণা অবকাঠামো: অফিস ভাড়া, যানবাহন, সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন।
- কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক: প্রচারণা ব্যবস্থাপক, সংগঠক ও বিপুলসংখ্যক মানুষকে একত্র করার জন্য অর্থ প্রদান।
- সমাবেশ ও অনুষ্ঠান: বড় জনসভা আয়োজনের জন্য লজিস্টিক খরচ।
- ভোটার সংহতি: ভোটারদের সমাবেশে বা ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে এবং সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কমিউনিটি ইভেন্ট আয়োজনের জন্য প্রায়ই অর্থ ব্যবহার করা হয়।
- 'স্পিড মানি' ও লজিস্টিক: আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে এবং নির্বাচনের দিন মসৃণ কার্যক্রম নিশ্চিত করতেও প্রায়শই অর্থের প্রয়োজন হয়, কখনো কখনো এর দ্বারা অনানুষ্ঠানিক অর্থ প্রদানও বোঝায়।

### ৩. সরাসরি ভোটার প্ররোচনা (ভোট কেনা)

এটি অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ একটি দিক। এখানে সরাসরি টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়। প্রতিটি ভোটের জন্য অর্থ প্রদান, পণ্য বিতরণ বা ভোটের বিনিময়ে ব্যক্তিগত কোনো সুবিধার প্রতিশ্রুতি প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে স্থানীয় নির্বাচন বা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এলাকায়। এটি প্রকৃত পছন্দের ভিত্তিতে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের নীতিকে সরাসরি ক্ষুণ্ন করে।

### ৪. নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ওপর প্রভাব

অবৈধ ও অনৈতিক হলেও অনেক সময় টাকা দিয়ে নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয় অন্যায্য সুবিধা পাওয়ার জন্য। এর মধ্যে থাকতে পারে সুবিধামতো জায়গায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন, ভোটার তালিকা কারসাজি করা বা গণনা প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানো। নির্বাচন কমিশনের মধ্যেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে; যেমন উচ্চমূল্যে ইভিএম সংগ্রহ, তহবিলের অপব্যবহার; যা নির্বাচনী প্রশাসনের ওপর অর্থের প্রভাব তুলে ধরে।

### ৫. নির্বাচন-পরবর্তী দুর্নীতি

- পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক বজায় রাখা: নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্যদের ওপর নানা ধরনের আর্থিক বাধ্যবাধকতার চাপ থাকে; যেমন স্থানীয় প্রকল্পে অর্থায়ন, নির্বাচনী এলাকায় কার্যালয় বজায় রাখা, দলের তহবিলে নিয়মিত অনুদান দেওয়া ইত্যাদি। নির্বাচনে ব্যয় করা অর্থ তুলে আনার এবং এই চলমান খরচগুলো চালানোর তাগিদ থেকে অনেক সময় তারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে ইন্ধন দিতে পারে।
- ব্যবসা-রাজনৈতিক সম্পর্ক: সংসদে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যা অর্থ ও রাজনীতির মধ্যকার শক্তিশালী সম্পর্ককেই তুলে ধরে। অনেক সময় এই ব্যক্তিরা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসা রক্ষা এবং এর প্রসার করেন, যা স্বার্থের সংঘাত তৈরি করে। পাশাপাশি দেশের ব্যাংকিং ও অবকাঠামোর মতো খাতগুলোতে পদ্ধতিগত দুর্নীতিকে উসকে দেয়।

## বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ)

বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২-এ নির্বাচনী অর্থায়নের জন্য নিয়মাবলি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ব্যয়ের সীমা: খরচের একটি নির্দিষ্ট সীমা দেওয়া আছে আরপিওতে। যেমন একজন সংসদ সদস্য প্রার্থী নির্বাচনে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারবেন।
- হিসাব দাখিল: প্রার্থীদের নির্বাচনী তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের, তাঁদের সম্পদ ও দায়ের বিবরণ জমা দিতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকেও নির্বাচন কমিশনে ব্যয়ের বিবরণ জমা দিতে হয়।
- নিষিদ্ধ খরচ: নির্দিষ্ট ধরনের ব্যানার ব্যবহার বা ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করার মতো কিছু খরচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা: নির্বাচনে ঘুষ দেওয়া, অযাচিত প্রভাব খাটানো বা ব্যয়ের প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার মতো কাজের জন্য কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধানও রয়েছে আরপিওতে।
- তবে বাস্তবে এর প্রয়োগ নিয়ে রয়েছে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।
- যাচাইকরণের দুর্বলতা: প্রায়ই প্রার্থীদের ব্যয় ও অর্থের উৎসের সত্যতা যাচাই করার জন্য শক্তিশালী পদ্ধতি থাকে না নির্বাচন কমিশনের। এর অর্থ হলো, প্রকৃত ব্যয় প্রায়ই আইনি সীমা অতিক্রম করে এবং অর্থের প্রকৃত উৎস অপ্রকাশিত থাকে (ডার্ক মানি)।
- দুর্বল প্রয়োগ: বিধি লঙ্ঘনের জন্য যে শাস্তির বিধান রয়েছে, তার কঠোর প্রয়োগ তেমন একটা দেখা যায় না। এর ফলে একধরনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।
- অনানুষ্ঠানিক অর্থায়ন: নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী অর্থের বেশির ভাগই লেনদেন হয় অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে, যা ট্র্যাক করা বা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন।
- অবদানের সীমার ব্যবধান: দলগুলোর ব্যয়ের সীমা থাকলেও ব্যক্তি বা সত্তা থেকে প্রার্থীদের সরাসরি অবদানের সীমা না-ও থাকতে পারে (প্রার্থীদের কাছে দলের অবদান ব্যতীত)। এতে একজন একক বড় দাতা পুরো প্রচারণা তহবিল সরবরাহ করার সুযোগ পেয়ে যান।

## অর্থের নেতিবাচক প্রভাবের পরিণতি

নির্বাচনে যখন টাকা দিয়ে ফলাফলকে প্রভাবিত করা হয়, তখন তার পরিণতি হয় মারাত্মক এবং সুদূরপ্রসারী। এটি শুধু গণতন্ত্রকেই নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানুষের আস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

### ১. অন্যায্য নির্বাচনী ফলাফল

- ধনী প্রার্থী বা দল বিপুল টাকা খরচ করে প্রচারণায় অন্যদের চেয়ে বহুগুণে এগিয়ে থাকে। তারা টাকা দিয়ে ভোট কেনা বা এলাকাভিত্তিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে একটি অন্যায্য সুবিধা লাভ করে।
- এর ফলে অনেক যোগ্য কিন্তু কম ধনী প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েন, যা গণতান্ত্রিক পছন্দের সংকট তৈরি করে।

**২. দুর্নীতি ও নীতি পক্ষপাত**

- নির্বাচিত হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিরা জনগণের চেয়ে তাঁদের বড় দাতাদের প্রতিই বেশি কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন, জনগণের প্রতি নয়।
- তাঁরা এমন সব আইন পাস করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ওই সব ধনী ব্যক্তি বা করপোরেশনগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে।

**৩. দুর্বল শাসন**

- অর্থের জোরে কারচুপি করে নির্বাচিত নেতারা সাধারণত সত্যিকারের জনসমর্থন বা যোগ্যতা ছাড়া শাসন করেন।
- এর ফলে অকার্যকর বা দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা তৈরি, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার ও খারাপ নীতি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**৪. জনসমর্থন হারানো**

- নাগরিকেরা যখন দেখেন, নির্বাচনে যোগ্যতা বা নীতির কোনো মূল্য নেই, সবকিছু টাকা দিয়ে নির্ধারিত হয়, তখন তাঁরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর থেকেই আস্থা হারিয়ে ফেলেন।
- এর ফলে ভোটারদের অংশগ্রহণ কমে যায়, সন্দেহ ও রাজনৈতিক উদাসীনতা বাড়ে।

**৫. গরিব ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর বর্জন**

- নির্বাচন যখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, তখন সাধারণ নাগরিক, তরুণ, নারী ও সংখ্যালঘুদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন হয়ে যায়।
- এর ফলে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হয়, যা শুধু সমাজের অভিজাতদের সেবা করে।

**৬. মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ**

- ধনী প্রার্থীরা টাকা দিয়ে মিডিয়া ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণ, ভুল তথ্য ছড়াতে এবং বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারে।
- এটি জনসাধারণের ধারণা বিকৃত করে এবং সঠিকভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

**৭. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয়**

- যখন অর্থ দিয়ে ক্ষমতা কেনা যায়, তখন বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- এটি পুরো গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয় এবং কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে উৎসাহিত করে।

**৮. সামাজিক অস্থিরতা**

- যাঁরা এই টাকার রাজনীতিতে নিজেদের বঞ্চিত বা প্রতারিত মনে করেন, তাঁদের মধ্যে একধরনের ক্ষোভ জন্মায়।
- এই ক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, এমনকি বড় ধরনের নাগরিক অস্থিরতাও সৃষ্টি হতে পারে।

শেষ কথা হলো, অর্থ দ্বারা পরিচালিত নির্বাচন গণতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলে, সমাজে বৈষম্য বাড়ায় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করে। তখন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আর জনগণের সেবা করেন না, তাঁরা তাঁদের অর্থ জোগানদাতাদের সেবা করতে পারেন। এভাবেই দুর্নীতি, খারাপ শাসন ও সামাজিক অস্থিরতার এক দুষ্টচক্র তৈরি হয়।

## অর্থের দ্বারা প্রভাবিত নির্বাচনের শিকার দেশগুলো

**ভারত**

সমস্যা: অনেক প্রার্থী আইনি সীমার চেয়ে বেশি খরচ এবং 'কালোটাকা' (অপ্রতিষ্ঠিত নগদ) ব্যবহার করেন।

ফলাফল:

- টাকা দিয়ে ভোট কেনাবেচা হয়।
- অনেক সময় ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা বিতর্কিত প্রার্থীরাও নির্বাচিত হন।
- জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিবিদদের প্রতি অবিশ্বাস ও নির্বাচনের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়।

প্রতিক্রিয়া:

- নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের সম্পদ ঘোষণা বাধ্যতামূলক ও প্রচারণা ব্যয় সীমিত করেছে।
- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার ও মডেল কোড অব কন্ডাক্ট বাস্তবায়ন করেছে।

**যুক্তরাষ্ট্র**

সমস্যা: সুপার প্যাক ও ধনী দাতারা প্রার্থীদের পক্ষে যত খুশি তত টাকা খরচ করতে পারে, যা সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বৈধতা পেয়েছে।

ফলাফল:

- নির্বাচনী প্রচারণায় বিলিয়নিয়ার ও বড় করপোরেশনগুলোর অত্যধিক প্রভাব।
- দেশের নীতি নির্ধারিত হয় দাতা ও লবিস্টদের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে নয়।

প্রতিক্রিয়া:

- প্রচারণা অর্থায়ন সংস্কারের জন্য চাপ, দানের স্বচ্ছতা এবং ছোট দাতাদের জন্য সমতুল্য তহবিল (যেমন নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক ফান্ডিং সিস্টেম)।

**ফিলিপিনস্**

সমস্যা: গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে টাকা দিয়ে ভোট কেনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি।

ফলাফল:

- নির্বাচনে প্রায়ই প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবার ও ধনী এলিটদের সুবিধা হয়। এতে যোগ্য নতুন প্রার্থীদের জন্য রাজনীতিতে আসা কঠিন হয়।
- দুর্নীতি বেড়েছে এবং সরকারি সেবার মান কমেছে।

প্রতিক্রিয়া:

- কিছু স্থানীয় সরকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচারণা চালিয়ে খরচ কমানোর চেষ্টা করছে।
- বেসরকারি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো প্রচারণার খরচের ওপর নজর রাখছে।

**মেক্সিকো**

সমস্যা: প্রার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রভাব পেতে মাদক কার্টেল ও অবৈধ টাকা নির্বাচনে প্রবেশ করছে।

ফলাফল:

- রাজনীতিতে হুমকি, সহিংসতা এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বেড়েছে।
- দেশের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে।

প্রতিক্রিয়া:

- একটি স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থা (আইএনই) গঠন এবং প্রচারণার অর্থায়নের কঠোর নিরীক্ষণ।

## ইতিবাচক সংস্কার কার্যকর করা দেশগুলো

**জার্মানি**

- প্রচারণার অনুদান ও খরচের ওপর শক্ত বিধিনিষেধ।
- সরকারি অর্থায়নের প্রচারণা ধনী দাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমায়।
- স্বচ্ছ অর্থায়ন প্রতিবেদন প্রয়োজন এবং এটি মনিটর করা হয়।

**সুইডেন**

- রাজনৈতিক দলগুলো মূলত পাবলিক ফান্ডিং দ্বারা অর্থায়িত।
- কারা দলকে অনুদান দিচ্ছে, তা প্রকাশ করার জন্য কঠোর আইন আছে। দুর্নীতিও খুব কম।
- নির্বাচনের সময় সব দলের জন্য গণমাধ্যমে প্রচারণার সমান সুযোগ থাকে।

**কানাডা**

- প্রচারণা অনুদানের ওপর সীমাবদ্ধতা এবং খরচের ওপর বিধিনিষেধ।
- স্বচ্ছ প্রকাশ আইন।
- করপোরেট ও ইউনিয়নের অনুদান নিষিদ্ধ।

## বাংলাদেশে নির্বাচনে অর্থের প্রভাব কমানোর জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

বাংলাদেশে নির্বাচনে টাকার প্রভাব কমানোর জন্য বেশ কিছু আইনকানুন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এগুলোর কার্যকর প্রয়োগে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

### ১. ব্যয়ের সীমা ও রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা

- প্রার্থীর খরচের সীমা: ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, একজন সংসদ সদস্য প্রার্থী নির্বাচনে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারবেন।
- দলীয় ব্যয়ের সীমা: ২০০ জনের বেশি প্রার্থী মনোনয়ন দিলে কোনো রাজনৈতিক দল সর্বোচ্চ ৪.৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারে।
- রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা: নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে প্রার্থী এবং ৯০ দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দলকে বিস্তারিত ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হয়। না দিলে জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।

### ২. নির্বাচনী আচরণবিধি

- অনুদান নিষিদ্ধ: নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী বা দল অনুদান বা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।
- সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিষিদ্ধ: প্রচারণায় সরকারি রেস্টহাউস, ডাকবাংলো, যানবাহন বা কর্মচারীদের ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- প্রচারণার নিয়ম: সরকারি সুবিধা ব্যবহার করে প্রচার চালানো বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

### ৩. প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও সংস্কার

- নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা: নির্বাচন কমিশন ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও আচরণবিধি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

প্রস্তাবিত সংস্কার

- নির্বাচনী ব্যয়ের সব লেনদেন ব্যাংক বা মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে করার বাধ্যবাধকতা।
- প্রার্থী ও দলের ব্যয়ের অডিট করা এবং গরমিল পেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
- কমিশনের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি বাড়ানো।

### ৪. চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়ন ঘাটতি

- বাস্তবায়নে দুর্বলতা: আইনি কাঠামো থাকলেও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে।
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদাহরণ: অনেক প্রার্থী ও দল ব্যয়ের হিসাব জমা দেয়নি, অথচ কোনো শাস্তি হয়নি।
- স্বচ্ছতার অভাব: ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ ও নিরীক্ষায় স্বচ্ছতা নেই।

### ৫. চলমান প্রচেষ্টা ও সুপারিশ

নির্বাচনে অর্থের প্রভাব কমাতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে–

- উন্নত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা: ব্যয়ের হিসাব ট্র্যাকিং ও অডিটের জন্য আরও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার।
- প্রকাশ্য রিপোর্টিং: সময়মতো ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ এবং তা জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করা।
- নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি: পর্যাপ্ত অর্থ, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কমিশনের ক্ষমতায়ন।
- আইনি সংস্কার: অবৈধ অর্থ ব্যবহারে কড়া শাস্তির বিধানসহ কঠোর আইন প্রণয়ন।

## বাংলাদেশে অর্থের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণসমূহ

বাংলাদেশে নির্বাচনে টাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পেছনে বেশ কিছু কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে:

### ১. নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা

- আইন থাকলেও কমিশনের সেই আইন প্রয়োগ করার মতো স্বাধীনতা, দক্ষতা বা রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।
- অনেক সময় ব্যয়ের সীমা লঙ্ঘন বা রিপোর্ট না করলেও শাস্তি হয় না।

**২. স্বচ্ছতা ও নজরদারির অভাব**

- প্রচারণার সময় অনেক লেনদেন হয় নগদে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে, যেগুলো ট্র্যাক করা কঠিন।
- খরচের ওপর নজরদারি করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না।
- ব্যয়ের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্যপূর্ণ হয়।

**৩. কালোটাকার ব্যবহার**

- বিশেষ করে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার ব্যবহার একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- টাকা দিয়ে ভোট কেনা বা উপহার দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো গোপনে ঘটে, যা প্রমাণ করা খুব কঠিন।

**৪. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও ভোট কেনা**

- অনেক প্রার্থী নির্বাচনকে একটি 'বিনিয়োগ' হিসেবে দেখেন। তাঁরা নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন এবং পরে ক্ষমতায় গিয়ে সেই টাকা তুলে আনার চেষ্টা করেন।

**৫. রাজনৈতিক দলের জবাবদিহির অভাব**

- দলীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বা অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র দুর্বল।
- যাঁরা বেশি খরচ করতে পারেন বা এলাকায় প্রভাবশালী, তাঁরাই মনোনয়ন পান।

**৬. আইনের ফাঁকফোকর ও পুরোনো আইন**

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বা অনলাইন প্রচারণার ব্যয়ের বিষয়ে আইনে সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই।
- খরচের যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে অনেকে নিয়ম মানেন না।

**৭. জনগণের চাপ ও সচেতনতার অভাব**

- অনেক ভোটার অর্থ ও উপহার পাওয়াকে নির্বাচনী প্রচারণার স্বাভাবিক অংশ মনে করে।
- অর্থভিত্তিক রাজনীতির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম।

**৮. প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি**

- দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশে নির্বাচনে অর্থের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে আইন প্রয়োগের দুর্বলতা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও আইনি দুর্বলতা। এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন সাহসী সংস্কার, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও জনসম্পৃক্ততা।

## অর্থনীতি ও সমাজে নেতিবাচক প্রভাব

নির্বাচনে অর্থের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

**১. দুর্নীতি ও সরকারি অর্থের অপব্যবহার**

- টাকার জোরে নির্বাচিত প্রার্থীরা ক্ষমতায় এসে নিজেদের 'বিনিয়োগ' তুলে আনতে দুর্নীতির আশ্রয় নেন।
- ফলে বাজেটে ভুল বরাদ্দ, অতিরিক্ত চুক্তি, ভুতুড়ে প্রকল্প ও নিম্নমানের অবকাঠামো তৈরি হয়।

**২. অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের বিকৃতি**

- উন্নয়ন প্রকল্প ও নীতিমালা তৈরি হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়, বরং নির্বাচনে প্রার্থীদের অর্থদাতাদের স্বার্থে। নীতিমালা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো প্রার্থীদের অর্থদাতাদের স্বার্থে গঠিত হয়, যা জনগণের স্বার্থের বিপরীতে। উদাহরণস্বরূপ, জমি, লাইসেন্স বা সরকারি চুক্তি রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে চলে যায়, যা ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

**৩. বিনিয়োগের পরিবেশ দুর্বল হওয়া**

- ব্যবসায়ীরা যখন দেখেন যে রাজনৈতিক যোগাযোগই গুরুত্বপূর্ণ, তখন তাঁরা সিস্টেমে আস্থা হারান।
- এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনিশ্চিত প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও অনিয়মিত নিয়ন্ত্রণের কারণে বিনিয়োগে আগ্রহ হারান।

**৪. শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও অর্থনৈতিক অকার্যকারিতা**

- অর্থনির্ভর রাজনীতি অযোগ্য ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়, সেবা প্রদান অকার্যকর হয়, নীতি বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ দুর্বল হয়।

**৫. বৈষম্য বৃদ্ধি**

- এলিটদের অর্থায়নে নির্বাচিত রাজনীতিবিদেরা সাধারণ জনগণের স্বার্থের বিপরীতে নীতি প্রণয়ন করেন।
- ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের চাহিদা উপেক্ষিত হয়।

**৬. অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অবৈধ অর্থনীতির বৃদ্ধি**

- নির্বাচনে কালোটাকা ব্যবহারের ফলে কর ফাঁকি, অর্থ পাচার ও ছায়া অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটে।
- ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি সংকুচিত হয়, সরকারি রাজস্ব ও আর্থিক স্বচ্ছতা দুর্বল হয়।

**৭. জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা হ্রাস**

- জনগণ যখন দেখে ধনসম্পদ দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কিনে নেওয়া যায়, তখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি তাদের আস্থা কমে যায়।
- ফলে নাগরিকদের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ কমে যায় এবং সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়; যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

**৮. অব্যাহত অবনতি চক্র**

রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব → দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের নির্বাচিত হওয়া → উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা → অর্থনীতি দুর্বল হওয়া → ভোটারদের দরিদ্র ও অরক্ষিত থাকা → চক্র পুনরাবৃত্তি।

মোদ্দাকথা হলো, নির্বাচনে টাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তা দেশের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে ধ্বংস করে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে এবং দুর্নীতিকে উসকে দেয়। এর ফলে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি হয়, যেখানে দেশের উন্নয়ন কিছু মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নয়।

## নির্বাচনে অর্থের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশে নির্বাচনে টাকার এই ব্যাপক প্রভাব মোকাবিলা করতে হলে শুধু একটি দিকে নজর দিলেই চলবে না; এর জন্য আইনগত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি, আইনের কার্যকর প্রয়োগ, নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ– এই সবকিছু মিলিয়ে একটি বহুমুখী পরিকল্পনা দরকার। এর জন্য কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

**আইনি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালীকরণ**

**১. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন ও শক্তিশালীকরণ–**

- বাস্তবসম্মত ব্যয়সীমা: বর্তমান নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা এতটাই কম যে, তা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। এর ফলে প্রার্থীরা প্রায়ই মিথ্যা তথ্য দিতে বাধ্য হন। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের জন্য এই সীমা বাস্তব খরচের সঙ্গে মিলিয়ে নির্ধারণ করা উচিত; তবে তা যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত হয়।
- প্রার্থী ও দলগুলোর অনুদানের ওপর সীমা: কোনো ব্যক্তি বা করপোরেট প্রতিষ্ঠান একজন প্রার্থী বা একটি দলকে কত টাকা অনুদান দিতে পারবে, তার একটি কঠোর ও কার্যকর সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। এটি ধনী দাতাদের অযাচিত প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত রাখবে।
- 'অপ্রকাশিত অর্থ' (Dark Money) নিষিদ্ধকরণ: রাজনৈতিক অনুদানের চূড়ান্ত উৎস প্রকাশ বাধ্যতামূলক করে স্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা, যাতে অজ্ঞাত বা শেল কোম্পানি ব্যবহার করে অর্থায়ন রোধ করা যায়।
- প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা জোরদার

- নিয়মিত হিসাব প্রকাশ: শুধু নির্বাচনের পরেই নয়, বরং প্রচারণা চলাকালীন প্রার্থী ও দলগুলোকে নিয়মিতভাবে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হবে। এর ফলে জনগণ পুরো প্রক্রিয়াটির ওপর নজর রাখতে পারবে।
- অনলাইন পাবলিক ডেটাবেজ: সব আর্থিক তথ্য নির্বাচন কমিশনের একটি ওয়েবসাইটে সহজভাবে প্রকাশ করতে হবে, যাতে যে কেউ তা দেখতে পারে।
- সম্পদ বিবরণী যাচাই: নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থীদের সম্পদ বিবরণী কঠোরভাবে যাচাই করার ক্ষমতা দিতে হবে। এই তথ্য ক্রস-চেক করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সহযোগিতা নেওয়া যায়।
- দলীয় মনোনয়নে অর্থায়ন নিয়ন্ত্রণ: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেনগুলো স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছ করা, যা বর্তমানে অঘোষিত ব্যয়ের একটি প্রধান উৎস।
- 'নির্বাচনী ব্যয়'-এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণ: নির্বাচনী ব্যয় বলতে কী বোঝায়, তার সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা, যাতে সব পরোক্ষ খরচ ও প্রচারণার পূর্ববর্তী ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

**২. পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী অর্থায়ন আইন প্রণয়ন:** আরপিওর খণ্ডিত বিধানগুলোর বাইরে গিয়ে একটি নিবেদিত, স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করা উচিত, যা অন্যান্য সফল গণতান্ত্রিক দেশের মতো নির্বাচনী অর্থায়নের সব দিককে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসবে।

নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) শক্তিশালী ও স্বাধীন করা:

**১. ইসির স্বায়ত্তশাসন জোরদার:**

- স্বাধীন নিয়োগ প্রক্রিয়া: প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে নিয়োগ প্রক্রিয়া হতে হবে প্রকৃত স্বাধীন, স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত। এর জন্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাবেক প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- আর্থিক স্বায়ত্তশাসন: নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে। সংস্থাটির বাজেট সরাসরি বরাদ্দ করা হবে এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকবে না। এতে সংস্থাটি সরকারের আর্থিক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে।
- কর্মচারী নিয়োগে স্বায়ত্তশাসন: নির্বাচন কমিশনকে তার সচিবালয় ও কর্মীদের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে নিয়োগ, বদলি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপ থাকবে, যাতে তাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যায়।

**২. ইসির প্রয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধি**

- বিশেষায়িত প্রয়োগ শাখা: নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি বিশেষায়িত, সুসম্পদযুক্ত প্রয়োগ শাখা স্থাপন করতে হবে, যাদের নির্বাচনী আর্থিক অনিয়মের কার্যকর তদন্তের জন্য আইনি ক্ষমতা ও কর্মী থাকবে।
- আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা: অবৈধ টাকার প্রবাহ ট্র্যাক করতে এবং অপরাধীদের বিচার করতে নির্বাচন কমিশন, দুদক, এনবিআর, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে শক্তিশালী, বাধ্যতামূলক ও কার্যকর সহযোগিতা থাকতে হবে।
- দ্রুত ও প্রতিরোধমূলক শাস্তি: নির্বাচন কমিশনকে এমন ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে তারা নিয়ম ভাঙার জন্য দ্রুত ও কার্যকর শাস্তি দিতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে বড় অঙ্কের জরিমানা, প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল, এমনকি বারবার গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে দলের নিবন্ধন বাতিল করার মতো কঠোর পদক্ষেপ। বর্তমান শাস্তিগুলোর বেশির ভাগই খুব হালকা অথবা খুব কম প্রয়োগ হয়।

## স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি

**১. দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা**

- স্বাধীন দুদক: দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সব ধরনের রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। সরকারি কর্মকর্তাদের তদন্ত বা গ্রেপ্তারের জন্য কোনো পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয়; এমন সব আইনি বাধা তুলে দিতে হবে।
- 'কালোটাকা সাদা করার' সুযোগ বন্ধ করা: জাতীয় বাজেটে অবৈধ আয় বৈধ করার (কালোটাকা সাদা করা) যে সুযোগ দেওয়া হয়, তা স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে। কারণ, এটি পরোক্ষভাবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় এবং অর্থ পাচারবিরোধী চেষ্টাকে দুর্বল করে।

**২. সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রসার**

- সাংবাদিকদের সুরক্ষা: সাংবাদিকদের একটি নিরাপদ ও মুক্ত পরিবেশ দিতে হবে, যাতে তাঁরা নির্বাচনী অর্থায়ন, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অর্থায়ন নিয়ে নির্ভয়ে প্রতিবেদন করতে পারেন। কোনো ধরনের হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন বা আইনি প্রতিকূলতার (যেমন সাইবার নিরাপত্তা আইন) শিকার হওয়ার ভয় যেন তাঁদের কাজকে বাধাগ্রস্ত না করে।
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সমর্থন: রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থের উৎস নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ জন্য অনুদান বা বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

**৩. সুশীল সমাজের নজরদারিকে উৎসাহিত করা**

- নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সহায়তা: দেশি-বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ও সমর্থন দিতে হবে, বিশেষ করে যাঁরা নির্বাচনী তহবিলের স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করেন।
- সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করা: সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোকে নির্বাচনী অর্থায়ন নিয়ে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং জনসচেতনতা তৈরির জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে।

## বৃহত্তর পদ্ধতিগত সংস্কার

**১. প্রচারণার ব্যয়হ্রাস**

- সরকারি তহবিল থেকে সহায়তা: রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে আংশিক অর্থায়নের একটি ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবা যেতে পারে। এর ফলে অস্বচ্ছ ব্যক্তিগত অনুদানের ওপর দলগুলোর নির্ভরতা কমবে।
- সরকারি গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার: নির্বাচনী প্রচারণার সময় সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমে (টিভি, রেডিও) ন্যায়সংগত ও নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ব্যয়বহুল ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন কমে আসে।
- বিতর্কের বিন্যাস: টেলিভিশন বিতর্ক এবং পাবলিক ফোরামের আয়োজন করতে হবে, যেখানে প্রার্থীরা তাঁদের মতামত উপস্থাপনের জন্য বিনা মূল্যে প্ল্যাটফর্ম পাবেন।

**২. নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার (দীর্ঘমেয়াদি বিবেচনা)**

- কিছু মহল মনে করে, বর্তমান ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালু করলে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে অর্থের প্রভাব কমতে পারে। কারণ, তখন দলগুলো স্থানীয় ব্যয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আসন জেতার চেয়ে দেশব্যাপী নিজেদের সামগ্রিক ভোটের হার বাড়ানোর দিকে বেশি মনোযোগ দেবে। তবে এটি একটি বিশাল পদ্ধতিগত পরিবর্তন, যার নিজস্ব চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

**৩. রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার**

- রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং আর্থিক স্বচ্ছতার চর্চাকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া যদি গণতান্ত্রিক হয়, তাহলে সেখানে অর্থের প্রভাব কমে আসবে।

**৪. রাজনৈতিক সদিচ্ছা**

সর্বোপরি, যতই ভালো আইন বা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হোক না কেন, রাজনৈতিক দলগুলোর যদি সেগুলো বাস্তবায়ন ও মেনে চলার সদিচ্ছা না থাকে, তবে কোনো কিছুই কাজে আসবে না। বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, রাজনৈতিক অংশীজনদের দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আন্তরিক সংলাপে বসা এবং একটি সর্বজনীন ঐকমত্যে পৌঁছানো।

এই ব্যাপক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার নির্বাচনে অর্থের এই ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে কমাতে পারে এবং একটি সত্যিকারের স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

## বাংলাদেশে নির্বাচন কেন তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ

অনেকের কাছে বাংলাদেশে নির্বাচন তার মূল উদ্দেশ্য; অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা; পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিবর্তে, এটি প্রায়ই এমন এক খেলায় পরিণত হয়েছে, যা সংঘাত ও পারস্পরিক অবিশ্বাস উসকে দিয়েছে।

- 'বিজয়ী সব পায়' মানসিকতা: ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি দুটি প্রধান দলের (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) মধ্যকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। নির্বাচনকে প্রায়ই অস্তিত্বের লড়াই হিসেবে দেখা হয়, যেখানে বিজয়ী দল রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং পরাজিত পক্ষকে প্রান্তিক ও নিগৃহীত করা হয়। এই 'বিজয়ী সব পায়' মানসিকতা রাজনৈতিক সমঝোতা বা সহযোগিতার কোনো সুযোগই রাখে না, যা সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।
- নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক: নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া নিজেই সংঘাতের একটি প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের দাবি, যা একুশ শতকের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এই ব্যবস্থা বাতিল করে দিলে, তা দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা এবং বিরোধী দলের জাতীয় নির্বাচন বর্জনের মতো ঘটনার জন্ম দেয়।
- প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার ক্ষয়: নির্বাচন যত বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে, নির্বাচন কমিশন এবং বিচার বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা তত বেশি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সমালোচকদের মতে, ক্ষমতাসীন দল প্রায়ই এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য ব্যবহার করেছে। এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তির ওপর থেকে জনগণের আস্থা উঠে গেছে।

এই সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেক নির্বাচন বৈধতা তৈরির পরিবর্তে রাজনৈতিক বিভেদকে আরও গভীর করেছে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলো প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে থাকে।

## ধারাবাহিক বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন কি শাসনের উন্নতি ঘটাতে পারে

অতীতের অভিজ্ঞতা যা-ই হোক না কেন, এর উত্তর হলো জোরালোভাবে 'হ্যাঁ'। পরপর কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে পারাটাই বাংলাদেশের দুর্বল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে।

১. **বৈধতা ও জবাবদিহি পুনরুদ্ধার:** বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সরকারের বৈধতার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনবে। যখন একটি সরকার জানে যে ঠিকমতো কাজ না করলে জনগণ ভোট দিয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তখন তার স্বচ্ছভাবে শাসন করা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের জন্য শক্তিশালী প্রণোদনা থাকে। ভোটারদের এই প্রতিক্রিয়ার ভয়ই সুশাসনের চূড়ান্ত প্রয়োগকারী।

২. **রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে উৎসাহিত করা:** প্রকৃত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সব রাজনৈতিক দলের জন্য আরও সমান ক্ষেত্র তৈরি করবে। এটি দেশে নতুন রাজনৈতিক শক্তি ও প্ল্যাটফর্মের উত্থানকে উৎসাহিত করতে পারে, যা দেশকে দুই-দলীয় আধিপত্য এবং 'বিজয়ী সব পায়' মানসিকতা থেকে বের করে আনবে। এর ফলে দলগুলো সংঘাতের রাজনীতির বদলে নীতি ও কর্মসূচির ওপর মনোযোগ দিতে বাধ্য হবে।

৩. **প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা:** ধারাবাহিক বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন স্বাভাবিকভাবেই দেশের মূল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে বাধ্য করবে। একটি নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে হবে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নির্বাচনী আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে হবে। এটি সব দলকে আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতাকে সম্মান করতে চাপ দেবে, যা ধীরে ধীরে হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনবে।

৪. **ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরকে উৎসাহিত করা:** একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর। নির্বাচনকে যদি নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটি বৈধ উপায় হিসেবে দেখা হয়, তবে রাজনৈতিক সহিংসতা, হরতাল ও নির্বাচন বর্জনের মতো প্রবণতা অনেকটাই কমে আসবে। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করবে।

উপসংহারে, যদিও নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, এটি দেশের গণতান্ত্রিক দুর্বলতার মূল কারণ নয়। বরং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে ব্যর্থতা দুর্বল শাসনের একটি পদ্ধতিকে স্থায়ী করেছে। তাই ধারাবাহিক কয়েকটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি কেবল একটি আদর্শ নয়, বরং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেরামত করা এবং একটি আরও স্থিতিশীল ও জবাবদিহিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

যেহেতু রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট উত্তরণের জন্য ধারাবাহিক ভালো নির্বাচন আমাদের একমাত্র এবং প্রধান উপায়, তাহলে নির্বাচনের আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

## গণভোট (Referendum)

গণভোট হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব, আইন বা রাজনৈতিক বিষয়ে ভোটাররা সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের মাধ্যমে তাদের মতামত জানায়। এটি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একটি রূপ, যা সাধারণত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীত। একটি গণভোট বাধ্যতামূলক হতে পারে (আইনগতভাবে একটি নতুন নীতির জন্ম দেয়) অথবা পরামর্শমূলক হতে পারে (একটি বৃহৎ আকারের জনমত জরিপ হিসেবে কাজ করে)।

### গণভোটের ইতিহাস

জনগণের মতামত নেওয়ার এই ধারণা বেশ পুরোনো। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সের মতো নগররাষ্ট্রে এর দেখা মিলত। যেমন এথেন্সে প্রায় এক হাজার পুরুষ নাগরিকের একটি সমাবেশ (Ecclesia) সিদ্ধান্ত নিত। তবে আধুনিক গণভোটের জন্মস্থান বলা হয় সুইজারল্যান্ডকে।

- ষোলো শতকের সুইজারল্যান্ড: 'Referendum' (গণভোট) শব্দটি এবং এর ব্যবহার সুইজারল্যান্ডের গ্রাউবুন্ডেন ক্যান্টনে প্রথম শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়।
- আঠারো শতকের যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ড: লাতিন শব্দ referendum (যার অর্থ 'ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া') আধুনিক অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় সুইজারল্যান্ডের নতুন সংবিধানে। ১৮৪৮ সালে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সুইজারল্যান্ডই গণভোট সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহার করেছে। প্রায় একই সময়ে ১৭৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯ ও ২০ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
- উনিশ ও বিশ শতক: তবে সব সময় যে ভালো উদ্দেশ্যে গণভোট ব্যবহৃত হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এর নানা রকম ব্যবহার ছিল। ফরাসি বিপ্লবের পর প্রথম নেপোলিয়নের মতো স্বৈরাচারী শাসকেরা নিজেদের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য গণ-আবেদন বা প্লেবিসাইট নামক অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স ও ইতালির মতো দেশগুলোর সংবিধানে গণভোটের বিধান যুক্ত করা হয়, বিশেষত সাংবিধানিক সংশোধনের জন্য।

### কোন কোন দেশ, কী কী বিষয়ে গণভোট করে

বিশ্বের বহু দেশ গণভোটের ব্যবহার করে, তবে এর ব্যবহারের হার এবং বাধ্যবাধকতার প্রকৃতি একেক দেশে একেক রকম।

গণভোট ব্যবহারকারী প্রধান দেশগুলো

- সুইজারল্যান্ড: গণভোটের সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহারকারী। ১৮৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় ৬০০টি জাতীয় ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্র: ফেডারেল পর্যায়ে গণভোট না হলেও বেশির ভাগ রাজ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।
- অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ড: এই দুটি দেশেই সংবিধানের যেকোনো পরিবর্তনের জন্য গণভোট বাধ্যতামূলক।
- ইতালি: গণভোট আয়োজনের দিক থেকে সুইজারল্যান্ডের পরেই ইতালির অবস্থান। দেশটি প্রায়ই বিদ্যমান আইন বাতিল করার জন্য গণভোট ব্যবহার করে।

### সাধারণত যেসব সিদ্ধান্ত নিতে গণভোট হয়

১. সাংবিধানিক পরিবর্তন: এটিই গণভোটের সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবহার। অনেক দেশে নতুন সংবিধান গ্রহণ বা বিদ্যমান সংবিধানের কোনো সংশোধনী অনুমোদনের জন্য গণভোট বাধ্যতামূলক।

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চুক্তি: আন্তর্জাতিক বা বহুলাংশে জাতীয় সংস্থায় যোগদান বা বেরিয়ে যাওয়ার মতো বিষয়ে গণভোট হয়। যেমন: ব্রেক্সিট, যার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের জনগণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

৩. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব: কোনো অঞ্চলের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা একটি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ধারণের প্রশ্নে গণভোট হতে পারে।

৪. গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতি: অনেক সময় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন বা নাগরিক অধিকার, আর্থিক বিষয় (বন্ড ইস্যু বা কর বৃদ্ধি) কিংবা সামাজিক বিষয়ে (যেমন: সমলিঙ্গ বিবাহ, গর্ভপাতের অধিকার) জনগণের মতামতের জন্য গণভোটে দেওয়া হয়।

৫. প্রত্যক্ষ উদ্যোগ: কিছু কিছু দেশে সাধারণ নাগরিকেরাই নির্দিষ্টসংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কোনো নতুন আইনের প্রস্তাব করতে পারেন, যা সরাসরি গণভোটে যায়।

গণভোটের ইতিহাস বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল, বিশেষ করে সামরিক শাসন এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে তিনটি জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**১. ১৯৭৭ সালের রাষ্ট্রপতি আস্থার গণভোট (৩০ মে ১৯৭৭)**

- শাসক/প্রেক্ষাপট: শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ক্ষমতায় আসীন হওয়া মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এই গণভোটের আয়োজন করেন।
- বিষয়: এটি ছিল তাঁর শাসনের ওপর আস্থার ভোট, যেখানে ভোটারদের জিজ্ঞেস করা হয়: 'আপনারা কি রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এবং তাঁর গৃহীত নীতি ও কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেন?'
- উদ্দেশ্য: এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শাসন ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে জিয়াউর রহমানের অবস্থানকে বৈধতা দেওয়া।
- ফলাফল: নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায়, এই গণভোটে ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৮৮.০৫ শতাংশ এবং ৯৮.৮৮ শতাংশ ভোট 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে পড়েছে। সরকারি ফলে ব্যাপক আস্থা দেখালেও, বিরোধীরা নির্বাচনটিকে ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য কারচুপি হিসেবে সমালোচনা করে এবং মনে করে, প্রকৃত ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

**২. ১৯৮৫ সালের সামরিক শাসন গণভোট (২১ মার্চ, ১৯৮৫)**

- শাসক/প্রেক্ষাপট: ১৯৮২ সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এটি আয়োজন করেন।
- বিষয়: ভোটারদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: 'আপনারা কি রাষ্ট্রপতি এরশাদের নীতি সমর্থন করেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই প্রশাসন পরিচালনা চালিয়ে যান, তা চান?'
- উদ্দেশ্য: ১৯৭৭ সালের ভোটের মতোই এর লক্ষ্য ছিল এরশাদের অধীনে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকাকে বৈধতা দেওয়া।
- ফলাফল: গণভোটে ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৭২.৪৪ শতাংশ এবং ৯৪.১১ শতাংশ ভোট এরশাদের পক্ষে পড়েছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, ভোটকেন্দ্রে দুটি ব্যালট বাক্স ছিল; একটিতে 'হ্যাঁ' লেখা ছিল এবং এরশাদের ছবি চারদিকে সাঁটানো ছিল, আর অন্যটিতে 'না' লেখা ছিল। কিন্তু বিরোধীরা ভোট বর্জন করে এবং ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলে। অনেক পর্যবেক্ষক ধারণা করেন, প্রকৃত ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

**৩. ১৯৯১ সালের সাংবিধানিক গণভোট (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১)**

- শাসক/প্রেক্ষাপট: এই গণভোট এরশাদের সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো গণ-অভ্যুত্থানের পর অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসে।
- বিষয়: ভোটারদের জিজ্ঞাসা করা হয়: 'রাষ্ট্রপতি কি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল, ১৯৯১-এ সম্মতি দেবেন, না দেবেন না?'
- উদ্দেশ্য: দ্বাদশ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী হবেন নির্বাহী প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি হবেন সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম এবং একমাত্র কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন জাতীয় গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- ফলাফল: তৃতীয় গণভোটের ফলাফলে দেখা যায়, ভোটার উপস্থিতি ছিল ৩৫.২ শতাংশ এবং বিলের পক্ষে ভোট পড়েছিল ৮৩.৬ শতাংশ। এর ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণভোটকে পূর্ববর্তী দুটি গণভোটের তুলনায় অধিক সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়।

### সংবিধানে গণভোটের অবস্থান

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে–

- প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা: প্রথম সামরিক শাসনামলে সামরিক আদেশের মাধ্যমে দফায় দফায় সংবিধান সংশোধন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে এক সামরিক আদেশে সংবিধান সংশোধন করে গণভোটের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা বা অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬ অথবা ১৪২-এর যেকোনো প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য গণভোট আয়োজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।
- ১৯৭৯ সালে পাস হওয়া সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনামলে আনা সমস্ত সংশোধনীকে বৈধতা দেওয়া হয়।
- বাতিল: ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পাস হওয়া পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক সংশোধনের জন্য গণভোটের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়। এর ফলে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা (দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাপেক্ষে) সম্পূর্ণরূপে সংসদের হাতে ফিরে আসে।
- বর্তমান সাংবিধানিক অবস্থা
- গণভোট পরিচালনার জন্য ১৯৯১ সালের গণভোট আইন (Referendum Act, ১৯৯১) বিদ্যমান রয়েছে।
- তবে ২০১১ সালে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অপসারণের কারণে বাধ্যতামূলক জাতীয় গণভোট বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইনের আর কোনো বৈশিষ্ট্য নয়।
- সাম্প্রতিক সময়ে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রস্তাবিত জুলাই সনদ ও সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের ওপর আরেকটি গণভোট অনুষ্ঠান করা নির্ধারিত হয়ে আছে পরবর্তী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই একই সঙ্গে (১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)। রাজনৈতিক ঐকমত্যে এভাবে একই দিনে দুটি নির্বাচন করার ঘটনাও বাংলাদেশের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। এই গণভোট অনুষ্ঠান করতে নির্বাচন কমিশন গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছে।

## নির্বাচনী ইশতেহার কী

নির্বাচনী ইশতেহার হলো একটি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর নির্বাচনের আগে প্রকাশিত একটি নথি/ঘোষণাপত্র। এতে তারা নির্বাচিত হলে সরকার পরিচালনার জন্য তাদের উদ্দেশ্য, নীতি এবং লক্ষ্যগুলো তুলে ধরে। ইশতেহারের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদের দলের প্ল্যাটফর্ম, আদর্শ এবং তারা অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং পরিবেশের মতো বিভিন্ন বিষয়ে কী অর্জন করতে চায়, সে সম্পর্কে অবহিত করা।

ইশতেহারগুলো প্রায়শই প্ররোচনামূলক শৈলীতে লেখা হয়, যাতে ভোটারদের বোঝানো যায় যে প্রস্তাবিত নীতিগুলো তাঁদের সর্বোত্তম স্বার্থে। যদিও এগুলো একটি দলের অভিপ্রায়ের একটি প্রকাশ্য ঘোষণা, ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো সাধারণত আইনত বাধ্যতামূলক হয় না। তবে, মূল প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে জন-অসন্তোষ এবং আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে।

### ঐতিহাসিক পটভূমি

"ইশতেহার" শব্দটি ল্যাটিন "manifestum" থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ "পরিষ্কার" বা "প্রকাশ্য"। ঐতিহাসিকভাবে, শব্দটি কেবল নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে নয়, বিভিন্ন নীতির প্রকাশ্য ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইশতেহার (১৮৪৮), যা শ্রেণিসমাজ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিল। নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক দলগুলোর বিস্তারিত ইশতেহার প্রকাশের প্রথা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রচারণার একটি আরও কাঠামোগত ও কেন্দ্রীয় অংশে পরিণত হয়েছে।

### একটি নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্ব

গণতন্ত্রে একটি নির্বাচনী ইশতেহার বেশ কয়েকটি কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল।

- ভোটারদের অবহিত করা: ইশতেহার একটি দলের নীতির সুস্পষ্ট এবং সুসংগঠিত সারাংশ প্রদান করে, যা ভোটারদের বিভিন্ন দলের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে তুলনা করে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

- জবাবদিহি: ইশতেহার একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে, যার মাধমে একটি শাসক দলকে জবাবদিহি করা যায়। নাগরিক, সংবাদমাধ্যম এবং বিরোধী দলগুলো সরকারের কর্মক্ষমতা যাচাই করতে পারে এবং দেখতে পারে যে এটি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে কি না অথবা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে কিছু করছে কি না।

- অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ: ইশতেহারগুলো নির্বাচনের সময় জনবিতর্কের সুযোগ তৈরি করে। তারা মূল বিষয়গুলো তুলে ধরে এবং দলগুলোকে তাদের সমাধান উপস্থাপন করতে বাধ্য করে, ফলে জাতীয় বিতর্ক তৈরি হয়।

- গণরায় তৈরি: যখন একটি দল নির্বাচনে জয়লাভ করে, তখন এটি প্রায়শই দাবি করে যে তার ইশতেহার তাকে তার নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য জনগণের কাছ থেকে একটি গণরায় দিয়েছে। এটি সরকারের আইন প্রণয়নমূলক অ্যাজেন্ডার জন্য একটি বৈধ ভিত্তি প্রদান করে।

**বাস্তবায়নে ক্ষমতাসীন দলগুলোর ভূমিকা**

একটি ক্ষমতাসীন দল তার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করে। একবার ক্ষমতায় আসার পর, সরকার তার ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলোকে বেশ কয়েকটি উপায়ে প্রকৃত নীতিতে পরিণত করতে পারে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আইন প্রণয়ন: ইশতেহারে বর্ণিত নীতিগুলো কার্যকর করার জন্য সরকার সংসদে নতুন আইন প্রবর্তন ও পাস করতে পারে।

- নির্বাহী পদক্ষেপ: সরকার প্রশাসনিক আদেশ এবং নিয়মের মাধ্যমে নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে।

- বাজেট বরাদ্দ: সরকারের বার্ষিক বাজেট নির্দিষ্ট প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি মূল প্রক্রিয়া।

যদিও একটি ক্ষমতাসীন দলের তার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক উদ্দীপনা রয়েছে, তবে বিভিন্ন কারণ সম্পূর্ণ বাস্তবায়নকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সংকট বা জনমতের পরিবর্তন, একটি সংখ্যালঘু বা জোট সরকার বিভিন্ন ইস্যুতে আপোস করে।

## কেন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের নিজস্ব নির্বাচনী ইশতেহার উপেক্ষা করে

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন দলগুলো প্রায়শই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকার জন্য সমালোচিত হয়। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে:

- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সংঘাত: বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রধান দলগুলোর মধ্যে গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঐকমত্যের অভাব দ্বারা প্রভাবিত। এই সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ একটি ক্ষমতাসীন দলের মনোযোগকে নীতি বাস্তবায়ন থেকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং ক্ষমতা ধরে রাখার দিকে সরিয়ে নিতে পারে।

- দুর্বল জবাবদিহির প্রক্রিয়া: সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো; যেমন সংসদ এবং সংবাদমাধ্যম, দুর্বল হতে পারে। এটি ক্ষমতাসীন দলের ওপর তার প্রতিশ্রুতিগুলো অনুসরণ করার চাপ হ্রাস করে।

- অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং দুর্নীতি: দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার মতো সমস্যাগুলো একটি সরকারের পক্ষে তার নীতিগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন করে তোলে, এমনকি যদি তার রাজনৈতিক সদিচ্ছাও থাকে।

- প্রতিশ্রুতিগুলোর অ-বাধ্যতামূলক প্রকৃতি: যদিও একটি ইশতেহার ভোটারদের সঙ্গে একটি নৈতিক এবং রাজনৈতিক চুক্তি, এটি আইনত প্রয়োগযোগ্য নয়। এমন একটি ব্যবস্থায় যেখানে রাজনৈতিক জবাবদিহি দুর্বল, দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কম চাপ অনুভব করতে পারে।

- জনপ্রিয়তাবাদী বাগাড়ম্বরের ওপর মনোযোগ: কখনো কখনো ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো ব্যবহারিক বাস্তবায়নের চেয়ে স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয়তাবাদী আবেদনের জন্য বেশি ডিজাইন করা হয়। দলগুলো ভোট জেতার জন্য একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা বা সংস্থান ছাড়াই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

সর্বোপরি, যদিও নির্বাচনী ইশতেহারগুলো গণতান্ত্রিক অনুশীলনের একটি ভিত্তি, তবে তাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং কার্যকারিতা একটি দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জন-নজরদারি ও জবাবদিহির মাত্রার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

### আইনি বাধ্যবাধকতা নেই কেন

বাংলাদেশে, বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক দেশের মতোই, নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য তাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণ করার কোনো সরাসরি আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। নির্বাচনী ইশতেহারকে ভোটারদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে এটি কোনো আইনি চুক্তি নয়।

এখানে মূল বিষয়গুলোর একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হলো–

- রাজনৈতিক বনাম আইনি অঙ্গীকার: একটি নির্বাচনী ইশতেহার হলো একটি দলের উদ্দেশ্য এবং নীতির একটি প্রকাশ্য ঘোষণা। যখন একটি দল জয়লাভ করে, তখন তারা জনগণের কাছ থেকে সেই নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি "গণরায়" (mandate) পাওয়ার দাবি করে। এটি প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের জন্য একটি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, কিন্তু এটি আইনত প্রয়োগযোগ্য কোনো দায়িত্ব তৈরি করে না।

- আইনি কাঠামোর অভাব: বাংলাদেশের সংবিধান বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (RPO) এমন কোনো নির্দিষ্ট আইন বা বিধান নেই, যা একটি বিজয়ী দলকে আইনত তার ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো কার্যকর করতে বাধ্য করে।

- নির্বাচন কমিশনের মনোযোগ: বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের প্রধান ভূমিকা হলো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করা। এর কর্তৃত্ব মূলত নির্বাচনের আচরণবিধি, যেমন প্রচারণা অর্থায়ন, প্রার্থীদের জন্য আচরণবিধি এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার ওপর বেশি নিবদ্ধ, নির্বাচনের পর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর নয়।

- জবাবদিহি হলো রাজনৈতিক: একটি দলের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক। ভোটাররা পরবর্তী নির্বাচনে সেই দলকে ভোট না দিয়ে তাদের জবাবদিহি করতে পারে। সংবাদমাধ্যম, সুশীল সমাজ এবং বিরোধী দলগুলোও সরকারের কর্মক্ষমতা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের বিরুদ্ধে যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করে।

- বিতর্ক এবং পরিবর্তনের আহ্বান: অনেক দেশ, বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, নির্বাচনী ইশতেহারকে আইনত বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তি হলো, এটি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে, জবাবদিহি বাড়াবে এবং দলগুলোকে কেবল ভোট জেতার জন্য অবাস্তব বা বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত রাখবে। তবে, এমন কোনো পরিবর্তন এখনো আইনে পরিণত হয়নি।

সংক্ষেপে, যদিও একটি ইশতেহার ভোটারদের অবহিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং একটি বিজয়ী দলের বৈধতার ভিত্তি, এর প্রয়োগ রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জনমতের চাপের বিষয়, কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নয়।

### রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে তাদের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

পশ্চিমা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহারকে গুরুত্বসহকারে নেওয়ার প্রধান কারণ হলো পরবর্তী নির্বাচনে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই "ব্যালট বাক্সের ভয়" জবাবদিহির একটি ব্যবস্থা তৈরি করে, যা তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত।

১. নির্বাচনী জবাবদিহি: ভোটাররা একটি দলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য ইশতেহারকে একটি মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। যদি কোনো দল তার মূল প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে সংবাদমাধ্যম এটি তুলে ধরবে এবং বিরোধী দলগুলো পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারণায় এটিকে একটি প্রধান বিষয় হিসেবে ব্যবহার করবে। এর ফলে জন-আস্থার সংকট, ভোটার সমর্থন হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন হতে পারে।

২. সংবাদমাধ্যম এবং জনগণের নজরদারি: পশ্চিমা গণতন্ত্রে একটি শক্তিশালী এবং প্রায়শই সমালোচনামূলক সংবাদমাধ্যম ব্যবস্থা রয়েছে। সাংবাদিক, তথ্য যাচাইকারী সংস্থা এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা সরকারের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলোর ওপর তার অগ্রগতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা এমন প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন, যা পূরণ হওয়া, ভঙ্গ হওয়া বা চেষ্টা করা হয়নি এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। এই সার্বক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করে যে একটি দলের কার্যক্রম স্বচ্ছ এবং ভোটাররা ভালোভাবে অবহিত।

৩. দলীয় ঐক্য এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা: একটি ইশতেহার শুধু জনগণের জন্য নয়; এটি দলের জন্যও একটি বাধ্যতামূলক দলিল। এটি প্রায়শই বিভিন্ন উপদল এবং সদস্যদের জড়িত করে একটি কঠোর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। একবার গৃহীত হলে, এটি একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার উৎস হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রী, সাধারণ সদস্যসহ দলীয় সদস্যদের ইশতেহারের নীতিগুলো সমর্থন করার কথা। এটি থেকে বিচ্যুত হলে অভ্যন্তরীণ সংঘাত, দলীয় নেতৃত্বের ক্ষতি এবং দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে বলে জনগণের ধারণার জন্ম হতে পারে।

৪. সুনাম এবং বিশ্বাসযোগ্যতা: একটি দলের বিশ্বাসযোগ্যতা তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বারবার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হলে তার সুনাম নষ্ট হয়, যার ফলে ভবিষ্যতে নির্বাচনে জেতা কঠিন হয়ে পড়ে। ভোটাররা দলটিকে অবিশ্বস্ত হিসেবে দেখতে শুরু করতে পারে, যার দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনী ফলাফলের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

### ক্ষমতায় থাকা দলগুলো কীভাবে সরকারকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাধ্য করে

যখন একটি রাজনৈতিক দল বা কয়েকটি দলের জোট সরকার গঠন করে, তখন কেবল আমলাতন্ত্র নয়, দলের নেতৃত্বই ইশতেহার বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি হয়।

১. আইন প্রণয়নের ওপর নিয়ন্ত্রণ: ক্ষমতায় থাকা দলের আইন প্রণয়নের অ্যাজেন্ডার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। এটি ইশতেহারে বর্ণিত নীতিগুলো কার্যকর করার জন্য সংসদে বিল উপস্থাপন এবং আইন পাস করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবস্থায়, যেখানে একটি দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, সেখানে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া সাধারণত মসৃণ হয়, যা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সহজ করে তোলে। একটি জোট সরকারে, ইশতেহারটি জোটের অংশীদারদের মধ্যে আলোচনার ফলাফল হয় এবং এটি বাস্তবায়নে তাদের একটি যৌথ আগ্রহ থাকে।

২. মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রী পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ: মন্ত্রিসভা, যা ক্ষমতাসীন দল (বা দলগুলো) থেকে আসা মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত, সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের কাজ তদারক করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি একটি প্রধান হাতিয়ার। ক্ষমতাসীন দলের অর্থমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা নিশ্চিত করে যে নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রকল্প এবং কর্মসূচিগুলোতে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। এটি প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে পরিণত করার একটি খুব বাস্তব উপায়।

৩. নির্বাহী আদেশ এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ: সরকার নতুন আইন ছাড়াই নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে নীতি বাস্তবায়ন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সরকার ইশতেহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য বেসামরিক কর্মচারীদের নির্দেশ দিতে, সরকারি সংস্থাগুলোকে সংস্কার করতে বা নিয়মাবলি পরিবর্তন করতে পারে।

মূলত, সরকারের সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতি ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য নিয়োজিত করা হয়। যদিও একটি দল অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না-ও পারে, তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে গঠিত যে তাদের চেষ্টা করার জন্য শক্তিশালী প্রণোদনা তৈরি হয়। ভোটারদের আস্থা এবং ফলস্বরূপ ক্ষমতা হারানোর হুমকিই পশ্চিমা গণতন্ত্রে নির্বাচনী ইশতেহারের চূড়ান্ত প্রয়োগকারী।

### প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হলে ভোটাররা কী করতে পারেন

যেহেতু একটি দলের নির্বাচনী ইশতেহার আইনত বাধ্যতামূলক নয়, তাই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে ভোটারদের কোনো আইনি প্রতিকার (যেমন সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা) থাকে না। তবে, ভোটারদের কাছে দলগুলোকে জবাবদিহি করার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক হাতিয়ার রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো একটি কার্যকর গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি:

#### ১. ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে রাজনৈতিক জবাবদিহি

এটি সবচেয়ে সরাসরি এবং কার্যকর প্রতিকার।

- ভোট দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরানো: ভোটারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো পরবর্তী নির্বাচনে একটি দলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা। যে দল তার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়, তাকে জন-অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হয়, ফলে ভোট কমে যায়। এই নির্বাচনী শাস্তির হুমকি দলগুলোর জন্য তাদের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করার একটি প্রধান অনুপ্রেরণা।
- সমর্থন পরিবর্তন করা: ভোটাররা এমন বিরোধী দলগুলোর দিকে তাদের সমর্থন সরাতে পারে, যাদের ইশতেহার আরও বিশ্বাসযোগ্য বা প্রতিশ্রুতি পূরণের আরও ভালো রেকর্ড রয়েছে। এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য হয়।

#### ২. সংবাদমাধ্যম এবং জনগণের নজরদারি

একটি স্বাধীন এবং কার্যকর সংবাদমাধ্যম এবং সক্রিয় সুশীল সমাজ সরকারগুলোকে জবাবদিহি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- জনবিতর্ক এবং সমালোচনা: ভোটাররা সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং জনফোরামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার জন্য সরকারের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে পারে। এটি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বিষয়টি জনগণের নজরে রাখে।

- তথ্য যাচাই এবং বিশ্লেষণ: সাংবাদিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো সরকারের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলোর ওপর তার অগ্রগতি পদ্ধতিগতভাবে ট্র্যাক করতে পারে এবং প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব কাজের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে এমন প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে পারে।
- আবেদন এবং প্রতিবাদ: নাগরিকেরা অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং পদক্ষেপের দাবিতে আবেদন এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আয়োজন করতে পারে।

**৩. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা**

ভোটাররা এমন পদক্ষেপের পক্ষে কাজ করতে পারে এবং সমর্থন করতে পারে, যা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে।

- স্বচ্ছতার দাবি: ভোটাররা প্রশাসনে আরও স্বচ্ছতার জন্য আহ্বান জানাতে পারে, যার মধ্যে নীতি বাস্তবায়ন এবং জন ব্যয়ের নিয়মিত প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থাগুলো এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- শক্তিশালী বিরোধী দলকে সমর্থন: একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর বিরোধী দল অপরিহার্য। ভোটাররা এমন বিরোধী দলগুলোকে সমর্থন করতে পারে, যারা সরকারকে জবাবদিহি করতে এবং কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- সংস্কারের পক্ষে সমর্থন: কিছু দেশে, ইশতেহারগুলোকে আইনত বাধ্যতামূলক করা উচিত কি না বা দলগুলোকে অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত রাখতে আরও কঠোর নিয়ম রাখা উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। ভোটাররা এই ধরনের সংস্কারের পক্ষে সমর্থন করতে পারে, যাতে ব্যবস্থাটি আরও শক্তিশালী হয়।

উপসংহারে, যদিও ভোটারদের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী দলের বিরুদ্ধে কোনো আইনি মামলা করার সুযোগ না-ও থাকতে পারে, তাদের কাছে রাজনৈতিক জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার রয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিকার তাদের সম্মিলিতভাবে জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, দায়িত্বশীল শাসনকে পুরস্কৃত করতে এবং বিশ্বাসভঙ্গকে শাস্তি দিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার মধ্যে নিহিত।

একজন রাজনৈতিক রিপোর্টার দলগুলোর অতীত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিগুলো পর্যালোচনা এবং সেগুলোর সঙ্গে নতুন প্রতিশ্রুতির তুলনা করে ভালো প্রতিবেদনের ধারণা পেতে পারেন।

## “প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়”; গণতন্ত্রে এর গুরুত্ব কী

“প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়”; এর অর্থ হলো একটি সরকার কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর কর আরোপ করতে পারবে না, যদি ওই জনগোষ্ঠীর সেই আইন প্রণয়নকারী সংস্থায়, যা কর আরোপ করে, সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কোনো কণ্ঠস্বর না থাকে।

**সারসংক্ষেপে, এটি দাবি করে:**

- শাসিতদের সম্মতি: জনগণ কীভাবে শাসিত হবে, তাদের অর্থ কীভাবে সংগ্রহ ও ব্যয় করা হবে, সে বিষয়ে তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত।
- জবাবদিহি: নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের ভোটদাতাদের কাছে জবাবদিহি করেন, যাঁরা তাঁদের পদে বসিয়েছেন। যদি নাগরিকদের ওপর কর আরোপ করা হয়, তবে তাঁদের উচিত সেই কর আরোপকারীদের নির্বাচন বা অপসারণ করার ক্ষমতা রাখা, যা আর্থিক নীতিগুলোর জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করে।
- ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা: কর আরোপ ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী কাজ হওয়া উচিত নয়, বরং উন্মুক্ত বিতর্ক এবং আইনগত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত হওয়া উচিত; যেখানে জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

**ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট**

“প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়” (No taxation without representation) বাক্যাংশটি গণতান্ত্রিক চিন্তার একটি মূল ভিত্তি, যার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, একটি স্পষ্ট অর্থ এবং আধুনিক শাসনের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

“প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়” স্লোগানটি আমেরিকান বিপ্লবের (১৭৬৫-১৭৮৩) সময় খ্যাতি লাভ করে। তবে, এর অন্তর্নিহিত নীতির শিকড় ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও গভীর, বিশেষ করে রাজা এবং সংসদের মধ্যে সংগ্রামে প্রোথিত।

১. ম্যাগনা কার্টা (১২১৫): এই মৌলিক দলিল, যদিও সরাসরি বাক্যাংশটি ব্যবহার করেনি, তবে এর মাধ্যমে প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল যে রাজা "রাজ্যের সাধারণ পরিষদ" (যা পরে সংসদে রূপান্তরিত হয়) এর সম্মতি ছাড়া নির্দিষ্ট কর আরোপ করতে পারবেন না। এটি কর আরোপের ক্ষেত্রে রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সীমিত করার একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল।

২. ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-১৬৫১) এবং গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮): এই সময়কালগুলো সংসদ যে "অর্থের ক্ষমতা" (power of the purse) ধারণ করে, সেই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে। জন হ্যাম্পডেনের মতো ব্যক্তিরা সংসদীয় সম্মতি ছাড়া রাজা প্রথম চার্লস কর্তৃক আরোপিত কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন, যা পিটিশন অব রাইট (১৬২৮) তৈরিতে অবদান রাখে, যেখানে বলা হয়েছিল যে "সংসদের সাধারণ সম্মতি" ছাড়া কোনো কর আরোপ করা যাবে না। ১৬৮৯ সালের ইংলিশ বিল অব রাইটস এই নীতিকে আরও শক্তিশালী করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে সংসদের অনুমোদন ছাড়া রাজার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা অবৈধ।

৩. মার্কিন উপনিবেশসমূহ (১৭৬০-এর দশক): সাত বছরের যুদ্ধের (ফরাসি ও ব্রিটিশ যুদ্ধ) পর ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদে আমেরিকান উপনিবেশবাদীদের জন্য এই বাক্যাংশ একটি জোরালো স্লোগানে পরিণত হয়। যুদ্ধে ব্রিটেন ব্যাপকভাবে ঋণী হয়ে পড়েছিল (যা তারা উপনিবেশগুলোকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছিল বলে যুক্তি দিয়েছিল) এবং প্রথমবারের মতো উপনিবেশগুলোর ওপর সরাসরি কর আরোপ করা শুরু করে, যেমন ১৭৬৫ সালের স্ট্যাম্প অ্যাক্ট এবং ১৭৬৭ সালের টাউনশেন্ড অ্যাক্টস।

উপনিবেশবাদীরা যুক্তি দিয়েছিল যে তারা তাদের নিজস্ব ঔপনিবেশিক আইনসভা (যেখানে তাদের প্রতিনিধি ছিল) দ্বারা আরোপিত কর দিতে ইচ্ছুক, তবে ব্রিটিশ সংসদ দ্বারা তাদের ওপর কর আরোপ করা উচিত নয়; কারণ, সেখানে তাদের কোনো সরাসরি প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

ব্রিটিশ সংসদ প্রাথমিকভাবে "ভার্চুয়াল প্রতিনিধিত্ব" এর পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল, দাবি করেছিল যে সংসদের সকল সদস্য সকল ব্রিটিশ প্রজার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে উপনিবেশের লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত। তবে, এই ধারণা উপনিবেশগুলো ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যারা প্রকৃত, সরাসরি প্রতিনিধিত্ব চেয়েছিল।

আইনজীবী জেমস ওটিস জুনিয়র প্রায়শই তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর আরোপ করা স্বৈরাচার" (Taxation without representation is tyranny) দিয়ে এই অনুভূতিকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব পান। ১৭৬৫ সালের স্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেস একটি "অধিকার ও অভিযোগের ঘোষণা" জারি করে, যা তাদের ব্যক্তিগতভাবে বা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের সম্মতি ছাড়া কর আরোপের প্রতি তাদের আপত্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে।

"প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়" বাক্যাংশটি প্রথম স্পষ্টভাবে ১৭৬৮ সালে লন্ডনের একটি ম্যাগাজিনের শিরোনামে প্রকাশিত হয়, যেখানে লর্ড ক্যামডেনের ডিক্লারেটরি বিলসংক্রান্ত বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এটি আমেরিকান বিপ্লব এবং তাদের স্ব-শাসনের অনুসন্ধানের মূল অভিযোগকে মূর্ত করে তুলেছিল।

### প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়: গণতন্ত্রে এর গুরুত্ব কী

"প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর নয়" নীতিটি গণতন্ত্রে কয়েকটি কারণে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ

১. গণতান্ত্রিক বৈধতার ভিত্তি: এটি প্রতিষ্ঠা করে যে বৈধ সরকারি ক্ষমতা, বিশেষ করে কর আরোপের ক্ষমতা, শাসিতদের সম্মতি থেকে উদ্ভূত হয়। প্রতিনিধিত্ব ছাড়া, কর আরোপকে একটি স্বেচ্ছাচারী, চাপানো হিসেবে গণ্য করা হয়, যা সরকারের বৈধতাকে ক্ষুণ্ন করে।

২. জবাবদিহি নিশ্চিত করে: যখন নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে, তখন সেই প্রতিনিধিরা তাঁদের ভোটারদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন, যার মধ্যে করসংক্রান্ত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে; কারণ, তাঁদের পুনর্নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হয়। এটি সরকারি জবাবদিহির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া তৈরি করে।

৩. স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিরোধ করে: ঐতিহাসিকভাবে, শাসকেরা প্রায়শই যুদ্ধ, ব্যক্তিগত বিলাসিতা বা ক্ষমতা একত্র করার জন্য সম্মতি ছাড়াই কর আরোপ করতেন। প্রতিনিধি সংস্থাগুলোকে কর অনুমোদনের প্রয়োজনীয় কার্যনির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করে, যা স্বৈরাচারী শাসন প্রতিরোধ করে এবং ক্ষমতাকে ছড়িয়ে রাখে।

৪. নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও মালিকানা বাড়ায়: যখন নাগরিকেরা জানেন যে তাঁদের কর তাঁদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তখন তাঁরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত হতে, সরকারি ব্যয় অনুসরণ করতে এবং জনসম্পদের ওপর মালিকানার অনুভূতি অনুভব করতে বেশি আগ্রহী হন। এটি একটি শক্তিশালী নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

৫. সামাজিক চুক্তির প্রতিফলন: এটি সরকার এবং শাসিতদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তির ধারণাটিকে শক্তিশালী করে: নাগরিকেরা করের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখতে সম্মত হয়, তবে শুধু সেই অবদানের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের বিষয়ে তাদের মতামতের বিনিময়ে।

৬. ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করে: কর আরোপে প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে একটি মৌলিক স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হয়। এটি ব্যক্তিদের তাদের সম্পত্তি রাষ্ট্র দ্বারা যথেচ্ছ গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করে, ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার বজায় থাকে।

আধুনিক গণতন্ত্রে, এই নীতি প্রতিনিধিত্বশীল আইনসভা (সংসদ, কংগ্রেস) এর মাধ্যমে নিহিত থাকে, যারা কর আরোপের প্রাথমিক ক্ষমতা ধারণ করে এবং যাদের সদস্যরা তাদের ওপর কর আরোপকারী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। এটি আজও একটি প্রাসঙ্গিক ধারণা, প্রায়শই সেই গোষ্ঠী বা অঞ্চলগুলো দ্বারা আহ্বান করা হয়, যারা মনে করে যে তাদের পর্যাপ্ত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর ছাড়াই কর আরোপ করা হচ্ছে।

**বাংলাদেশে সংসদ কীভাবে তার করসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে**

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, শুধু সংসদই কর আরোপ ও আদায়ের একমাত্র কর্তৃপক্ষ। এই ক্ষমতা সংবিধানের ৮৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না।"

সংসদের করসংক্রান্ত ক্ষমতা মূলত আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে বাজেট এবং অর্থ বিলের মাধ্যমে।

- বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (বাজেট): সরকার প্রতিবছর সংসদে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, যা সাধারণত বাজেট নামে পরিচিত, পেশ করে। এই নথিতে আসন্ন অর্থবছরের জন্য আনুমানিক প্রাপ্তি (কর রাজস্ব সহ) এবং ব্যয়ের রূপরেখা দেওয়া থাকে।
- অর্থ বিল: সরকারের কর প্রস্তাবগুলো অর্থ বিলের মাধ্যমে সংসদে উত্থাপন করা হয়। অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রবর্তিত এই বিল প্রস্তাবিত কর পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান কর আইন (যেমন আয়কর অধ্যাদেশ বা মূল্য সংযোজন কর আইন) সংশোধনের চেষ্টা করে।
- অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ: সংসদ অর্থ বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে, এর ওপর বিতর্ক করে এবং ভোট দেয়। সংসদের কর প্রস্তাবগুলো অনুমোদন, হ্রাস বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রয়েছে। এই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে নির্বাহী বিভাগের কর পরিকল্পনাগুলো সংসদীয় সম্মতির অধীন, যার ফলে দেশের অর্থের ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ বিলটি একটি সংসদীয় আইন হিসেবে চূড়ান্তভাবে পাস হওয়ার পরই কর আদায়ের আইনি অনুমোদন পাওয়া যায়।

তবে বাংলাদেশে এর ব্যত্যয়ও ঘটে। যেমন সারা বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এস আরও জারির মাধ্যমে কর বাড়ানো এবং কমানোর কাজ করে। আগে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক হতো। কিন্তু এখন বিষয়টা সবার কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে।

## রাজনৈতিক দল

গণতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য শুধু সুচারুভাবে পরিচালিত নির্বাচন, সংসদ, একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া; এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি; বিশেষ করে সুদৃঢ়, স্বচ্ছ, অভ্যন্তরীণভাবে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক দলসমূহ।

রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করে; ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতাদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে এবং সরকার গঠনের জন্য নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করে। সরকারে থাকুক বা না থাকুক, রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব হলো সমষ্টিগত সামাজিক স্বার্থকে জননীতিতে রূপান্তর করা। আইনসভায়, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাহী এবং আইনসভার মধ্যে সম্পর্ক গঠনে এবং আইন প্রণয়নমূলক অ্যাজেন্ডাকে অগ্রাধিকার দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০০২ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন বিভক্ত বিশ্বে গণতন্ত্রকে জোরদার করার ওপর জোর দিয়ে বলেছে, "একটি সুচারুভাবে পরিচালিত গণতন্ত্র জনগণের প্রতি সংবেদনশীল সুচারুভাবে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভরশীল।"

## রাজনৈতিক দল কী

একটি রাজনৈতিক দল হলো একটি সংগঠিত গোষ্ঠী, যা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের জন্য গঠিত হয়। সাধারণত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকার গঠন বা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তারা এটি করে।

সংজ্ঞাটির মূল উপাদানগুলোর একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

- সংগঠিত গোষ্ঠী: এটি শুধু একই মতাদর্শের ব্যক্তিদের সমষ্টি নয়; এটি একটি সুসংগঠিত সত্তা, যার একটি কাঠামো, নিয়মাবলি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি রয়েছে।
- রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের লক্ষ্য: এটিই দলের মূল উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দলগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন সংসদ, নির্বাহী শাখা) নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য বা ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারের জন্য নির্বাচনে জয়লাভ করতে চায়।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা লাভের জন্য এটিই সবচেয়ে দৃশ্যমান ও সাধারণ পদ্ধতি। তারা প্রার্থী মনোনয়ন করে, প্রচারণা চালায় এবং তাদের প্রতিনিধিদের সমর্থন করার জন্য ভোটারদের একত্র করে।
- একই রাজনৈতিক লক্ষ্য ও মতামত (আদর্শ/নীতিমালা): যদিও সব দল কঠোরভাবে আদর্শিক হয় না, তবে বেশির ভাগ দলই একগুচ্ছ বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা নীতিগত লক্ষ্য ভাগ করে নেয়, যা তাদের সদস্যদের একত্র রাখে। এটি একটি ব্যাপক আদর্শ (যেমন উদারনীতিবাদ, রক্ষণশীলতা, সমাজতন্ত্র), নির্দিষ্ট বিষয়ে ফোকাস বা শাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি বিস্তৃত নীতিমালা হতে পারে।
- জননীতিকে প্রভাবিত করে: এমনকি যদি একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন না-ও করে, তাহলেও তারা আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব, জনবিতর্ক এবং ওকালতির মাধ্যমে জননীতিকে প্রভাবিত করতে চায়।
- সংক্ষেপে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো নাগরিক এবং সরকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।
- ভোটারদের একত্র করে এবং শিক্ষিত করে: তারা নাগরিকদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত এবং অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।
- প্রার্থী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেয়: তারা সরকারি পদের জন্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত এবং প্রস্তুত করে।
- নীতিমালা প্রণয়ন করে: তারা সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবনা তৈরি করে।
- জবাবদিহি নিশ্চিত করে: তারা ভোটারদের একটি পছন্দের সুযোগ দেয় এবং ক্ষমতাসীন দলকে জবাবদিহি করে।
- সরকার গঠন করে: সংসদীয় ব্যবস্থায়, বিজয়ী দল সাধারণত সরকার গঠন করে।
- জনমত প্রকাশ ও একত্র করে: তারা নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করে এবং সেগুলোকে সুসংহত নীতিগত বিকল্পগুলোতে সংশ্লেষণ করে।

যদিও সাধারণত গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে, যদিও তাদের কাজ ভিন্ন হয় (যেমন ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিবর্তে তারা প্রধানত শাসনের আদর্শ প্রচার এবং সমর্থন একত্র করার জন্য কাজ করতে পারে)

## বাংলাদেশের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে একটি স্বতন্ত্র, সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দলের কোনো সুস্পষ্ট "সংজ্ঞা" প্রদান করা হয়নি। এর পরিবর্তে, সংবিধান গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্ব এবং ভূমিকাকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের সংজ্ঞা সংবিধানের ব্যাখ্যামূলক বিভাগে প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষত, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ (ব্যাখ্যা) "রাজনৈতিক দল" এর জন্য একটি সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করে:

"রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন এক গোষ্ঠী বা ব্যক্তি-সমষ্টিকেও বুঝাইবে, যাহারা সংসদ-ভিতর বা বাহির হইতে একটি সুনির্দিষ্ট নামে কার্যপরিচালনা করেন এবং যাহারা রাজনৈতিক মত প্রচারের অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক কার্যকর্মে লিপ্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে পরিচিত করেন;

চলুন, এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক

- "গোষ্ঠী বা ব্যক্তি-সমষ্টি": এটি জোর দেয় যে একটি রাজনৈতিক দল একটি সম্মিলিত সত্তা, কেবল একজন ব্যক্তি নয়।

- "সংসদ-ভিতর বা বাহির হইতে কার্যপরিচালনা করেন": এটি স্বীকার করে যে একটি দলের কার্যক্রম কেবল আইন প্রণয়নকারী সংস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা বিরোধী দল হিসেবে কাজ করতে পারে, জনসমাবেশে অংশ নিতে পারে বা শাসনের বিভিন্ন স্তরে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
- "একটি সুনির্দিষ্ট নামে": এটি একটি রাজনৈতিক দলের জন্য একটি অনন্য পরিচয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা এটিকে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে।
- "রাজনৈতিক মত প্রচারের অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক কার্যকর্মে লিপ্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে পরিচিত করেন": এটি মূল কার্যকরী দিক। এর অর্থ হলো, দলটি জনসমক্ষে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেদের উপস্থাপন করে অথবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চায়, যার মধ্যে ব্যাপকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, নীতি প্রভাবিত করা বা জনসমর্থন সংগঠিত করা অন্তর্ভুক্ত।

এই ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা ছাড়াও সংবিধান রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিধানাবলি নির্ধারণ করে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ৩৮ নং অনুচ্ছেদ (সংগঠন করার স্বাধীনতা): এই মৌলিক অধিকার নাগরিকদের সংগঠন বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যা রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্বের সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদান করে।
- ৭০ নং অনুচ্ছেদ (ফ্লোর-ক্রসিং বা দলত্যাগের বিরোধী আইন): এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সংসদের মধ্যে দলের শৃঙ্খলা নির্দেশ করে, যেখানে বলা হয়েছে যে একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য তাঁর আসন হারাবেন, যদি তিনি সেই দল থেকে পদত্যাগ করেন বা সংসদে তাঁর দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। এটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তিশালী ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেয়।
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RPO): যদিও এটি সরাসরি সংবিধানের মূল অনুচ্ছেদগুলোর অংশ নয়, তবে RPO (সংবিধান থেকে প্রাপ্ত একটি আইন) নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে উল্লেখ করে, যার মধ্যে তাদের সংবিধান, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং কার্যক্রমের মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবহারিক কাঠামো বাংলাদেশের একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল কী, তা আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

সুতরাং, যদিও আপনি সংবিধানের মূল অংশে "রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা" শিরোনামে কোনো স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ খুঁজে পাবেন না, তবে ব্যাখ্যামূলক বিভাগ (১৫২ নং অনুচ্ছেদ) সরাসরি সংজ্ঞা প্রদান করে এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলো ও সংশ্লিষ্ট আইন (যেমন RPO) তাদের কার্যক্রমের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে।

### বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে প্রধান দলগুলো, বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, যা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই গণতান্ত্রিক সুসংগঠন ও সুশাসনকে বাধাগ্রস্ত করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো–

### ১. কেন্দ্রীভূত ও বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব

- ব্যক্তিত্বের আরাধনা (Personality-Cults): দলগুলো প্রায়শই ক্যারিশম্যাটিক নেতাদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যেখানে প্রায়শই ব্যক্তিত্বের একটি শক্তিশালী আরাধনা দেখা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয় এবং দলের প্রধানের হাতে বিশাল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।
- বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার: প্রধান দুটি দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) উভয়ই রাজনৈতিক পরিবারগুলোর মাধ্যমে নেতৃত্বের হস্তান্তর দেখেছে (যেমন আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার, বিএনপিতে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার পরিবার)। এটি প্রায়শই দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে সীমিত করে এবং মেধার ভিত্তিতে নতুন নেতৃত্বের উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে।
- অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব: দলগুলোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (যেমন নিয়মিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলীয় পদের নির্বাচন) প্রায়শই দুর্বল বা অনুপস্থিত। নিয়োগের মাধ্যমে পদ পূরণের প্রবণতা সাধারণ, যা একটি ওপর থেকে নিচে কাঠামো তৈরি করে, যেখানে নেতার প্রতি আনুগত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

**২. তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং "উইনার-টেকস-অল" মানসিকতা**

- জিরো-সাম রাজনীতি (Zero-Sum Politics): বাংলাদেশের রাজনীতি একটি চরম "জিরো-সাম" খেলা দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে নির্বাচনে জয়ী হওয়া মানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ এবং হেরে যাওয়া মানে গুরুতর প্রান্তিকীকরণ, প্রায়শই রাজনৈতিক হয়রানি, নির্বিচার গ্রেপ্তার এবং দলীয় সদস্যদের জন্য অর্থনৈতিক দুর্ভোগের মুখোমুখি হওয়া। এটি ক্ষমতার জন্য একটি অস্তিত্বের সংগ্রাম তৈরি করে।
- গভীর অবিশ্বাস: প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) মধ্যে একটি গভীর ও ঐতিহাসিক আস্থার অভাব রয়েছে। প্রতিটি দল, ক্ষমতায় থাকাকালীন, অন্যটিকে দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণতন্ত্রকে দুর্বল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, যা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সহযোগিতা বা আপোসকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।
- বর্জনের সংস্কৃতি: বিরোধী দলগুলো প্রায়শই নির্বাচন, সংসদ বা অন্যান্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বর্জন করার আশ্রয় নেয়, যখন তারা মনে করে যে খেলার মাঠ সমতল নয় বা তাদের দাবি পূরণ হয়নি। যদিও এটি কখনো কখনো প্রতিবাদের একটি বৈধ রূপ, তবে এটি ক্ষমতাসীন দলের জন্য গণতান্ত্রিক অবস্থানকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারে।

**৩. পৃষ্ঠপোষকতা এবং ক্লায়েন্টালিজম (আশ্রিতকরণ)**

- পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক: রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কের ওপর খুব বেশি নির্ভর করে। সরকারি চাকরি, চুক্তি, ব্যবসায়িক সুযোগ এবং অন্যান্য সুবিধার প্রাপ্তি প্রায়শই রাজনৈতিক আনুগত্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। এটি ব্যক্তিদের আদর্শিক সারিবদ্ধতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতাসীন দলে যোগ দিতে এবং সমর্থন করতে উৎসাহিত করে।
- ক্লায়েন্টালিজম: এতে রাজনৈতিক সমর্থনের বিনিময়ে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদান জড়িত, প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। এটি স্থানীয় নেতা এবং তাঁদের ভোটারদের মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করে কিন্তু মেধাভিত্তিক ব্যবস্থা এবং সুশাসনকে দুর্বল করতে পারে।
- পেশি এবং অর্থের শক্তি: বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে, রাজনীতি প্রায়শই এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয় যারা "পেশি শক্তি" (যেমন ছাত্র বা যুব শাখার মাধ্যমে) এবং আর্থিক সংস্থান ব্যবহার করে সমর্থন সংগ্রহ করতে, বিরোধীদের ভয় দেখাতে এবং ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে।

**৪. দুর্বল আদর্শিক পার্থক্য (মূল পরিচয় ব্যতীত)**

- ঐতিহাসিক পরিচয়: আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গঠিত, অন্যদিকে বিএনপি "বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ" এর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়শই আরও বেশি ইসলামপন্থী ও ডানপন্থী শক্তির সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়। এই মূল ঐতিহাসিক পরিচয়গুলো এখনো গুরুত্বপূর্ণ।
- নীতিগুলোর অভিন্নতা (বাস্তববাদ): তাদের ঐতিহাসিক পার্থক্য সত্ত্বেও, উভয় প্রধান দলই নীতির ক্ষেত্রে একটি বাস্তববাদী পদ্ধতি দেখিয়েছে, ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রায়শই অনুরূপ অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের ইশতেহারগুলোতে একই ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে। ব্যবহারিক শাসনের ক্ষেত্রে আদর্শিক রেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে, যেখানে প্রাথমিক পার্থক্য প্রায়শই সুস্পষ্ট নীতি কাঠামোর পরিবর্তে "কে ক্ষমতায় আছে" তা হয়।
- ধর্মীয় বনাম ধর্মনিরপেক্ষ বিভাজন: যেখানে আওয়ামী লীগ সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষতার চ্যাম্পিয়ন (যদিও কখনো কখনো আপোস করার জন্য সমালোচিত), বিএনপি আরও প্রকাশ্যে ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে নিজেদের সারিবদ্ধ করে, যা বাংলাদেশি সমাজে একটি স্থিতিশীল আদর্শিক বিভাজন প্রতিফলিত করে।

**৫. বিস্তৃত সহযোগী সংগঠন**

- ছাত্র, যুব, শ্রমিক, পেশাজীবী শাখা: প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমাজের বিভিন্ন অংশের জন্য "সহযোগী সংগঠন" বা "শাখা" এর বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেমন ছাত্র (যেমন ছাত্রলীগ, ছাত্রদল), যুব, শ্রমিক, কৃষক, নারী, চিকিৎসক, আইনজীবী ইত্যাদি।
- তৃণমূল পর্যায়ে সংহতি: এই সংগঠনগুলো তৃণমূল পর্যায়ে সংহতি, প্রচারণা এবং সারা দেশে দলের প্রসার বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- অপব্যবহারের দুর্বলতা: যদিও সংহতির উদ্দেশ্যে তৈরি, এই সহযোগী সংগঠনগুলো, বিশেষ করে ছাত্র ও যুব শাখা, প্রায়শই সহিংসতা, চাঁদাবাজি এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সঙ্গে জড়িত, বিশেষ করে যখন তাদের মূল দল ক্ষমতায় থাকে।

**৬. সংসদ-বহির্ভূত আন্দোলনের ওপর নির্ভরতা**

- দুর্বল সংসদ: যখন সংসদকে বিতর্ক বা জবাবদিহির একটি কার্যকর ফোরাম হিসেবে দেখা যায় না (প্রায়শই শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা বর্জনের কারণে), তখন বিরোধী দলগুলো তাদের দাবি আদায়ের জন্য প্রায়শই রাজপথে বিক্ষোভ, হরতাল এবং অন্যান্য ধরনের সংসদ-বহির্ভূত আন্দোলনের আশ্রয় নেয়।
- বিঘ্ন সৃষ্টিকারী রাজনীতি: যদিও এগুলো প্রতিবাদের একটি বৈধ রূপ, তবে ধারাবাহিক এবং প্রায়শই সহিংস রাজপথের রাজনীতি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করতে পারে, যা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় অবদান রাখে।

৭. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

- ব্যক্তিগতকরণ প্রতিষ্ঠান: শক্তিশালী, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রায়শই নেতাদের ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।
- চেক ও ব্যালেন্সের ক্ষয়: বিভিন্ন শাসনের অধীনে আমলাতন্ত্র, পুলিশ এবং বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ নির্বাহী ক্ষমতার ওপর স্বাধীন চেক ও ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করার তাদের ক্ষমতাকে দুর্বল করেছে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রায়শই বৈরী পরিবেশে কাজ করে। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য একটি সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে, যেখানে নির্বাচনে জেতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রায়শই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক সততা এবং প্রকৃত জবাবদিহির মূল্যে। এই গভীরভাবে প্রোথিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

**দলগুলোর গঠনতন্ত্রে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে**

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র এবং তাদের প্রকৃত অনুশীলনে যে সকল গুরুতর ত্রুটি রয়েছে, যা গণতান্ত্রিক শাসনকে দুর্বল করে এবং একটি সমস্যাযুক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অবদান রাখে, সেগুলোর একটি বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

**১. অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব**

- কেন্দ্রীয় ও পারিবারিক নেতৃত্ব: একটি বড় সমস্যা হলো দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের মারাত্মক অভাব। নেতৃত্ব নির্বাচন, নীতি নির্ধারণসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মূলত অনানুষ্ঠানিক এবং সীমিতসংখ্যক দলীয় অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে প্রায়শই "বংশানুক্রমিক দল" তৈরি হয়, যেখানে শীর্ষ নেতৃত্ব একই পরিবার থেকে আসে, যা প্রকৃত অন্তঃদলীয় প্রতিযোগিতা এবং মেধাভিত্তিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।
- দুর্বল দলীয় সংগঠন: অনেক দলের সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল, যা সদস্যদের ব্যাপক অংশগ্রহণের পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব: দলীয় বিষয়াবলিতে, বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। এর অর্থ হলো নেতারা প্রায়শই তাঁদের সদস্যদের কাছে প্রকৃত অর্থে জবাবদিহি করেন না।
- বিরোধিতার দমন: অন্তঃদলীয় বিরোধিতা প্রায়শই দমন করা হয়, যা ভিন্ন মতামত এবং সুস্থ অভ্যন্তরীণ বিতর্ককে নিরুৎসাহিত করে।

**২. পৃষ্ঠপোষকতা, দুর্নীতি এবং রাজনীতির অপরাধীকরণ**

- ব্যাপক দুর্নীতি: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়। এই দুর্নীতি রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে আছে।
- পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক: রাজনীতিবিদেরা তাঁদের পদ ব্যবহার করে আর্থিক সুবিধা লাভ করেন, যার ফলে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক সমর্থনের বিনিময়ে সুবিধা, সরকারি চাকরি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সহায়তা বা এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।
- রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতার অভাব: রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতার অভাবে দলগুলো অবৈধ উপায়ে প্রচারণা চালাতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে আত্মসাৎ করা সরকারি তহবিল, ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘুষ বা বিদেশি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান।
- অভিজাতদের দখল ও দায়মুক্তি: একটি ছোট অভিজাত গোষ্ঠী প্রায়শই ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও সদস্যরা প্রায়শই আইনি বিচারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকাকালীন,

কার্যত বা আইনগতভাবে দায়মুক্তি ভোগ করে। এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড শাস্তিহীন থাকে।

- রাজনীতির বাণিজ্যিকীকরণ: "অপরাধীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে, যেখানে রাজনীতি অবৈধ উপায়ে সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

**৩. সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং শাসনে জবাবদিহির অভাব**

- পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বর্জন: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট শাসক ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে গভীর পারস্পরিক অবিশ্বাস দ্বারা চিহ্নিত। এটি প্রায়শই ঘন ঘন সংসদ বর্জনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যা আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে তার তদারকি ভূমিকার ক্ষেত্রে অকার্যকর করে তোলে।

- প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্র (অনুচ্ছেদ ৭০): সংসদীয় কাঠামো, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের (যা সাংসদদের কঠোরভাবে দলীয় লাইনে ভোট দিতে বা তাদের আসন হারাতে বাধ্য করে) সঙ্গে মিলিত হয়ে, "প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রের" একটি রূপকে সক্ষম করার এবং এমপিদের এর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য সমালোচিত হয়েছে।

- প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ: বিচার বিভাগ এবং আমলাতন্ত্রসহ মূল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই রাজনীতিকরণ করা হয়, যার ফলে স্বাধীনতা ও জবাবদিহির অভাব দেখা যায়।

- গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থতা: সংসদীয় ব্যবস্থা, বহু-দলীয় ব্যবস্থা, একটি সংবিধানের মতো গণতন্ত্রের সূচক থাকা সত্ত্বেও, দেশটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং অনুশীলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে মূলত ব্যর্থ হয়েছে।

**৪. গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং জনবিশ্বাসের ওপর প্রভাব**

- গণতন্ত্রের স্থবিরতা: উক্ত সমস্যাগুলো বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক উন্নয়নে স্থবিরতার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচারী ও দমনমূলক শাসন দেখা দিয়েছে।

- জনগণের অসন্তোষ: প্রধান দলগুলোর (আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) আধিপত্যের প্রতি জনগণের গভীর অসন্তোষ রয়েছে এবং নতুন, আরও প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলের মডেলের জন্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

- জনবিশ্বাসের দুর্বলতা: রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বল ভাবমূর্তি, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব এবং জনবিশ্বাসের নিম্নস্তর গণতান্ত্রিক অনুশীলন ও সুশাসনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে হ্রাস করে।

মূলত, বাংলাদেশের সংবিধান তাত্ত্বিকভাবে গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে সমর্থন করলেও, এর রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা এবং বাস্তব-বিশ্বের অনুশীলন প্রায়শই অনেক পিছিয়ে থাকে, যার ফলে একটি অনুন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ব্যাপক দুর্নীতি এবং অস্থিরতা ও সীমিত জবাবদিহির একটি চক্র তৈরি হয়।

**রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের গুরুত্ব**

রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মজবুত ভিত্তি গঠনে অপরিহার্য। এটি দলগুলোর মধ্যে জবাবদিহি, অন্তর্ভুক্তি এবং জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে। অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দলগুলো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মেধার মূল্যায়ন করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্যের মতামত আমলে নেয়। অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় রাখলে দলগুলো জাতীয় গণতন্ত্রের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে পারে।

সারাংশ, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, মতবিরোধ দমন, বংশানুক্রমিক রাজনীতি, বিভাজন এবং জনসাধারণের আস্থার ক্ষতি ঘটাতে পারে। একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**দলীয় অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র না থাকলে কী ক্ষতি হয়**

**১. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও কর্তৃত্ববাদ**

গণতান্ত্রিক অনুশীলন না থাকলে দলগুলোর নেতৃত্ব একক ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এতে দল স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে এবং সদস্যদের মতামত বা অংশগ্রহণের সুযোগ কমে যায়।

**২. মতভিন্নতা ও নতুন চিন্তাভাবনার দমন**

অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র না থাকলে ভিন্নমত বা নতুন চিন্তাভাবনাকে দমন করা হয়। ফলে দলের মধ্যে স্থবিরতা দেখা দেয় এবং জনচাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়।

**৩. বংশানুক্রমিক রাজনীতির প্রসার**
নির্বাচন ছাড়াই নেতৃত্ব বংশানুক্রমিকভাবে স্থানান্তরিত হলে মেধার ভিত্তিতে নেতৃত্ব গঠনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোটারদের আস্থা হারানোর ঝুঁকি থাকে।

**৪. বিভাজন ও অস্থিতিশীলতা**
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া না থাকলে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ তৈরি হয়, যা দলভাঙা বা নতুন দল গঠনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

**৫. জন-আস্থার ক্ষয়**
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ না মানলে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাতে পারে এবং নাগরিক অংশগ্রহণ কমে যায়।

**সংক্ষেপে**
অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র না থাকলে দলীয় কর্তৃত্ববাদ, মতপ্রকাশের দমন, বংশানুক্রমিক নেতৃত্ব, দলীয় বিভাজন এবং জন-আস্থার ক্ষয় ঘটে। একটি সুস্থ গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরেও গণতান্ত্রিক চর্চা থাকা জরুরি।

# বাংলাদেশে রাজনীতির পথপরিক্রমা এবং রাজনৈতিক সংস্কার

সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বারবার অস্থিরতা দেখা গেছে, যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সামরিক অভ্যুত্থান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসনের সময়কাল। এসব হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, প্রায়শই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে এবং নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

**এখানে অরাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সেগুলোর প্রভাব তুলে ধরা হলো:**

- **১৯৭৫ (১৫ আগস্ট):** শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড এবং প্রথম অভ্যুত্থান
  - ঘটনা: বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ সামরিক বাহিনীর মধ্যম সারির কয়েকজন কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত এক অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদ, যিনি পূর্বে তাঁর সহযোগী ছিলেন, তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।
  - প্রভাব: এটি প্রাথমিক গণতান্ত্রিক সময়ের অবসান ঘটায় এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের সূচনা করে। এটি নবীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং সামরিক শক্তিশালী নেতাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে।

- **১৯৭৫ (৩ ও ৭ নভেম্বর):** পাল্টা অভ্যুত্থান এবং জিয়াউর রহমানের উত্থান
  - ঘটনা: ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি পাল্টা অভ্যুত্থানে খন্দকার মোশতাক আহমদকে সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তবে, মাত্র কয়েক দিন পর, ৭ নভেম্বরের আরেকটি অভ্যুত্থানে, যা বামপন্থী সামরিক সদস্য ও রাজনীতিবিদদের সমর্থন পেয়েছিল, খালেদ মোশাররফ নিহত হন এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা সুসংহত করেন।
  - প্রভাব: অভ্যুত্থানের এই দ্রুত ধারাবাহিকতা বেসামরিক সরকারের দুর্বলতা এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী ভূমিকা প্রমাণ করে। জিয়াউর রহমান, প্রাথমিকভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরে রাষ্ট্রপতি হিসেবে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন এবং একটি অধিকতর জাতীয়তাবাদী ও কিছুটা ইসলামপন্থী মতাদর্শ প্রবর্তন করেন। এই সময়কালে সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনের রাজনীতিকরণও ঘটে।

- **১৯৮১ (৩০ মে):** জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড
  - ঘটনা: রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তাদের একটি অভ্যুত্থানচেষ্টায় নিহত হন।
  - প্রভাব: তাৎক্ষণিক অভ্যুত্থানচেষ্টা দমন করা হলেও, এটি সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের অধীনে সংক্ষিপ্ত বেসামরিক শাসন আসে।

- ১৯৮২ (২৪ মার্চ): হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অভ্যুত্থান
  - ঘটনা: তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন এবং পরে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন।
  - প্রভাব: এটি এরশাদের অধীনে দীর্ঘ সামরিক শাসনের (১৯৮২-১৯৯০) সূচনা করে। তিনিও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠন করেন এবং ক্ষমতা সুসংহত করার লক্ষ্যে নীতিগুলো বাস্তবায়ন করেন। তাঁর শাসনকালে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং দুর্নীতির অভিযোগ উভয়ই ছিল এবং তাঁর শাসনের শেষের দিকে তাঁকে ব্যাপক গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

- ১৯৯০ (ডিসেম্বর): এরশাদের পতন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন
  - ঘটনা: ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ও প্রতিবাদ এবং সামরিক বাহিনীর সমর্থন প্রত্যাহারের মুখে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটি একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করে।
  - প্রভাব: এটি প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটায় এবং ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, যদিও প্রাথমিকভাবে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি হয়েছিল, তবে এটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, যা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গভীর অবিশ্বাস প্রতিফলিত করে।

- ২০০৭-২০০৮: সেনাবাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার
  - ঘটনা: নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক অচলাবস্থা এবং ব্যাপক অস্থিরতার মধ্যে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সমর্থন দেন এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এই সরকার প্রায় দুই বছর শাসন করে।
  - প্রভাব: এই হস্তক্ষেপ, যদিও সরাসরি সামরিক দখল ছিল না, তবে সামরিক বাহিনী একটি বেসামরিক আবরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এটি একটি বড় দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালায় এবং ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সংস্কার করে। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করা এবং একটি সত্যিকারের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ তৈরি করা। সংস্কারে কিছু সফলতা এলেও, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রাজনীতিমুক্ত করার এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের অপসারণের (তথাকথিত "মাইনাস টু" নীতি) চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে, যা আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

  - ২০২৪ (জুলাই-আগস্ট): শেখ হাসিনার পতন এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

  - ঘটনা: সরকারি চাকরির কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে কয়েক সপ্তাহের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ একপর্যায়ে রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে, ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতে চলে যান। এ পর্যায়ে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি সেনানিবাসে রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। পরে এক টেলিভিশন ভাষণে শেখ হাসিনার পদত্যাগ করার কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা দেশবাসীকে অবহিত করেন। এরপর বঙ্গভবনে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে জাতির উদ্দেশে ভাষণে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। এ পর্যায়ে সংবিধানে থাকা একটি নির্দেশনার আলোকে সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স অনুযায়ী ৮ আগস্ট, ২০২৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার।

  - প্রভাব: যদিও সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করেনি, তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া ও দেশ ছাড়ার ঘটনা এবং একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে তাদের ভূমিকা রাজনৈতিক সংকটের সময়ে একটি শক্তিশালী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর অব্যাহত প্রভাবকে তুলে ধরে। এই ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চিহ্নিত করে, যেখানে শাসনক্ষমতায় শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটে। এই অন্তর্বর্তী সময়ের প্রকৃতি আবারও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

### অরাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কীভাবে রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তন করেছে

সামরিক হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ কিছু গভীর প্রভাব পড়েছে

১. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা: প্রতিটি অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের সময়কাল শক্তিশালী সংসদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং একটি প্রাণবন্ত বহুদলীয় ব্যবস্থাসহ শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে বাধা দিয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার চক্র গণতান্ত্রিক নিয়মগুলোকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি।

২. সামরিক বাহিনীর রাজনীতিকরণ: রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর বারবার হস্তক্ষেপ একে রাজনীতিকরণের দিকে পরিচালিত করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রায়শই রাজনৈতিক বিভাজনকে প্রতিফলিত করেছে এবং সামরিক বাহিনীকে কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতা বা দলগুলো তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

৩. সামরিক-সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থান: জেনারেল জিয়াউর রহমান (বিএনপি) এবং জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (জাতীয় পার্টি) উভয়েই ক্ষমতায় থাকাকালীন নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সামরিক শাসন থেকে জন্ম নেওয়া এই দলগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে, যা আদর্শগত প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচনী প্রতিযোগিতা উভয়কেই প্রভাবিত করে।

৪. অবিশ্বাস এবং সংঘাতের সংস্কৃতি: ঘন ঘন হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাসকে আরও গভীর করেছে। নির্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি "নিরপেক্ষ" তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আকাঙ্ক্ষা, যা এই অবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছিল, নিজেই বিরোধের একটি বিষয় হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত আরও সংকটের জন্ম দেয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রায়শই একটি শূন্য-সমষ্টির খেলায় (Zero-sum game) পরিণত হয়, যেখানে বিজয়ীরা ক্ষমতা সুসংহত করতে এবং বিরোধীদের কোণঠাসা করতে চায়।

৫. বেসামরিক শ্রেষ্ঠত্বের দুর্বলতা: নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের সময়কাল সত্ত্বেও, সামরিক বাহিনী প্রায়শই রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি প্রভাবশালী, যদিও সব সময় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়, actors হিসেবে থাকে। গুরুতর রাজনৈতিক সংকটের সময়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা; এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ইঙ্গিত দেয় যে বেসামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়।

৬. গণতান্ত্রিক অধিকারের চেয়ে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর জোর: সামরিক শাসনের সময়কালে প্রায়শই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের চেয়ে "শৃঙ্খলা" এবং "স্থিতিশীলতাকে" অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে নাগরিক স্থানের সংকোচন, সংবাদমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ এবং ভিন্নমতের দমন হতে পারে।

৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সামরিক হস্তক্ষেপ প্রায়শই বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা থেকে সম্পদ সরিয়ে নেয়, যা সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব ফেলে।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে সামরিক হস্তক্ষেপ তার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য। তারা শুধু নেতৃত্ব এবং শাসনকাঠামোকে সরাসরি পরিবর্তন করেনি, বরং তার রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান এবং একটি স্থিতিশীল ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জগুলোর প্রকৃতিকেও মৌলিকভাবে রূপ দিয়েছে।

## বাংলাদেশে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণগুলো

### ১. গভীর রাজনৈতিক মেরুকরণ ও অবিশ্বাস

জিরো-সাম গেম: প্রতিটি দল, যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন তার নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করতে এবং বিরোধীদের কোণঠাসা করতে চায়, যা সংস্কারের বিষয়ে প্রকৃত আপোস ও ঐকমত্যকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।

ঐকমত্যের অভাব: সংস্কার, বিশেষ করে নির্বাচন বা সুশাসন-সম্পর্কিত, কার্যকর ও টেকসই হওয়ার জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন। যখন একটি দল সংস্কার বাস্তবায়ন করে, তখন অন্য দল প্রায়শই এটিকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং ক্ষমতায় আসার পর দ্রুত তা বাতিল করে দেয় বা পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করে। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা, যা পূর্বে দলীয় অবিশ্বাসের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল, তার একটি প্রধান উদাহরণ।

### ২. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর রাজনীতিকরণ: নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ মূল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহাসিকভাবে রাজনীতিকরণ হয়েছে। যে দলই ক্ষমতায় থাকে, তারাই এই পদগুলোতে অনুগতদের নিয়োগ করে, যা

তাদের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষ সালিসকারী হিসেবে কাজ করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনবিশ্বাস এবং ন্যায্যভাবে সংস্কার প্রয়োগের সক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে।

চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ক্ষয়: নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, বিশেষ করে প্রশ্নবিদ্ধ ভোটের মাধ্যমে প্রায়শই অর্জিত সংসদীয় সুপারমেজরিটি, আইনসভা এবং বিচার বিভাগকে দুর্বল করে। এটি জবাবদিহি হ্রাস করে এবং ক্ষমতাসীন দলের জন্য প্রক্রিয়াগুলো প্রভাবিত করা এবং তাদের ক্ষমতা সীমিত করতে পারে এমন সংস্কারগুলোকে প্রতিহত করা সহজ করে তোলে।

### ৩. রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সংস্কারের প্রতি প্রতিশ্রুতির অভাব

রাজনৈতিক অভিজাতদের স্বার্থপরতা: রাজনৈতিক নেতারা প্রায়শই দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের চেয়ে স্বল্পমেয়াদি ক্ষমতা ধরে রাখাকে অগ্রাধিকার দেন। সংস্কার যা অভ্যন্তরীণ দলীয় কাঠামোকে গণতান্ত্রিক করতে পারে, নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে, বা ক্ষমতার অপব্যবহার সীমিত করতে পারে, তা প্রায়শই প্রতিরোধ করা হয়; কারণ, এটি প্রতিষ্ঠিত অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে পারে।

কথা বনাম কাজ: যদিও রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে সংস্কারের পক্ষে কথা বলতে পারে, তবে তাদের কর্মে প্রায়শই প্রকৃত প্রতিশ্রুতির অভাব দেখা যায়, বিশেষ করে এমন পরিবর্তন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যা খেলার মাঠকে সমান করতে পারে বা তাদের নিজস্ব সুবিধা কমাতে পারে।

### ৪. ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগের অভাব

অনিয়ম ও কারচুপি: নির্বাচনী প্রক্রিয়া উন্নত করার প্রচেষ্টা (যেমন ছবিসহ ভোটার তালিকা) সত্ত্বেও, নির্বাচনগুলো প্রায়শই ভোটারদের ভয় দেখানো, ব্যালট বাক্স ভরা, ভোট জালিয়াতি এবং প্রশাসনিক কারচুপির অভিযোগে কলঙ্কিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে এবং এই অপব্যবহারগুলো মোকাবিলা করতে ব্যর্থতা জনবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করেছে।

সহিংসতা ও ভয়ভীতি: নির্বাচনী প্রচার এবং ভোট গ্রহণের দিনগুলো প্রায়শই সহিংসতা, সংঘর্ষ এবং ভয়ভীতি দ্বারা চিহ্নিত হয়, যা অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে এবং প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

### ৫. প্রোথিত দুর্নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দুর্নীতি: দুর্নীতি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গভীরভাবে প্রোথিত, প্রায়শই দলগুলোর জন্য অনুগতদের পুরস্কৃত করা, কার্যক্রমে অর্থায়ন করা এবং পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক বজায় রাখার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে সংস্কারগুলো ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কারণ, তারা এই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলোকে হুমকির মুখে ফেলে।

জবাবদিহির অভাব: দুর্নীতিবিরোধী অভিযান (যেমন ২০০৭-২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কার অভিযান) সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদি জবাবদিহি প্রক্রিয়া দুর্বল। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা প্রায়শই প্রত্যাহার করা হয় বা ঝুলে থাকে, যা দায়মুক্তির অনুভূতিকে শক্তিশালী করে।

### ৬. দুর্বল আইনের শাসন

আইন ব্যবস্থার অস্ত্রায়ণ: আইনি ও বিচারিক ব্যবস্থা কখনো কখনো রাজনৈতিক দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে বিরোধী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্বিচার গ্রেপ্তার, জোরপূর্বক গুম এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা করা হয়। এটি ভয়ের একটি পরিবেশ তৈরি করে; যা ভিন্নমত এবং সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরকে দমন করে, যা সংস্কারের অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার জন্য অপরিহার্য।

বিচারিক স্বাধীনতার অভাব: সাংবিধানিক বিধান থাকা সত্ত্বেও, বিচারিক স্বাধীনতা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত থাকে, যেখানে আদালতকে কখনো কখনো নির্বাহী শাখা দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।

### ৭. সীমিত নাগরিক পরিসর এবং দমন করা ভিন্নমত

বাক্স্বাধীনতা ও সমাবেশের ওপর বিধিনিষেধ: সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে বাক্স্বাধীনতা, সমাবেশ এবং সংগঠনের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে; যা সুশীল সমাজ, সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিকদের সংস্কারের পক্ষে কথা বলার এবং জবাবদিহি করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ: ভয়ের একটি পরিবেশ সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং কর্মীদের মধ্যে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা অর্থপূর্ণ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় জনবিতর্ককে আরও হ্রাস করে।

### ৮. সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ এবং স্পষ্টতার অভাব

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিতর্ক এবং অবশেষে বিলুপ্তি একটি মৌলিক সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে। রাজনৈতিক অবিশ্বাসের কারণে অনেকে এটিকে অবাধ নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও, একটি সম্মত বিকল্প প্রক্রিয়া

ছাড়াই এর অপসারণ সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতাও ব্যবস্থাটি পুনরুদ্ধারের জন্য হাইকোর্টের রায়ের ওপর নির্ভর করে, যা চলমান সাংবিধানিক জটিলতা নির্দেশ করে।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যর্থতা একটি দুষ্টচক্র থেকে উদ্ভূত: তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যকে বাধাগ্রস্ত করে, যা ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতিকরণ এবং আইনের শাসনের দুর্বলতা ঘটায়। এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের লাভের জন্য ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে, যা দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে চিরস্থায়ী করে এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে। এই চক্র ভাঙতে হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে, যেখানে সত্যিকারের সংলাপ, আপোস এবং সমস্ত অংশীদারের দ্বারা দলীয় সুবিধার চেয়ে জাতীয় স্বার্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

## তিন জোটের রূপরেখা

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের জন্য পরিচালিত গণ-অভ্যুত্থান ছিল রাজনৈতিক ঐক্যের এক বিরল মুহূর্ত। এই অভ্যুত্থানে তিনটি প্রধান জোট সরকারের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করে। এই জোটগুলো ছিল:

- আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫-দলীয় জোট (পরে ৮-দলীয় জোটে পরিণত হয়)
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন ৭-দলীয় জোট
- বামপন্থী ৫-দলীয় জোট

এই যৌথ ঘোষণা, যা প্রায়শই "তিন জোটের রূপরেখা" নামে পরিচিত, গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য একটি রূপরেখা তুলে ধরেছিল।

## ১৯৯০ সালের যৌথ ঘোষণার মূল প্রতিশ্রুতি

এই ঘোষণায় একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এর প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল–

১. সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা: ঘোষণায় একটি সত্যিকারের সার্বভৌম সংসদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হবে সংসদ। এটি ছিল এরশাদের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার সরাসরি প্রতিক্রিয়া, যা সংসদকে একটি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেছিল।

২. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন: একটি কেন্দ্রীয় দাবি ছিল এরশাদের পদত্যাগ এবং একটি নিরপেক্ষ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে।

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন: জোটগুলো নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার এবং আইনের শাসন সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানো, যা এরশাদ আমলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

৪. মৌলিক অধিকার সুরক্ষা: ঘোষণায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যা স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে পদ্ধতিগতভাবে দমন করা হয়েছিল।

৫. মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আইন বাতিল: এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মৌলিক মানবাধিকারের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সমস্ত আইন ও অধ্যাদেশ বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছিল।

## কেন এবং কীভাবে প্রতিশ্রুতিগুলো উপেক্ষা করা হয়েছিল

যৌথ আন্দোলন সফলভাবে এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পথ খুলে দিলেও, ঘোষণার ঐক্য এবং চেতনা দ্রুত ম্লান হয়ে যায়। ঘোষণায় করা প্রতিশ্রুতিগুলো সেই দলগুলো দ্বারা মূলত উপেক্ষা করা হয়েছিল। যারা এর পক্ষে ছিল, যা সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির এক নতুন যুগের সূচনা করে।

১. দলীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন: ক্ষমতায় আসার পর, দুটি প্রধান দল, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ, দ্রুত তাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে আসে। "তিন জোটের রূপরেখা" ছিল একটি সাধারণ শত্রুকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়োজনের কারণে জন্ম নেওয়া একটি চুক্তি, কোনো প্রকৃত এবং স্থায়ী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অঙ্গীকার নয়। এরশাদের পতনকারী রাজনৈতিক ঐকমত্য ক্ষমতার শূন্যতা পূরণ হওয়ার পরপরই প্রায় বিলীন হয়ে যায়।

২. প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার: গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে, উভয় প্রধান দলই ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজনৈতিক লাভের জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল। বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায়শই রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করতে ব্যবহার করা হয়। এটি এরশাদ শাসনের সময় তাদের দ্বারা নিন্দিত কৌশলগুলোরই প্রতিফলন ছিল।

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, যা ঘোষণার একটি মূল দাবি ছিল, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং কয়েকটি নির্বাচনে সফলভাবে কাজ করেছিল। তবে, এর অস্তিত্ব পরে বড় রাজনৈতিক সংঘাতের উৎস হয়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালে যে আওয়ামী লীগ এই ব্যবস্থার জন্য লড়াই করেছিল, তারা ২০১১ সালে একটি সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাতিল করে দেয়, যার ফলে একটি নতুন রাজনৈতিক সংকট এবং বছরের পর বছর ধরে বিরোধী দলের বর্জন ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

৪. সংসদীয় জবাবদিহির অভাব: একটি সার্বভৌম সংসদের প্রতিশ্রুতি কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সংসদীয় অধিবেশনগুলো প্রায়শই বিরোধী দল দ্বারা বর্জিত হতো, যা জাতীয় সংসদকে প্রকৃত বিতর্ক ও তদারকির পরিবর্তে একতরফা বক্তৃতার একটি মঞ্চে পরিণত করে। এটি রাজনৈতিক সংঘাতের একটি চক্র অব্যাহত রাখে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে তোলে।

৫. আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে ব্যর্থতা: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মৌলিক অধিকার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিও উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। পরবর্তী সরকারগুলো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম এবং মানবাধিকার মানদণ্ডের সাধারণ অবনতির জন্য সমালোচিত হয়েছিল। বিরোধীদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর ব্যবহার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি পুনরাবৃত্ত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

উপসংহারে, ১৯৯০ সালের যৌথ ঘোষণা ছিল একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা গণতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষিত একটি জাতির আশাকে প্রতিফলিত করেছিল। তবে, এতে থাকা প্রতিশ্রুতিগুলো দলীয় ক্ষমতার রাজনীতির বেদিতে মূলত উৎসর্গ করা হয়েছিল। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, একবার ক্ষমতায় আসার পর, তাদের গভীর-মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে যেতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তারা যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেছিল, সেগুলোকে নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যার ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার একটি চক্র অব্যাহত থাকে এবং তারা যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলোকে দুর্বল করে।

## জরুরি অবস্থার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার

২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকা সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়ন করেছিল। এই সংস্কারগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল দুর্নীতি দমন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ ছিল।

## যেসব রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার করা হয়েছিল

### ১. দুর্নীতি দমন অভিযান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ব্যাপক দুর্নীতি দমন অভিযান। এর অংশ হিসেবে দুই প্রধান দলের (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) অনেক শীর্ষ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলাসহ হাজার হাজার ব্যক্তিকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ও বিচার করা হয়। এটিকে প্রায়শই "মাইনাস টু" নীতি বলা হতো, যার উদ্দেশ্য ছিল শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে (দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রী) রাজনীতির বাইরে রাখা।

### ২. নির্বাচনী সংস্কার

- ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন: এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল। এর আগে ভুয়া ভোটার ব্যবহারের অভিযোগ ব্যাপক ছিল। ছবিসহ নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করে এই সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছিল।
- নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ: নির্বাচন কমিশনকে একটি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হয়।
- নির্বাচনী ব্যয় ও দলীয় তহবিলে স্বচ্ছতা: রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয় এবং তহবিলের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর নিয়মকানুন তৈরি করা হয়। দলগুলোকে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে বাধ্য করা হয়।

- প্রার্থী বাছাইয়ে দলীয় গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিতকরণ: দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাইয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়, যদিও এটি দলগুলোর জন্য কঠোরভাবে প্রয়োগ করা কঠিন ছিল।
- ভোটার আইডি কার্ড প্রবর্তন: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরও শৃঙ্খলা আনার জন্য ছবিসহ জাতীয় পরিচয়পত্র প্রবর্তন করা হয়।

**৩. দলীয় সংস্কার**

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রসারের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।
- রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা চালু: সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে রাজনৈতিক দলগুলোকে কিছু শর্ত পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে থেকে নিবন্ধন নিতে হবে।

## জরুরি শাসনের অবসানের পর সংস্কারগুলো কীভাবে ব্যর্থ হয়েছিল

জরুরি শাসনের অবসানের পর বেশ কয়েকটি কারণে এই সংস্কারগুলো কার্যকরভাবে টিকতে পারেনি বা মুখ থুবড়ে পড়েছিল–

- রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব: প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসার পর তাদের নিজস্ব সুবিধামতো আইনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে এবং সংস্কারগুলো বাস্তবায়নে তাদের পূর্ণ সদিচ্ছা ছিল না।
- সাংবিধানিক পরিবর্তন: ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে, যা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তোলে এবং ভবিষ্যতে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে সংকট তৈরি করে।
- দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের অভাব: যদিও নির্বাচনী আইনে আন্তঃদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের গঠনতন্ত্রে এই গণতান্ত্রিক ধারাগুলো পুরোপুরি অনুসরণ করেনি। এখনো অনেক দলের গঠনতন্ত্রে এমন অগণতান্ত্রিক বিধান রয়েছে, যা নির্বাচনী আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা: নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। নতুন সরকারগুলো তাদের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করেছে।
- চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের অভাব: নির্বাহী ক্ষমতার আধিপত্য বাড়ার কারণে আইনসভা ও বিচার বিভাগের মতো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, যা সংস্কারগুলোর কার্যকর প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে।

### কেন সংস্কারগুলো স্থায়ী পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল

উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অনেক সংস্কারই মৌলিক ও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার কয়েকটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. "মাইনাস টু" নীতির ব্যর্থতা: শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। উভয় নেত্রীকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। এই দুই রাজনৈতিক বংশের গভীর শিকড়যুক্ত প্রভাব স্বল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা খুব কঠিন ছিল।

২. রাজনৈতিক বৈধতার অভাব: সেনাবাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনির্বাচিত হওয়ায় এবং সামরিক বাহিনীর সমর্থন থাকায় এর মৌলিক রাজনৈতিক বৈধতার অভাব ছিল। যদিও প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক দুর্নীতি ও অচলাবস্থায় হতাশ অনেকে একে স্বাগত জানিয়েছিল, তবে এর দীর্ঘায়িত শাসন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত করার ফলে ধীরে ধীরে জন-অসন্তোষ ও অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। অনির্বাচিত সরকার দ্বারা প্রণীত সংস্কারগুলো প্রায়শই "ক্যাচ-২২" পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়: তাদের বৈধতার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কার ছাড়া নির্বাচনও বৈধ না-ও হতে পারে।

৩. প্রোথিত রাজনৈতিক কাঠামো: বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো, যা শক্তিশালী দলীয় বিভাজন, দুর্বল অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতিকরণ দ্বারা চিহ্নিত, মাত্র দুই বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা কঠিন ছিল। কয়েক দশক ধরে গড়ে ওঠা দায়মুক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি ভেঙে দেওয়া কঠিন ছিল।

৪. অতি উচ্চাভিলাষী এবং কঠোর মনোভাব: কিছু সংস্কার, বিশেষ করে দুর্নীতি দমন অভিযানকে, অতিরিক্ত কঠোর বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক দুর্নীতি দমনের ফলে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শ্লথ হয়ে যায়।

৫. আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধ: সংস্কারের প্রতি উল্লেখযোগ্য আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধ ছিল; কারণ, অনেক সিভিল সার্ভেন্টের শক্তিশালী রাজনৈতিক সংযোগ ছিল এবং তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিল।

৬. জিরো-সাম রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন: ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে এবং ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। এই পদক্ষেপকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করা হয় এবং এটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাকবচকে কার্যত বাতিল করে দেয়। এটি দুই প্রধান দলের মধ্যে সংঘাতপূর্ণ, জিরো-সাম রাজনৈতিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তনে অবদান রাখে। নতুন সরকার প্রায়শই পূর্ববর্তী সংস্কার উদ্যোগগুলো বাতিল করে দেয়, যা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে আরও বাধাগ্রস্ত করে।

৭. প্রযুক্তিগত বনাম রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর জোর: যদিও প্রযুক্তিগত নির্বাচনী সংস্কারগুলো (যেমন ছবিসহ ভোটার তালিকা) সফল হয়েছিল, তবে সেগুলো গভীর রাজনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। একটি পরিপূরক "রাজনৈতিক ট্র্যাক" বা আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক অনুশীলনের জন্য আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সহায়ক হতে পারত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদিও সেনাবাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রযুক্তিগতভাবে নির্বাচনী সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছিল এবং দুর্নীতি দমনের চেষ্টা করেছিল, তবে একটি অনির্বাচিত সরকারের সহজাত সীমাবদ্ধতা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গভীর প্রোথিত প্রকৃতি এবং পরবর্তীকালে দলীয় সংঘাতপূর্ণ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের কারণে সুশাসনকে মৌলিকভাবে রূপান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিক করার প্রচেষ্টা মূলত ব্যর্থ হয়েছিল।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কারগুলো কেন স্থায়ী, মৌলিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে, তার একটি জটিল এবং পরস্পর সংযুক্ত কারণ রয়েছে। যদিও ব্যক্তিগত সংস্কারগুলো আশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে, তবে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং কাঠামোগত সমস্যা প্রায়শই তাদের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতাকে ক্ষুণ্ন করে।

# রাজনীতি ও গণতন্ত্রের শব্দকোষ

রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ভাষা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মূল পরিভাষাগুলোর একটি শব্দকোষ দেওয়া হলো, যা মৌলিক ধারণা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, সরকারি কাঠামো এবং আরও অনেক বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে।

## মৌলিক ধারণা

- জবাবদিহি (Accountability): একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তার কর্মের ব্যাখ্যা ও ন্যায্যতা জনসমক্ষে বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার বাধ্যবাধকতা।
- অরাজকতা (Anarchy): আইনহীনতা ও বিশৃঙ্খলার একটি অবস্থা, সাধারণত কোনো নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে ঘটে।
- কর্তৃত্ব (Authority): সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং আনুগত্য বলবৎ করার বৈধ ক্ষমতা।
- একনায়কতন্ত্র (Autocracy): একজন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসহকারে সরকার ব্যবস্থা।
- নাগরিক (Citizen): একজন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বা যিনি একটি দেশের আইনগতভাবে বাসিন্দা এবং অধিকার ও দায়িত্ব উপভোগ করেন।
- নাগরিক অধিকার (Civil Rights): জাতি, লিঙ্গ, ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য পূর্ণ আইনি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমতার অধিকার।
- সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ (Civil Society): স্বেচ্ছাসেবী, সম্প্রদায়গত এবং সামাজিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্র; যা রাষ্ট্র ও বাজার থেকে পৃথক।
- সংবিধান (Constitution): মৌলিক নীতির একটি সেট বা প্রতিষ্ঠিত নজির, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র বা অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত হয়।
- দুর্নীতি (Corruption): ক্ষমতার পদে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা অসৎ বা অবৈধ আচরণ, সাধারণত ঘুষ জড়িত থাকে।
- গণতন্ত্র (Democracy): সরকার ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, যারা সরাসরি বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন করে। (গ্রিক ডেমোস "জনগণ" এবং ক্রাটোস "শাসন" থেকে)।
- স্বৈরাচার (Autocracy): সরকারের একটি রূপ, যেখানে ক্ষমতা একজন নেতা বা একটি ছোট গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খুব কম বা থাকেই না।
- অপতথ্য (Disinformation): ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি ও ছড়ানো মিথ্যা তথ্য যা মানুষকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি।
- সমতা (Equality): সমান হওয়ার অবস্থা, বিশেষ করে মর্যাদা, অধিকার বা সুযোগের ক্ষেত্রে।
- সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা (Freedom of Press): সেন্সরশিপ বা প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই সংবাদ পরিবেশন এবং মতামত প্রকাশের জন্য সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম সংস্থাগুলোর অধিকার।
- সরকার (Government): একটি রাষ্ট্র বা দেশ, রাজ্য বা সম্প্রদায়ের শাসনকারী সংস্থা।
- মানবাধিকার (Human Rights): জাতি, লিঙ্গ, জাতীয়তা, জাতিসত্তা, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোনো অবস্থা-নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত মৌলিক অধিকার।
- মতবাদ (Ideology): ধারণা ও আদর্শের একটি ব্যবস্থা, বিশেষ করে যা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তত্ত্ব ও নীতির ভিত্তি তৈরি করে।
- ন্যায়বিচার (Justice): ন্যায্য আচরণ বা ব্যবহার।
- বৈধতা (Legitimacy): একটি শাসনব্যবস্থা বা ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের কর্তৃত্ব হিসেবে জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্যতা।
- ভুল তথ্য (Misinformation): মিথ্যা বা ভুল তথ্য, বিশেষ করে যা প্রতারণার উদ্দেশ্যে করা হয়।

- জাতিরাষ্ট্র (Nation-State): একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, যার নাগরিক বা প্রজারা ভাষা বা সাধারণ গোষ্ঠীর মতো বিষয়গুলোতে তুলনামূলকভাবে সমজাতীয়।
- রাজনৈতিক মেরুকরণ (Political Polarization): রাজনৈতিক মনোভাবের আদর্শগত চরম সীমায় বিচ্যুতি।
- প্রচারণা (Propaganda): তথ্য, বিশেষ করে পক্ষপাতদুষ্ট বা বিভ্রান্তিকর প্রকৃতির, যা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণ বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার কিংবা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- প্রজাতন্ত্র (Republic): একটি রাষ্ট্র, যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকে এবং যেখানে একজন নির্বাচিত বা মনোনীত রাষ্ট্রপতি থাকেন, রাজা নন।
- আইনের শাসন (Rule of Law): এই নীতি যে সকল মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান এমন আইনের অধীন এবং জবাবদিহির আওতায় থাকে; যা ন্যায্যভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করা হয়।
- সার্বভৌমত্ব (Sovereignty): সর্বোচ্চ ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব; একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব বা অন্য একটি রাষ্ট্রকে শাসন করার ক্ষমতা।
- স্বচ্ছতা (Transparency): উন্মুক্ত, সৎ এবং জবাবদিহিমূলক হওয়ার গুণ; তথ্য সহজে দেখা এবং বোঝা যায় এমন করা।

## সরকারি কাঠামো ও প্রক্রিয়া

- সংশোধনী (Amendment): একটি পাঠ, আইন ইত্যাদি উন্নত করার জন্য একটি ছোট পরিবর্তন বা সংযোজন।
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (Bicameral): একটি আইনসভা, যার দুটি পৃথক কক্ষ বা হাউস রয়েছে (যেমন প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট)।
- বিল (Bill): একটি প্রস্তাবিত আইন, যা আইনসভা কর্তৃক বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।
- মন্ত্রিসভা (Cabinet): উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের একটি সংস্থা, সাধারণত নির্বাহী বিভাগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত।
- নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Checks and Balances): একটি ব্যবস্থা, যা সরকারের প্রতিটি শাখাকে অন্য শাখার কাজ সংশোধন বা ভেটো করার অনুমতি দেয়, যাতে কোনো একটি শাখা অত্যধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারে।
- কোয়ালিশন সরকার (Coalition Government): যখন দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠনের জন্য সহযোগিতা করে একটি সরকার গঠন করে।
- নির্বাচনী এলাকা (Constituency): একটি এলাকা; যার ভোটাররা একটি আইনসভায় একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে।
- ক্ষমতা হস্তান্তর (Devolution): একটি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রশাসনে ক্ষমতা হস্তান্তর বা অর্পণ।
- নির্বাহী শাখা (Executive Branch): সরকারের শাখা; যা আইন বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা)।
- বিচার বিভাগ (Judicial Branch): সরকারের শাখা; যা আইন ব্যাখ্যা এবং বিচার পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (যেমন আদালত, বিচারক)।
- আইনসভা (Legislative Branch): সরকারের শাখা; যা আইন প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (যেমন সংসদ, কংগ্রেস)।
- লবিং (Lobbying): সরকারের কর্মকর্তাদের দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, প্রায়শই স্বার্থ গোষ্ঠীর দ্বারা।
- সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন (Majority Rule): শাসনের এই নীতি যখন বৃহত্তর সংখ্যার কর্তৃত্ব বৃহত্তর ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
- ইশতেহার (Manifesto): নীতি ও লক্ষ্যগুলোর একটি জনঘোষণা, বিশেষ করে নির্বাচনের আগে একটি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী দ্বারা জারি করা হয়।
- প্রস্তাব (Motion): একটি আইনসভা বা কমিটির কাছে উত্থাপিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব।
- সংসদ (Parliament): রাষ্ট্রের আইনসভা।
- ক্ষমতা পৃথক্করণ (Separation of Powers): একটি রাষ্ট্রের সরকারের শাখাগুলোকে বিভক্ত করা, যার প্রতিটি পৃথক এবং স্বাধীন ক্ষমতা এবং দায়িত্বের ক্ষেত্র রয়েছে।
- ভেটো (Veto): একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা দ্বারা গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সাংবিধানিক অধিকার।

## নির্বাচনী পরিভাষা

- অনুপস্থিত ভোটার (Absentee Voting): ভোটদানের দিনে ভোটকেন্দ্রে যেতে অক্ষম কোনো ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া ব্যালট।
- ব্যালট (Ballot): কাগজের বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, যার মাধ্যমে একজন ভোটার নির্বাচনে তাঁর পছন্দ প্রয়োগ বা নিবন্ধন করেন।
- প্রচারণা (Campaign): একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সংগঠিত কার্যক্রম, যেমন নির্বাচনে জয়লাভ করা।
- প্রার্থী (Candidate): একজন ব্যক্তি; যিনি নির্বাচনের জন্য মনোনীত হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
- নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate): একটি দেশ বা এলাকার সকল মানুষ; যারা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী।
- ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (First Past the Post - FPTP): একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী জয়ী হন, এমনকি যদি তাঁর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-ও থাকে।
- ভোটাধিকার (Franchise/Suffrage): নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার।
- সাধারণ নির্বাচন (General Election): একটি আইনসভায় প্রার্থীদের নিয়মিত নির্বাচন।
- বর্তমান ক্ষমতাসীন (Incumbent): একটি রাজনৈতিক পদে বর্তমান ধারক।
- মনোনীত প্রার্থী (Nominee): একজন রাজনৈতিক দল দ্বারা নির্বাচনে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি।
- ভোটদান কেন্দ্র (Polling Place): যে ভবন বা মনোনীত এলাকায় ভোটাররা তাঁদের ব্যালট প্রদান করেন।
- আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation): একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা, যেখানে একটি দল নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের অনুপাতে আসন সংখ্যা লাভ করে।
- গণভোট (Referendum): একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব বা আইনের ওপর ভোটারদের দ্বারা সরাসরি ভোট।
- ভোটার উপস্থিতি (Voter Turnout): একটি নির্বাচনে ভোট প্রদানকারী যোগ্য ভোটারদের শতাংশ।

## রাজনৈতিক Actors ও গোষ্ঠী

- কর্মী (Activist): একজন ব্যক্তি, যিনি কোনো ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালান।
- আমলাতন্ত্র (Bureaucracy): সরকারের একটি ব্যবস্থা; যেখানে বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা নেওয়া হয়।
- ককাস (Caucus): একটি আইনসভার সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্যদের একটি সভা, প্রার্থী নির্বাচন বা নীতি নির্ধারণের জন্য।
- জোট (Coalition): সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য একটি জোট, বিশেষ করে একটি সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর বা রাজ্যগুলোর একটি অস্থায়ী জোট।
- ভোটার (Constituent): একটি নির্বাচনী এলাকার সদস্য।
- স্বার্থ গোষ্ঠী (Interest Group): সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্য ভাগ করে নেওয়া এবং জননীতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করা লোকদের একটি সংস্থা।
- লবিবাদী (Lobbyist): একজন ব্যক্তি, যিনি আইন প্রণেতাদের প্রভাবিত করার একটি সংগঠিত প্রচেষ্টায় অংশ নেন।
- বিরোধী দল (Opposition): রাজনৈতিক দল বা দলগুলো, যারা ক্ষমতায় নেই কিন্তু সরকারের প্রতি একটি আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা গঠন করে।
- পক্ষপাতদুষ্ট (Partisan): একটি দল, কারণ বা ব্যক্তির একজন শক্তিশালী সমর্থক। প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।
- রাজনৈতিক দল (Political Party): একটি সংগঠিত গোষ্ঠী, যার সদস্যরা একই রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ ভাগ করে নেয় এবং তাদের সদস্যদের জনপদে নির্বাচিত করার লক্ষ্য রাখে।

- প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister): একটি সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের প্রধান।
- রাষ্ট্রপতি (President): একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান।
- থিংক ট্যাংক (Think Tank): একটি প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বিশেষজ্ঞদের গোষ্ঠী যা রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর ওপর পরামর্শ এবং ধারণা প্রদান করে।
- প্রহরী (Watchdog): একজন ব্যক্তি বা সংস্থা; যারা অন্যদের (যেমন সরকার, করপোরেশন) কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে নৈতিক ও আইনি আচরণ নিশ্চিত করে।

এই শব্দকোষ রাজনীতি ও গণতন্ত্রের মূল পরিভাষাগুলোর একটি মৌলিক ধারণা প্রদান করে। এই পরিভাষাগুলোর অর্থ এবং প্রয়োগ নির্দিষ্ট দেশ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।

## রাজনৈতিক দলের শব্দকোষ

রাজনৈতিক দলগুলো আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি, যা সাধারণত নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের লক্ষ্য রাখে। তারা বিভিন্ন মতাদর্শ, স্বার্থ এবং নীতিগত প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, নাগরিকদের শাসনে অংশগ্রহণের একটি কাঠামোগত উপায় প্রদান করে।

**এখানে রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত মূল পরিভাষাগুলোর একটি শব্দকোষ দেওয়া হলো**

- রাজনৈতিক দল (Political Party): ব্যাপক অর্থে একই ধরনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও মতামত সম্পন্ন মানুষের একটি সংগঠিত গোষ্ঠী, যা জনপদে নিজেদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করার মাধ্যমে জননীতিকে প্রভাবিত করতে চায়।
- মতাদর্শ (Ideology): বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং নীতির একটি সেট; যা একটি রাজনৈতিক দলের কাজ ও নীতিকে পরিচালিত করে। সাধারণ মতাদর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে উদারনীতিবাদ, রক্ষণশীলতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং জনতুষ্টিবাদ।
- দলীয় ইশতেহার (Party Manifesto): একটি রাজনৈতিক দলের নীতি, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে নীতিগত অবস্থানের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি। এটি নির্বাচিত হলে দলটি কী করতে চায়, তার রূপরেখা দেয়।
- দলীয় ব্যবস্থা (Party System): একটি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সামগ্রিক কাঠামো এবং গতিশীলতা, যার মধ্যে প্রধান দলগুলোর সংখ্যা এবং তাদের সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত (যেমন দুই-দলীয় ব্যবস্থা, বহুদলীয় ব্যবস্থা)।
- বামপন্থী (Left-wing): একটি রাজনৈতিক ধারা; যা সাধারণত সামাজিক সমতা, অগ্রগতি, অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং সম্মিলিত দায়িত্বের ধারণার সঙ্গে জড়িত।
- ডানপন্থী (Right-wing): একটি রাজনৈতিক ধারা; যা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মুক্তবাজার পুঁজিবাদ এবং সীমিত সরকারি হস্তক্ষেপের সঙ্গে জড়িত।
- মধ্যপন্থী (Centrist): একটি রাজনৈতিক অবস্থান; যা একটি মধ্যপন্থী পদ্ধতির পক্ষে অ্যাডভোকেসি করে, প্রায়শই বাম ও ডানপন্থী উভয় মতাদর্শের উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে।
- ভোটার ভিত্তি (Voter Base): প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমর্থকদের মূল গোষ্ঠী, যাদের ওপর একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ভোটের জন্য নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ভর করতে পারে।

### দলীয় কাঠামো ও ভূমিকা

- দলীয় নেতা (Party Leader): একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান মুখপাত্র এবং কৌশলগত প্রধান, এর দিকনির্দেশনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রায়শই সরকারের প্রধানের জন্য দলের প্রার্থী হিসেবে কাজ করেন।
- দলীয় নির্বাহী/কমিটি (Party Executive/Committee): দলের মধ্যে একটি পরিচালনা পর্ষদ যা প্রশাসনিক কাজ, সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত এবং কখনো কখনো নেতা বা প্রার্থী নির্বাচনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- দলীয় সদস্য (Party Member): একজন ব্যক্তি; যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিবন্ধিত বা যুক্ত, প্রায়শই দলীয় কার্যক্রমে জড়িত থাকেন, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন এবং অভ্যন্তরীণ দলীয় নির্বাচনে ভোট দেন।

- ককাস (Caucus): একটি আইনসভার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সকল নির্বাচিত সদস্যের একটি সভা; যা কৌশল, নীতি এবং দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।
- হুইপ (Whip): পার্লামেন্টে একজন দলীয় কর্মকর্তা, যিনি দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার, সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভোটে উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করার এবং সদস্যদের কাছে দলের অবস্থান জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- তৃণমূল (Grassroots): একটি রাজনৈতিক দল, সংস্থা বা আন্দোলনের সাধারণ মানুষ। তৃণমূল সক্রিয়তা বলতে স্থানীয় সদস্যদের দ্বারা শুরু ও পরিচালিত রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বোঝায়।
- ক্যাডার পার্টি (Cadre Party): কর্মীদের একটি ছোট, রাজনৈতিকভাবে অভিজাত গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত একটি দল; যা প্রায়শই পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা যায়।
- মাস পার্টি (Mass Party): একটি দল; যা একটি বৃহৎ, সক্রিয় সদস্যপদ ভিত্তি চায়, প্রায়শই একটি শক্তিশালী মতাদর্শিক ফোকাসসহ, যা জনগণকে একত্র ও শিক্ষিত করার লক্ষ্য রাখে।
- ক্যাচ-অল পার্টি (Catch-all Party): একটি রাজনৈতিক দল; যা তার মতাদর্শকে সংযত করে এবং ব্যাপকভাবে আবেদনকারী বিষয়গুলোতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর বিস্তৃত ভোটারদের আকর্ষণ করতে চায়।

## দলীয় কার্যক্রম ও কার্যাবলি

- প্রার্থী মনোনয়ন (Candidate Nomination): একটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক একজন প্রার্থীকে নির্বাচন ও সমর্থন করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া।
- নির্বাচনী প্রচারণা (Election Campaign): একটি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী দ্বারা ভোটারদের তাদের সমর্থন করার জন্য, প্ররোচিত করার জন্য সংগঠিত ধারাবাহিক কার্যক্রম।
- ভোটার সংহতি (Voter Mobilization): যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সমর্থকদের ভোট দিতে নিবন্ধন করতে এবং তাদের ব্যালট প্রদান করতে উৎসাহিত ও সহায়তা করে।
- তহবিল সংগ্রহ (Fundraising): দলের কার্যক্রম, প্রচারণা এবং পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করার কাজ।
- ইস্যু অ্যাডভোকেসি (Issue Advocacy): একটি নির্দিষ্ট নীতি বা কারণের প্রকাশ্যে সমর্থন করার কাজ, প্রায়শই লবিং, জনসচেতনতা প্রচারাভিযান বা সংবাদমাধ্যম জড়িত থাকার মাধ্যমে।
- নীতি প্রণয়ন (Policy Formulation): যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য তাদের প্রস্তাবিত সমাধান এবং পদ্ধতি তৈরি করে।
- স্বার্থ একত্রীকরণ (Interest Aggregation): বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর থেকে বিভিন্ন স্বার্থ ও দাবি একত্র করে এবং সেগুলোকে সুসংগত নীতিগত প্রস্তাবনায় একত্র করার রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ।
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (Political Socialization): যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিরা রাজনৈতিক মনোভাব, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ অর্জন করে, যা প্রায়শই রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- পৃষ্ঠপোষকতা (Patronage): পদগুলোতে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, যা প্রায়শই রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থকদের পুরস্কৃত করতে বা আনুগত্য তৈরি করতে ব্যবহার করে।
- ক্লায়েন্টেলিজম (Clientelism): একটি সামাজিক ব্যবস্থা; যা একজন পৃষ্ঠপোষক এবং তার ক্লায়েন্টদের মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা এবং অধীনতার সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে, প্রায়শই রাজনৈতিক দলগুলোতে নির্দিষ্ট সুবিধার বিনিময়ে ভোট আদান-প্রদান করতে দেখা যায়।
- দলীয় শৃঙ্খলা (Party Discipline): একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আইনসভায় দলের আনুষ্ঠানিক নীতি অনুযায়ী ভোট দিতে এবং কাজ করার প্রত্যাশা।
- জোট সরকার (Coalition Government): যখন দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য এবং যৌথভাবে শাসন করার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়, তখন গঠিত সরকার।

- বিরোধী দল (Opposition Party): একটি রাজনৈতিক দল যা ক্ষমতাসীন জোটের বা একক শাসক দলের অংশ নয়, যার ভূমিকা হলো সরকারকে পর্যবেক্ষণ করা এবং বিকল্প নীতি উপস্থাপন করা।

এই শব্দকোষ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত মূল পরিভাষাগুলোর একটি মৌলিক ধারণা প্রদান করে। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং কার্যাবলি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নির্বাচনী আইন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে।

## নির্বাচনের শব্দকোষ

- নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Absolute Majority): মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০% এর বেশি। কিছু নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রার্থীর জয়ের জন্য এটি প্রায়শই প্রয়োজন হয়। কিছু ব্যবস্থায় সংসদের মোট আসনের ৫০% এর বেশি পেলেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরা হয়।
- অনুপস্থিত ভোটারদের ভোটদান (Absentee Voting): একটি পদ্ধতি; যা যোগ্য ভোটারদের নির্বাচনের দিনে শারীরিকভাবে ভোটকেন্দ্রে না গিয়েও, প্রায়শই ডাকযোগে বা অগ্রিম ভোট দিতে সক্ষম করে।
- ব্লক ভোটিং (Block Voting): একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা, যেখানে ভোটাররা যত আসন আছে, ততটিতে ভোট দেয় এবং সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীরা জয়ী হন।
- ইলেকটোরাল কলেজ (Electoral College): কিছু দেশের (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নির্বাচকদের একটি সংস্থা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা। ভোটাররা সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন না; তাঁরা নির্বাচকদের নির্বাচন করেন, যাঁরা পরে ভোট দেন।
- ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (First Past the Post - FPTP) / প্লুরালিটি সিস্টেম (Plurality System): একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা, যেখানে একটি নির্বাচনী এলাকার সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী জয়ী হন, তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করুন বা না করুন। এটি প্রায়শই উচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার জন্য সমালোচিত হয়।
- আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation - PR): একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যে একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে যত শতাংশ ভোট পায়, তার সঙ্গে আনুপাতিক হারে আসন সংখ্যা লাভ করে। বিভিন্ন ধরনের পিআর ব্যবস্থা রয়েছে।
- গণভোট (Referendum): একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব, আইন বা সাংবিধানিক সংশোধনের ওপর ভোটারদের দ্বারা সরাসরি ভোট, প্রার্থীর জন্য ভোট দেওয়ার পরিবর্তে।
- রান-অফ নির্বাচন (Run-off Election ev Second Ballot): যদি প্রথম রাউন্ডে কোনো প্রার্থী প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা (প্রায়শই একটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা) অর্জন না করে, তবে একটি দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত শীর্ষ দুই প্রার্থী রান-অফে অংশগ্রহণ করে।
- একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (Single Transferable Vote - STV): একটি জটিল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা, যেখানে ভোটাররা বহু সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীদের র‍্যাঙ্ক করে। আনুপাতিকতা অর্জনের জন্য বাদ পড়া প্রার্থীদের বা নির্বাচিত প্রার্থীদের অতিরিক্ত ভোটগুলো থেকে ভোট স্থানান্তর করা হয়।

### প্রধান নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও পরিভাষা

- ব্যালট বাক্স (Ballot Box): একটি সিল করা বাক্স; যেখানে ভোটাররা তাঁদের পূরণ করা ব্যালট জমা দেন।
- সীমানা নির্ধারণ (Boundary Delimitation): নির্বাচনী এলাকার সীমানা আঁকার প্রক্রিয়া, যা প্রায়শই একটি স্বাধীন কমিশন দ্বারা করা হয়, ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব এবং প্রায় সমান জনসংখ্যার আকার নিশ্চিত করতে।
- উপনির্বাচন (By-election): সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক পদ শূন্য হলে তা পূরণ করার জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচন।
- ভোটার তালিকা (Electoral Roll বা Voter Register): একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন বা নির্বাচনী এলাকার সকল যোগ্য ভোটারের তালিকা।

- এক্সিট পোল (Exit Poll): ভোটাররা ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করার সময় তাঁদের কাকে ভোট দিয়েছেন, তা জিজ্ঞাসা করে পরিচালিত একটি জরিপ, যা নির্বাচনের ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে এবং ভোটদানের ধরন বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।
- সাধারণ নির্বাচন (General Election): একটি আইনসভার সকল বা বেশির ভাগ আসনের প্রার্থীদের একটি নিয়মিত নির্বাচন, যা সাধারণত নির্দিষ্ট বিরতিতে অনুষ্ঠিত হয়।
- গেরিম্যান্ডারিং (Gerrymandering): একটি নির্বাচনী এলাকার সীমানা এমনভাবে কারসাজি করার অভ্যাস, যাতে একটি দল বা শ্রেণিকে সুবিধা দেওয়া যায়।
- মনোনয়ন (Nomination): একজন ব্যক্তিকে নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব বা নিবন্ধন করার প্রক্রিয়া।
- জনমত জরিপ (Opinion Poll): জনসাধারণের মতামতের একটি জরিপ, যা মানুষের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনার প্রশ্ন করার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- ওভারহ্যাং আসন (Overhang Seat বা Compensatory Seat): কিছু মিশ্র-সদস্য আনুপাতিক ব্যবস্থায়, যদি কোনো দল তাদের ভোটের আনুপাতিক অংশের চেয়ে বেশি নির্বাচনী আসন জেতে, তাহলে আনুপাতিকতা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত আসন দেওয়া হয়।
- গণভোট (Refrendum): একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রশ্নের ওপর নির্বাচকমণ্ডলীর সকল সদস্যের সরাসরি ভোট। প্রায়শই গণভোটের সঙ্গে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে কখনো কখনো একটি অ-বাধ্যতামূলক ভোটকে বোঝায়।
- ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা/প্রিজাইডিং অফিসার (Polling Officer/Presiding Officer): ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।
- পুনরায় গণনা (Recount): মূল গণনার নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য ব্যালটের পুনরায় গণনা, সাধারণত খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে অনুরোধ করা হয়।
- নিবন্ধন (Registration): যোগ্য ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য সাইন আপ করার প্রক্রিয়া।
- নষ্ট ব্যালট (Spoiled Ballot): একটি ব্যালট, যা ভুলভাবে চিহ্নিত বা বিকৃত হয়েছে; যার ফলে এটি গণনা করা যায় না।
- সুইং (Swing): নির্বাচনগুলোর মধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থনের পরিবর্তনের মাত্রা।
- প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন (Uncontested Election): একটি নির্বাচন যেখানে শুধু একজন প্রার্থী থাকে, যিনি কোনো ভোট না দিয়েই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জয়ী হন।

এই শব্দকোষ নির্বাচনে ব্যবহৃত পরিভাষা সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা প্রদান করে। নির্দিষ্ট পরিভাষা এবং তাদের সুনির্দিষ্ট অর্থ দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং আইনি কাঠামোর ওপর নির্ভর করে সামান্য ভিন্ন হতে পারে।

## সংসদীয় গণতন্ত্রের শব্দকোষ

সংসদীয় গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যেখানে নির্বাহী শাখা (সরকার) তার গণতান্ত্রিক বৈধতা আইনসভা (সংসদ) থেকে লাভ করে এবং এর কাছেই জবাবদিহি করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার মতো নয়, সরকারের প্রধান (সাধারণত প্রধানমন্ত্রী) সাধারণত জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন না, বরং তিনি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা জোটের নেতা হন।

**এখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক পরিভাষাগুলোর একটি শব্দকোষ দেওয়া হলো–**

### মূল ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

- সংসদ (Parliament): সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের আইনসভা, যা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এটি সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ।
- প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister - PM): সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের প্রধান। প্রধানমন্ত্রী সাধারণত সংসদে সর্বাধিক আসনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলের নেতা হন, অথবা দলগুলোর একটি জোটের নেতা হন।

- মন্ত্রিসভা (Cabinet): উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের একটি সংস্থা, সাধারণত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংসদ সদস্যদের (MP) মধ্য থেকে নির্বাচিত হন, যাঁরা বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রধান হন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকেন।
- রাষ্ট্রপ্রধান (Head of State): একটি দেশের প্রতীকী প্রধান, প্রায়শই একজন রাজা/রানি বা একজন অ-নির্বাহী রাষ্ট্রপতি। তাঁদের ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক, প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা সরকারের প্রধানের হাতে থাকে।
- সরকারপ্রধান (Head of Government): সরকারের প্রধান নির্বাহী, দেশ পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (বেশির ভাগ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী)
- সংসদ সদস্য (Member of Parliament - MP): একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি যিনি সংসদে বসেন।
- বিরোধী দল (Opposition): রাজনৈতিক দল বা দলগুলো, যারা ক্ষমতায় নেই তবে সরকারের আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা করে, সরকারের নীতি ও কর্মের যাচাই-বাছাই করে।
- বিরোধীদলীয় নেতা (Leader of the Opposition): সরকারে না থাকা বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি আনুষ্ঠানিক বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন এবং সরকারকে জবাবদিহি করেন।
- স্পিকার (Speaker): সংসদীয় কক্ষের সভাপতি, সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত। স্পিকার নিশ্চিত করেন যে সংসদীয় নিয়মাবলি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং বিতর্কের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।
- হুইপ (Whip): একজন দলীয় কর্মকর্তা, যিনি দলের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার, সংসদ সদস্যদের কাছে দলের নীতি জানানোর এবং সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি ও ভোট নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

## মূল প্রক্রিয়া ও ধারণাসমূহ

- জবাবদিহি (সংসদীয়) (Accountability - Parliamentary): এই নীতি যে সরকার (নির্বাহী) তার কর্ম এবং নীতির জন্য সংসদের (আইনসভা) কাছে দায়ী।
- স্থগিতকরণ বিতর্ক (Adjournment Debate): সংসদীয় অধিবেশনের শেষে অনুষ্ঠিত একটি সংক্ষিপ্ত বিতর্ক, যা সদস্যদের উদ্বেগের বিষয় উত্থাপন করার সুযোগ দেয়।
- সংশোধনী (বিল/প্রস্তাবের) (Amendment - to a Bill/Motion): সংসদে বিবেচিত একটি বিল (প্রস্তাবিত আইন) বা একটি প্রস্তাব (আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব) এর প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা সংযোজন।
- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ (Bicameral Parliament): দুটি পৃথক কক্ষ বা হাউসসহ একটি আইনসভা (যেমন যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্স এবং হাউস অব লর্ডস, বা কানাডা/অস্ট্রেলিয়ার সিনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস)
- বিল (Bill): একটি প্রস্তাবিত আইন, যা সংসদে বিতর্ক ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।
- বাজেট (Budget): সরকারের বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা, প্রস্তাবিত ব্যয় এবং রাজস্বের রূপরেখা, যা অবশ্যই সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- মন্ত্রিসভার দায়বদ্ধতা (সম্মিলিত দায়বদ্ধতা) (Cabinet Responsibility - Collective Responsibility): একটি সাংবিধানিক প্রথা, যেখানে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে সরকারি নীতির প্রকাশ্যে সমর্থন করতে হবে, অথবা পদত্যাগ করতে হবে। যদি সরকার অনাস্থা ভোটে হেরে যায়, তবে পুরো মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করার কথা।
- ককাস (Caucus): সংসদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সকল নির্বাচিত সদস্যের একটি সভা; যা কৌশল, নীতি এবং দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।
- নিন্দা প্রস্তাব (Censure Motion): বিরোধী দল (বা কখনো কখনো সরকারি সদস্যরা) কর্তৃক একটি সরকারি মন্ত্রী বা পুরো সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে disapproval প্রকাশ করার জন্য আনা একটি প্রস্তাব।
- আস্থা প্রস্তাব (Confidence Motion ev Vote of Confidence): সরকার বা বিরোধী দল কর্তৃক একটি প্রস্তাব, যা পরীক্ষা করার জন্য যে সরকার এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের সমর্থন (আস্থা) আছে কি না। যদি সরকার আস্থা ভোটে হেরে যায়, তবে সাধারণত তাঁদের পদত্যাগ করতে হয় বা একটি সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করতে হয়।

- সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy): এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান একজন রাজা/রানি; যাঁর ক্ষমতা একটি সংবিধান দ্বারা সীমিত এবং যিনি নির্বাচিত কর্মকর্তাদের পরামর্শে কাজ করেন (যেমন যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া)
- ফ্লোর অতিক্রম করা (Crossing the Floor): যখন একজন সংসদ সদস্য সংসদে তাঁর নিজের দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে ভোট দেন।
- বিতর্ক (Debate): একটি প্রস্তাব বা বিলের ওপর সংসদে একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা, যেখানে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।
- অর্পিত আইন (Delegated Legislation ev Subordinate Legislation): সংসদ কর্তৃক সরাসরি নয়; বরং সংসদীয় আইনের মাধ্যমে সরকার মন্ত্রীদের বা সংস্থাগুলোকে প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে তৈরি করা প্রবিধান, নিয়ম বা আদেশ।
- সংসদ বিলোপ (Dissolution of Parliament): একটি সংসদীয় মেয়াদের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি, যার পরে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।
- ভোট (Division - Vote): সংসদে একটি আনুষ্ঠানিক ভোট, যেখানে সদস্যরা শারীরিকভাবে দলে বিভক্ত হয়ে (যেমন "হ্যাঁ" এবং "না") গণনা করা হয়।
- নির্বাহী শাখা (Executive Branch): একটি সংসদীয় ব্যবস্থায়, এটি সরকার (প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা) কে বোঝায়, যা আইন বাস্তবায়নের জন্য দায়ী, আইনসভা (সংসদ) থেকে পৃথক।
- ফ্রন্টবেঞ্চার (Frontbenchers): সংসদ সদস্য; যাঁরা সরকারে (মন্ত্রী) বা শ্যাডো ক্যাবিনেটে (বিরোধী দলের নেতা) পদ ধারণ করেন। তাঁরা সংসদীয় কক্ষের সামনের বেঞ্চে বসেন।
- সাধারণ নির্বাচন (General Election): আইনসভার সকল বা বেশির ভাগ সদস্য নির্বাচন করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচন, সাধারণত সংসদ বিলুপ্তির পরে।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া (Legislative Process): একটি আইন তৈরির সঙ্গে জড়িত পদক্ষেপগুলো, একটি বিলের প্রবর্তন থেকে শুরু করে এর চূড়ান্ত অনুমোদন এবং সম্মতি পর্যন্ত।
- প্রস্তাব (Motion): সংসদ কর্তৃক আলোচনা বা সিদ্ধান্তের জন্য একজন সংসদ সদস্য কর্তৃক পেশ করা একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব।
- অনাস্থা প্রস্তাব (No-Confidence Motion ev Motion of No Confidence): বিরোধী দল কর্তৃক একটি প্রস্তাব, যা প্রদর্শন করার জন্য যে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের সমর্থন আর রাখে না। যদি এটি পাস হয়, তবে সাধারণত সরকারের পদত্যাগ বা একটি সাধারণ নির্বাচন হয়।
- স্থগিতকরণ (Prorogation): সংসদ বিলুপ্ত না করে একটি সংসদীয় অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি। এটি একটি নতুন অধিবেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত বর্তমান আইন প্রণয়নের কাজ শেষ করে।
- বেসরকারি সদস্য বিল (Private Member's Bill): একটি বিল যা সরকারের দ্বারা নয়, বরং মন্ত্রিসভার বাইরের একজন কর্তৃক প্রবর্তিত হয়।
- প্রশ্নকাল (Question Hour): সংসদে একটি নিয়মিত সময় যখন সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীর কাছে সরকারি নীতি ও কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
- রাজকীয়/রাষ্ট্রপতির সম্মতি (Royal Assent ev Presidential Assent): রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা বা রাষ্ট্রপতি) কর্তৃক আনুষ্ঠানিক অনুমোদন; যা সংসদ কর্তৃক পাস করা একটি বিলকে আইনে পরিণত করে।
- যাচাই-বাছাই (সংসদীয়) (Scrutiny - Parliamentary): সংসদ কর্তৃক সরকারের কর্ম, নীতি এবং ব্যয় পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া। এর মধ্যে বিতর্ক, প্রশ্নকাল এবং কমিটি কাজ অন্তর্ভুক্ত।
- অধিবেশন (Session): একটি সময়কাল যখন সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ পরিচালনা করার জন্য মিলিত হয়। একটি সংসদীয় মেয়াদে সাধারণত বেশ কয়েকটি অধিবেশন থাকে।
- শ্যাডো ক্যাবিনেট (Shadow Cabinet): একটি সংসদীয় ব্যবস্থায়, জ্যেষ্ঠ বিরোধী সংসদ সদস্যদের একটি দল; যাঁরা সরকারের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের পদগুলোকে অনুসরণ, সরকারি নীতির সমালোচনা এবং বিকল্প নীতি প্রস্তাব করেন।

- স্থায়ী আদেশ (Standing Orders): একটি সংসদীয় কক্ষের ব্যবসায়িক আচরণ পরিচালনার স্থায়ী নিয়মাবলি এবং পদ্ধতি।
- এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ (Unicameral Parliament): একটি একক কক্ষ বা হাউসসহ একটি আইনসভা (যেমন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ)
- অনাস্থা ভোট (Vote of No Confidence): অনাস্থা প্রস্তাব দেখুন।

এই শব্দকোষ সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো বোঝার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করবে। ভূমিকা/প্রক্রিয়াগুলোর নির্দিষ্ট সূক্ষ্মতা এবং নামগুলো দেশভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে (যেমন সংসদের কক্ষগুলোর বিভিন্ন নাম, নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত নিয়মাবলি), তবে মূল ধারণাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

## বিচার বিভাগের শব্দকোষ

বিচার বিভাগ হলো আদালত ব্যবস্থার একটি পদ্ধতি, যা রাষ্ট্রের নামে আইন ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করে। এটি ন্যায়বিচার পরিচালনা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিচার বিভাগ-সম্পর্কিত মূল পরিভাষাগুলোর একটি শব্দকোষ নিচে দেওয়া হলো–

**মূল প্রতিষ্ঠান ও ভূমিকা**

- বিচার বিভাগ (Judiciary): আদালত ব্যবস্থা; যা আইন ব্যাখ্যা করে এবং প্রয়োগ করে; সরকারের বিচারিক শাখা।
- আদালত (Court): একটি সরকারি সংস্থা, প্রায়শই একটি ট্রাইব্যুনাল, যা আইনি বিরোধ শুনতে এবং নিষ্পত্তি করার জন্য অনুমোদিত।
- বিচারক (Judge): একজন সরকারি কর্মকর্তা; যিনি আইন আদালতে মামলা শুনতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হন।
- বিচারপতি (Justice): অনেক উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টে বিচারকের একটি উপাধি।
- প্রধান বিচারপতি (Chief Justice): সুপ্রিম কোর্ট বা একটি বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ পদাধিকারী বিচারক, প্রায়শই বিচার বিভাগের প্রশাসনিক তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- আপিল বিভাগ/আদালত (Appellate Division/Court): একটি আদালত, যা নিম্ন আদালত থেকে আপিল শুনানি করে। এর প্রাথমিক কাজ হলো বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করা; যাতে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের একটি আপিল বিভাগ রয়েছে।
- হাইকোর্ট বিভাগ (High Court Division): বাংলাদেশে, সুপ্রিম কোর্টের একটি বিভাগ, যার সংবিধান বা অন্যান্য আইন দ্বারা প্রদত্ত মূল, আপিল এবং অন্যান্য এখতিয়ার রয়েছে। এটি প্রায়শই মৌলিক অধিকার প্রয়োগ এবং বিচারিক পর্যালোচনা নিয়ে কাজ করে।
- জেলা আদালত (District Court): একটি বিচারিক আদালত; যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক জেলার মধ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলা পরিচালনা করে। বাংলাদেশে এর মধ্যে রয়েছে জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
- মেট্রোপলিটন আদালত (Metropolitan Court): জেলা আদালতের মতোই, তবে বিশেষভাবে মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য (যেমন বাংলাদেশে প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত)।
- ম্যাজিস্ট্রেট (Magistrate): সীমিত এখতিয়ার সম্পন্ন একজন বিচারিক কর্মকর্তা, প্রায়শই ছোটখাটো ফৌজদারি অপরাধ, প্রাথমিক শুনানি এবং কিছু দেওয়ানি বিষয় পরিচালনা করেন।
- ট্রাইব্যুনাল (Tribunal): নির্দিষ্ট ধরনের বিরোধ শুনতে এবং নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত আদালত বা আধা বিচারিক সংস্থা (যেমন শ্রম ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল)।
- রেজিস্ট্রার (Registrar): আদালতের একজন কর্মকর্তা, যিনি আদালতের রেকর্ড, প্রশাসন এবং কখনো কখনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত বিষয়গুলোর তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- ক্লার্ক অব কোর্ট (Clerk of Court): আদালতের একজন কর্মকর্তা, যিনি মামলার প্রবাহ পরিচালনা এবং আদালতের রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত হন।

- আইনজীবী/অ্যাটর্নি/কাউন্সেল (Lawyer/Attorney/Counsel): আইন অনুশীলনের জন্য যোগ্য একজন ব্যক্তি, যিনি আইনি বিষয়ে ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দেন এবং প্রতিনিধিত্ব করেন।
- প্রসিকিউটর (Prosecutor): রাষ্ট্রের (বা জনগণের) একজন আইনি প্রতিনিধি, যিনি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু এবং পরিচালনা করেন।
- আসামি (Defendant): যে পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়, বা যাকে অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়।
- বাদী (Plaintiff): একটি দেওয়ানি মামলায়, যে পক্ষ অন্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়।

## আইনি প্রক্রিয়া ও ধারণা

- আপিল (Appeal): নিম্ন আদালতের একটি সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার জন্য উচ্চ আদালতের কাছে করা একটি অনুরোধ।
- বেকসুর খালাস (Acquittal): একটি রায় যে একজন ফৌজদারি আসামিকে যুক্তিসংগত সন্দেহের বাইরে দোষী প্রমাণিত করা যায়নি।
- স্থগিত (Adjournment): একটি আদালতের শুনানি বা বিচার পরবর্তী তারিখে স্থগিত করা।
- গ্রহণযোগ্যতা (প্রমাণের) (Admissibility - of Evidence): প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা যাবে কি না। প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।
- হলফনামা (Affidavit): আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য শপথের অধীনে করা তথ্যের একটি লিখিত বিবৃতি।
- অভিযোগপত্র পাঠ (Arraignment): আদালতে একজন আসামির কাছে ফৌজদারি অভিযোগের আনুষ্ঠানিক পাঠ, যেখানে আসামিকে দোষী বা নির্দোষ বলে স্বীকার করতে বলা হয়।
- জামিন (Bail): বিচারের অপেক্ষায় থাকা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির অস্থায়ী মুক্তি, প্রায়শই এই শর্তে যে তাঁদের আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখা হয়।
- বেঞ্চ ট্রায়াল (Bench Trial): জুরি ছাড়া একটি বিচার, যেখানে বিচারক তথ্যগুলোর সিদ্ধান্ত নেন এবং আইন প্রয়োগ করেন।
- যুক্তিসংগত সন্দেহের ঊর্ধ্বে (Beyond a Reasonable Doubt): একটি ফৌজদারি মামলায় আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের মান। প্রসিকিউশনকে এমনভাবে দোষ প্রমাণ করতে হবে, যাতে জুরি বা বিচারকের মনে কোনো যুক্তিসংগত সন্দেহ না থাকে।
- প্রমাণের বোঝা (Burden of Proof): একটি মামলায় একটি পক্ষের ওপর তাদের দাবি বা প্রতিরক্ষার সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা। ফৌজদারি মামলায়, বোঝা সাধারণত প্রসিকিউশনের ওপর থাকে।
- কেস আইন (Case Law): বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা তৈরি আইন, আইনসভা দ্বারা তৈরি আইনের বিপরীতে।
- অভিযোগ (ফৌজদারি) (Charge - Criminal): একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি অপরাধ করার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ।
- দেওয়ানি আইন (Civil Law): অপরাধমূলক বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত নাগরিকদের অধিকার এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিয়ে কাজ করা আইন।
- সাধারণ আইন (Common Law): প্রথা এবং আদালতের সিদ্ধান্ত (নজির) ভিত্তিক একটি আইনি ব্যবস্থা। বাংলাদেশসহ অনেক কমনওয়েলথ দেশের সাধারণ আইনের ভিত্তি রয়েছে।
- অভিযোগ (দেওয়ানি) (Complaint - Civil): একটি দেওয়ানি মামলায় দায়ের করা প্রাথমিক নথি, যা আসামির বিরুদ্ধে বাদীর দাবিগুলো উল্লেখ করে।
- দণ্ডাদেশ (Conviction): একজন ফৌজদারি আসামির বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায়।
- ফৌজদারি আইন (Criminal Law): অপরাধ এবং অপরাধমূলক অপরাধের আইনি শাস্তি নিয়ে কাজ করা আইন।
- জেরা (Cross-examination): একটি আইনি কার্যধারায় বিরোধী পক্ষের দ্বারা একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ।
- ক্ষতিপূরণ (Damages): একটি দেওয়ানি মামলায় আসামির দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি বা আঘাতের জন্য বাদীকে প্রদত্ত অর্থ।
- ডিক্রি (Decree): একটি আদালত কর্তৃক জারি করা একটি আনুষ্ঠানিক আদেশ বা রায়, বিশেষ করে দেওয়ানি মামলায়।

- আবিষ্কার (Discovery): বিচারের পূর্বের প্রক্রিয়া; যেখানে পক্ষগুলো মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রমাণ বিনিময় করে।
- প্রমাণ (Evidence): সাক্ষ্য, নথি বা বস্তুতে উপস্থাপিত তথ্য; যা তথ্য-নির্ণয়কারী (বিচারক বা জুরি) কে একটি মামলা নিষ্পত্তি করতে রাজি করাতে ব্যবহৃত হয়।
- একতরফা (Ex Parte): অন্য পক্ষকে নোটিশ না দিয়ে বা তাদের উপস্থিতি ছাড়াই একটি পক্ষ দ্বারা আনা একটি আইনি কার্যক্রম।
- হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus): একটি আইনি রিট; যা গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে বিচারকের সামনে বা আদালতে হাজির করার আদেশ দেয়, যাতে তাদের আটকের জন্য বৈধ কারণ দেখানো না হলে ব্যক্তির মুক্তি নিশ্চিত করা যায়।
- শুনানি (Hearing): একটি আদালত বা ট্রাইব্যুনালের সামনে একটি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম, সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তি বা প্রমাণ শুনতে।
- নিষেধাজ্ঞা (Injunction): একজন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে বা করা বন্ধ করতে বাধ্য করে আদালতের একটি আদেশ।
- রায় (Judgment): একটি মামলায় আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
- এখতিয়ার (Jurisdiction): একটি মামলা শুনতে এবং রায় দেওয়ার জন্য একটি আদালত বা বিচারিক কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা।
- জুরি (Jury): সাধারণ নাগরিকদের একটি সংস্থা, যা একটি বিচারে প্রমাণ শুনতে এবং একটি মামলার তথ্য নির্ধারণের জন্য নির্বাচিত হয়।
- বিচারিক পর্যালোচনা (Judicial Review): সরকারে আইনসভা এবং নির্বাহী শাখার কার্যক্রম পরীক্ষা করার এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে কি না, তা নির্ধারণ করার আদালতের ক্ষমতা।
- মামলা (Lawsuit): একটি মামলা, বিতর্ক বা বিরোধ, যা একটি আইন আদালতে আনা হয়।
- লিটিগেশন (Litigation): আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া।
- ম্যানডামাস (Mandamus): একটি বিচারিক রিট, যা একটি নিম্ন আদালতকে নির্দেশ হিসেবে জারি করা হয় বা একজন ব্যক্তিকে একটি পাবলিক বা সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করার আদেশ দেয়।
- আবেদন (Plea): একটি অভিযোগের জবাবে একজন আসামির বা তার পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি, সাধারণত দোষী বা নির্দোষ।
- নজির (Precedent): পূর্ববর্তী আদালতের মামলায় প্রতিষ্ঠিত একটি আইনি নীতি বা নিয়ম, যা একই ধরনের সমস্যাসহ পরবর্তী মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার সময় অন্যান্য আদালত দ্বারা অনুসরণ করা হবে।
- রিমান্ড (Remand): আরও পদক্ষেপের জন্য একটি মামলা নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো, অথবা একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফেরত পাঠানো।
- আইনের শাসন (Rule of Law): এই নীতি যেসব মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান এমন আইনের অধীন এবং জবাবদিহির আওতায় থাকে, যা ন্যায্যভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করা হয়।
- দণ্ডাদেশ (Sentence): আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়া একজন আসামিকে দেওয়া শাস্তি, বা একটি নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি।
- স্টেয়ার ডেসিসিস (Stare Decisis): নজির অনুসরণ করার আইনি নীতি, যার অর্থ আদালতকে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়গুলোর পাশে দাঁড়ানো উচিত।
- সংবিধি (Statute): একটি আইনসভা দ্বারা পাস করা একটি লিখিত আইন।
- সমন (Subpoena): একজন ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেওয়া একটি রিট।
- সাক্ষ্য (Testimony): একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি, বিশেষ করে যা আইন আদালতে দেওয়া হয়।
- বিচার (Trial): একটি মামলায় দোষ নির্ধারণের জন্য একজন বিচারক এবং সাধারণত একটি জুরি দ্বারা প্রমাণের একটি আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা।

- রায় (Verdict): একটি জুরি দ্বারা তাদের কাছে জমা দেওয়া বিষয়গুলোর ওপর বা একটি বেঞ্চ ট্রায়ালে একজন বিচারক দ্বারা করা তথ্যের আনুষ্ঠানিক আবিষ্কার।
- রিট (Writ): একটি আদালত কর্তৃক জারি করা একটি আনুষ্ঠানিক আইনি নথি, একটি কাজ সম্পাদনের আদেশ দেওয়া বা তা করার অনুমতি দেওয়া।

এই শব্দকোষ বিচার বিভাগ এবং আইনি ব্যবস্থায় সাধারণত ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর একটি বিস্তৃত ওভারভিউ প্রদান করে। আদালত এবং ভূমিকার কাঠামো এবং নির্দিষ্ট নামগুলো দেশভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে (যেমন বাংলাদেশের নির্দিষ্ট আদালতের স্তরক্রম বনাম অন্যদের), তবে মৌলিক ধারণাগুলো মূলত সংগতিপূর্ণ থাকে।

## গণমাধ্যমের শব্দকোষ

এখানে "গণমাধ্যম" সম্পর্কিত পরিভাষাগুলোর একটি শব্দকোষ দেওয়া হলো, যা এর বিভিন্ন রূপ, ধারণা, ভূমিকা এবং প্রক্রিয়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে ঐতিহ্যবাহী, ডিজিটাল এবং সাংবাদিকতামূলক দিকগুলোও রয়েছে।

মূল ধারণা ও সংবাদমাধ্যমের প্রকারভেদ

- গণমাধ্যম (Media): যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম; যেমন মুদ্রণ, সম্প্রচার, প্রকাশনা এবং ইন্টারনেট, সম্মিলিতভাবে বিবেচিত হয়। এটি ব্যাপক দর্শক-পাঠক-শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম যোগাযোগের সমস্ত রূপকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- মাস মিডিয়া (Mass Media): গণযোগাযোগের মাধ্যমে বিশাল দর্শক-পাঠক-শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গণমাধ্যম প্রযুক্তি (যেমন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট)
- ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যম (Traditional Media): গণমাধ্যমের পুরোনো রূপ; যেমন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও এবং টেলিভিশন, প্রায়শই ডিজিটাল বা নতুন গণমাধ্যমের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়।
- ডিজিটাল মিডিয়া (নতুন গণমাধ্যম) (Digital Media - New Media): ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে তৈরি, বিতরণ এবং ভোগ করা বিষয়বস্তু (যেমন ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম, পডকাস্ট, স্ট্রিমিং পরিষেবা, অ্যাপ)।
- সম্প্রচার গণমাধ্যম (Broadcast Media): গণমাধ্যম; যা টেলিভিশন এবং রেডিওর মতো বেতার তরঙ্গ বা তারের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে জনসাধারণের কাছে বিষয়বস্তু প্রেরণ করে।
- মুদ্রিত সংবাদমাধ্যম (Print Media): সংবাদমাধ্যম যা তথ্য convey করার জন্য মুদ্রিত উপাদান ব্যবহার করে; যেমন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই এবং ব্রোশিওর।
- সামাজিক মাধ্যম (Social Media): অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েবসাইট যা ব্যবহারকারীদের বিষয়বস্তু তৈরি এবং শেয়ার করতে বা সামাজিক নেটওয়ার্কিংয়ে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে (যেমন ফেসবুক, টুইটার/এক্স, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব)।
- মাল্টিমিডিয়া (Multimedia): একই সঙ্গে একাধিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করা (যেমন পাঠ্য, অডিও, ছবি, অ্যানিমেশন, ভিডিওর সমন্বয়)।
- হাইপারমিডিয়া (Hypermedia): অ-রৈখিক গণমাধ্যম; যা ব্যবহারকারীদের সংযুক্ত উপাদানগুলোর (যেমন ইন্টারনেটে হাইপারলিঙ্ক) মাধ্যমে তথ্য নেভিগেট করার অনুমতি দেয়।
- একীভূতকরণ (Convergence): ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের ফলস্বরূপ সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন রূপের (যেমন মুদ্রণ, সম্প্রচার, অনলাইন) একত্র হওয়া।

### সাংবাদিকতা ও বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত পরিভাষা

- সাংবাদিকতা (Journalism): সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সম্প্রচার মাধ্যম, সংবাদ ওয়েবসাইট বা অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য সংবাদ সংগ্রহ, লেখা, সংবাদ প্রতিবেদন বা কনটেন্ট তৈরি এবং প্রকাশ, উপস্থাপন ও প্রচারের জন্য প্রস্তুত করার কার্যকলাপ বা পেশা।
- সংবাদ (News): নতুন প্রাপ্ত বা উল্লেখযোগ্য তথ্য, বিশেষ করে সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে।

- ফিচার স্টোরি (Feature Story): একটি অ-সংবাদমূলক গল্প; যা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা বা ধারণাকে গভীরভাবে ফোকাস করে।
- সম্পাদকীয় (Editorial): একটি সংবাদপত্র বা অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশক, সম্পাদক বা মালিকদের মতামত উপস্থাপনকারী একটি নিবন্ধ।
- মতামত কলাম (Opinion Piece - Op-Ed): একটি নিবন্ধ, সাধারণত সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিপরীতে প্রকাশিত হয়, যা একজন নামধারী লেখকের মতামত প্রকাশ করে; যিনি প্রকাশনার সম্পাদকীয় বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নন।
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা (Investigative Journalism): এমন প্রতিবেদন, যা লুকানো তথ্য উন্মোচন করে, প্রায়শই অন্যায় বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলো প্রকাশ করে।
- ব্রেকিং নিউজ (Breaking News): যে সংবাদ বর্তমানে বিকাশমান বা তাৎক্ষণিক জনস্বার্থের বিষয়, যা প্রায়শই সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।
- একচেটিয়া (Exclusive): একটি সংবাদ, যা অন্য কোনো সংবাদমাধ্যম আউটলেটের আগে একটি নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যম আউটলেট দ্বারা রিপোর্ট করা হয়।
- স্কুপ (Scoop): প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগে একজন সাংবাদিক বা সংবাদপত্র দ্বারা প্রাপ্ত এবং প্রকাশিত একটি সংবাদ।
- বাইলাইন (Byline): একটি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের নিবন্ধের লাইন, যা লেখকের নাম দেয়।
- ডেটলাইন (Dateline): একটি সংবাদ গল্পের শুরুতে একটি লাইন, যা এর উৎস স্থান এবং তারিখ দেয়।
- শিরোনাম (Headline): একটি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের নিবন্ধ বা পৃষ্ঠার শীর্ষে দেওয়া শিরোনাম।
- ভূমিকা (Lead - Lede): একটি সংবাদগল্পের প্রথম অনুচ্ছেদ, যা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্ষেপ করতে বোঝানো হয়েছে।
- তথ্য-যাচাই (Fact-Checking): সংবাদমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে করা বিবৃতি এবং দাবিগুলোর বাস্তবিক নির্ভুলতা যাচাই করার প্রক্রিয়া।
- পক্ষপাত (Bias): ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে বা বিপক্ষে কুসংস্কার, যা সাধারণত অন্যায্য বলে বিবেচিত হয়।
- চাঞ্চল্যকরতা (Sensationalism): জনসাধারণের আগ্রহ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য নির্ভুলতার বিনিময়ে উত্তেজনাপূর্ণ বা মর্মান্তিক গল্প বা ভাষা ব্যবহার।
- ক্লিকবেইট (Clickbait): অনলাইন বিষয়বস্তু, যার মূল উদ্দেশ্য হলো মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং পাঠক-দর্শকদের একটি নির্দিষ্ট ওয়েব পৃষ্ঠার লিঙ্কে ক্লিক করতে উৎসাহিত করা।
- ভুল তথ্য (Misinformation): মিথ্যা বা ভুল তথ্য, যা ছড়ানো হয় প্রতারণার উদ্দেশ্য-নির্বিশেষে।
- অপতথ্য (Disinformation): মিথ্যা তথ্য, যা ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি এবং ছড়ানো হয় প্রতারণা বা কারসাজির উদ্দেশ্যে।
- প্রচারণা (Propaganda): তথ্য, বিশেষ করে পক্ষপাতদুষ্ট বা বিভ্রান্তিকর প্রকৃতির, যা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণ বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার কিংবা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- গেটকিপিং (Gatekeeping): তথ্য বিতরণের জন্য ফিল্টার করার প্রক্রিয়া; সেটি প্রকাশনা, সম্প্রচার, ইন্টারনেট বা যোগাযোগের অন্য কোনো মাধ্যমেই হোক। সংবাদমাধ্যমের গেটকিপাররা সিদ্ধান্ত নেন কোনটি জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা হবে।
- নাগরিক সাংবাদিকতা (Citizen Journalism): সাধারণ জনগণের দ্বারা সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ এবং বিশ্লেষণ, বিশেষ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।
- ব্যবহারকারী-উৎপাদিত বিষয়বস্তু (User-Generated Content - UGC): যেকোনো ধরনের বিষয়বস্তু; যেমন ছবি, ভিডিও, পাঠ্য এবং অডিও; যা ব্যবহারকারীদের দ্বারা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা হয়েছে।

## গণমাধ্যম শিল্প ও উৎপাদন-সম্পর্কিত পরিভাষা

- দর্শক/শ্রোতা/পাঠক (Audience): গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু ব্যবহারকারী মানুষের দল।
- প্রচারসংখ্যা (Circulation): একটি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের বিতরণ করা কপির সংখ্যা।
- রেটিং (Ratings): টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রামের জন্য দর্শক/শ্রোতা আকার এবং গঠন পরিমাপ।
- সিন্ডিকেট (Syndication): একাধিক গণমাধ্যম আউটলেট বা অবস্থানে উপাদান সম্প্রচার কিংবা প্রকাশ করার অধিকার বিক্রি করার প্রক্রিয়া।
- প্রেস রিলিজ (Press Release): একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যম আউটলেটগুলোতে পাঠানো একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি।
- নিষেধাজ্ঞা (Embargo): একটি নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় পর্যন্ত তথ্যের প্রকাশনা বা প্রকাশের ওপর একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।
- জনসংযোগ (Public Relations - PR): একটি সংস্থা বা অন্যান্য সংস্থা বা একজন বিখ্যাত ব্যক্তির দ্বারা একটি অনুকূল জনমত বজায় রাখার পেশাদার কাজ।
- বিজ্ঞাপন (Advertising): বাণিজ্যিক পণ্য বা পরিষেবার জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি করার কার্যকলাপ বা পেশা।
- ফ্রিল্যান্সার (Freelancer): একজন ব্যক্তি; যিনি একটি কোম্পানির পূর্ণকালীন কর্মচারী না হয়ে নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির জন্য কাজ করেন।
- প্রধান সম্পাদক (Editor-in-Chief): একটি প্রকাশনা বা সংবাদ সংস্থার সামগ্রিক বিষয়বস্তু এবং দিকের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
- প্রকাশক (Publisher): সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা বইয়ের আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিকগুলোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কোম্পানি।
- সংবাদ সম্মেলন (Press Conference): ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো বিষয়ে তার বক্তব্য বা কোনো তথ্য প্রকাশের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান, যেখানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।
- মিডিয়া মোগল (Media Mogul): একজন শক্তিশালী ব্যক্তি; যিনি বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যম আউটলেটের মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করেন।
- সেল্‌ফ-সেন্সরশিপ (Self-Censorship): পরিণতির ভয়ে যা বলা বা প্রকাশ করা হয়, তা সীমাবদ্ধ করার কাজ; প্রায়শই কর্তৃপক্ষের ব্যক্তি বা শক্তিশালী গোষ্ঠীর অসন্তোষ এড়াতে।

এই শব্দকোষ গণমাধ্যমের প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত বিস্তৃত পরিভাষাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। গণমাধ্যমের ক্ষেত্র ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে, বিশেষ করে প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে, তাই নতুন পরিভাষা নিয়মিতভাবে উঠে আসে।

978-984-35-8745-9